

প্রথম প্রকাশ
১৫ই আগস্ট, ১৯৮৫
দ্বিতীয় প্রকাশ
১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৭

গ্রন্থসত্ব : অধ্যাপিকা চিন্ময়ী বসু

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক
দি নিউ কমলা প্রেস
এস. সি. ঘোষ
৫৭/২ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের ভূমিকা

কংগ্রেস এবং গান্ধিজীর উপর কোনো কিছু লিখতে গেলে—তা' বিশেষ কোনো প্রসংগ বা দিক অবলম্বন করেই হোক না কেন, বিষয়বস্তুর ঘন-ঘটায় তা' এত সমাকীর্ণ যে কোনো একটি মাত্র সংস্করণে সব কথা বলে ওঠা সম্ভব নয়। নতুন নতুন সরকারী বেসরকারী তথ্যের প্রকাশ ঘটনাপঞ্জীকে করে তোলে আরো অর্থবহ যা' হয়ত পূর্বে লেখকের দৃষ্টিতে ছিল নিতান্ত সাধারণ মাত্র। বলা বাহুল্য, বর্তমান সংস্করণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ঘটনাই ঘটেছে। যথাসম্ভব অধুনা প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থগুলিকে নতুন সংস্করণে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—যদিও সব করা হয়েছে একথা কখনোই বলা যাবে না। আবার অন্য দিকে অসহযোগ আন্দোলন ও কাউনসিলে যোগদানের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং গান্ধিজীর মধ্যে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল—যা' কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আজও ঐতিহাসিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, তা' বর্তমান সংস্করণে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। একইভাবে অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে উত্তর-প্রদেশের কৃষক আন্দোলনে কংগ্রেস ও নেহেরুর ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। ফলে বিষয়বস্তু বেড়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে পৃষ্ঠা সংখ্যাও। পূর্বে যে সমস্ত আলোচনাগুলি ছিল কিছুটা অস্পষ্ট এবং সীমিত সেগুলিকে আরো সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ করে তোলার প্রয়াস পেয়েছি। বস্তুবাদের আলোয় কংগ্রেস এবং গান্ধিজীকে যেভাবে দেখা সম্ভব—সে ভাবেই দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন সংস্করণেও আমি সেই দৃষ্টিভংগী থেকে কোথাও সরে আসি নি। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে দুর্বলতা বা কঠোরতার প্রশ্ন স্বভাবতঃই অবান্তর ও নিরর্থক। সোবিয়েত ইতিহাসবিদ রাস্তিস্লাভ উলিয়ানভস্কি এই প্রসংগে গান্ধিজী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। "ভারতীয় জনগণের মধ্যে গান্ধী এখনও প্রভূত শ্রদ্ধার অধিকারী। এই কারণে গান্ধীবাদ অধ্যয়ন করতে হবে বিশদে, তার সমস্ত দিক দিয়ে এবং তাকে সমালোচনা করা ও কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে, আধুনিক ভারতের জটিল সামাজিক-অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে এক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।" (এশিয়া ও আফ্রিকা সমকালীন সমস্যা ; পৃ. ২১৪ ; মস্কো, ১৯৮৬)

প্রথম সংস্করণে বইটির নামকরণ সম্পর্কে কিছু সমালোচক প্রশ্ন তুলেছিলেন—যদিও ভূমিকাতে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছিল যে বর্তমান বইটিতে কংগ্রেস বা গান্ধিজীর কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা হয় নি। কেবলমাত্র প্রকাশকের

অনুরোধে কংগ্রেস শতবর্ষে প্রকাশিত হওয়ার দরুণ এধরণের একটি শিরোনাম বেছে নেওয়া হয়েছে। নতুন সংস্করণের ক্ষেত্রেও এর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং গান্ধিজীর নেতৃত্বে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন। প্রয়াত ঐতিহাসিক এ. এল. বাশামের লেখা, "দি ওয়াণ্ডার দেট ওয়্যাজ ইণ্ডিয়া" (The Wonder that was India)-র ক্ষেত্রেও এধরনের ঘটনা ঘটেছিল। তিনি চেয়েছিলেন ইতিহাস পাঠকের বোধগম্য একটি সাধারণ শিরোনাম, যথা, "হিস্ট্রি এণ্ড কালচার অব অ্যানসেণ্ট ইণ্ডিয়া" (History and culture of Ancient India) কিন্তু প্রকাশক তাতে মোটেই রাজী হলেন না। অবশেষে "ওয়াণ্ডার" কথাটি মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বাশাম (Basham) অনিচ্ছাসত্ত্বেও বইয়ের উপরোক্ত শিরোনামটি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন এর জন্য তিনি কোনোভাবেই দায়ী নন। (বাশামের সাক্ষাতকার ; "দি টেলিগ্রাফ" পত্রিকা ; ৯ই জুন, ১৯৮৬)

বইটির প্রথম সংস্করণ পড়ে পশ্চিমবঙ্গের বহু পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষ আমায় পত্র যোগে তাঁদের মূল্যবান মতামত জানিয়ে বাধিত করেছেন। শ্রদ্ধেয় অন্নদাশংকর রায় তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করেও গান্ধিজী সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতামত আমায় লিখিতভাবে জানিয়েছেন এবং সেই সাথে পাঠিয়েছেন পত্র-পত্রিকা থেকে কিছু দুষ্প্রাপ্য পেপার কাটিং—যা' আমার বর্তমান সংস্করণকে সমৃদ্ধ করে তুলতে অত্যন্ত সাহায্য করেছে। তিনি বইটির কিছু তথ্যগত ভুলের প্রতিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা' নতুন সংস্করণে সংশোধন করা হয়েছে। তাঁর মত উদার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন—কেবল এইটুকু বলতে পারি যে শ্রী রায়ের ঋণ অপরিশোধ্য। এই প্রসংগে বর্দ্ধমান বিশ্ববিত্থালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মিহিরকুমার রায়ের নিকট বর্তমান লেখক কৃতজ্ঞ তাঁর মূল্যবান কিছু সুচিন্তিত অভিমতের জন্য।

বলা বাহুল্য এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ এত দ্রুত বেরোত না যদি না প্রকাশক-বন্ধু জনাব মজহারুল ইসলাম এগিয়ে আসতেন এবং তাঁকে সাহায্য করতেন অনুজপ্রতীম আজিজুল হক। উভয়ের কাছেই রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শ্যামাপ্রসাদ বসু

আমলাপাড়া
পুরুলিয়া
নববর্ষ, ১৩৯৪

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রথমেই বলে রাখা উচিত বর্তমান বইটির শিরোনামের ("গান্ধিজী ও কংগ্রেসের শতবর্ষ") সাথে বিষয়বস্তুর কিছু পার্থক্য আছে। এতে কংগ্রেসের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই, যেমন নেই গান্ধিজীর কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী। কংগ্রেসের শতবর্ষকে স্মরণ করে বইটি প্রকাশিত হওয়ার দরুণ এধরণের একটি শিরোনাম বেছে নেওয়া হয়েছে। এই অসম্পূর্ণতার জন্য সুধী পাঠক আশা করি ক্ষমা করবেন।

রামবর্জিত যেমন রামায়ণ লেখা যায় না, তেমনি গান্ধিজী বর্জিত কোনো কংগ্রেসের ইতিহাস রচনাও সম্ভব নয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে গান্ধিজীর সংগ্রামের ও সম্পর্কের কিছু আলোচনা বর্তমান বইটির বিষয়সূচী। অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন—এই দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আন্দোলনকে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রবন্ধগুলি লিখতে গিয়ে গান্ধিজীর সমসাময়িকদের (যেমন, শ্রী জওহারলাল নেহেরু, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শ্রী জে. বি. কৃপালিনী প্রভৃতি) এবং তাঁর প্রামান্য জীবনীকারের (ডি. জি. তেণ্ডুলকার) বক্তব্যের যেমন সাহায্য নেওয়া হয়েছে তেমনি আধুনিক ইতিহাসবিদ ও সমালোচকদের (যেমন, শ্রীরজনী পাম দত্ত, শ্রী ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, শ্রী অনিল শীল, শ্রীমতী জুডিথ ব্রাউন, শ্রীসুমিত সরকার প্রভৃতি) মতামতগুলিরও যুক্তিগ্রাহ্যতা বিচার করে দেখা হয়েছে। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও তথ্য বা ঘটনাবলীকে তত্ত্বের স্বার্থে বলি দেওয়া হয়নি।

আমার অন্যান্য বইয়ের মত যাঁর সাথে প্রাথমিক আলোচনা করে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছি তিনি আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা চিন্ময়ী বসু। তাঁর প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। যদিও মতামতের দায়-দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব।

প্রবন্ধগুলি বই আকারে প্রকাশের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপিকা অধ্যাপক বন্ধু নানাভাবে আমায় উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রয়োজনীয় বই দিয়ে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীসুশান্ত হাজরা যেভাবে আমায় সাহায্য করেছেন তা' ভুলবার নয়। বইটি প্রকাশনের সর্ববিধ দায়িত্ব নিয়ে "নবজাতক প্রকাশন" এর কর্তৃপক্ষ আমায় কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন।

কলকাতায় থাকাকালীন যাঁদের নিরন্তর সাহায্য ও সাহচর্য আমায় অভিভূত করে রেখেছে সেই অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীসুবিনয় ঘোষ ও আমার সহদোরা শ্রীমতী কৃষ্ণা ঘোষকে জানাই আমার আন্তরিক ভালবাসা।

সবশেষে, যাঁর অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি জাতিভেদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম আজও আমাদের কাছে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম—সেই মহাত্মা মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র বইটি উৎসর্গ করলাম।

পুরুলিয়া

১লা জুলাই, ১৯৮৫ শ্যামাপ্রসাদ বসু

গান্ধিজী ও কংগ্রেসের শতবর্ষ

প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে পত্র-পত্রিকার কিছু অভিমত

বস্তুবাদী আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্বের উপস্থাপনা এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটিকে তথাকথিত পাঠ্যপুস্তকের সীমানার বাইরে এক বিশাল ব্যাপ্তিতে উপনীত করেছে। আলোচনা ও প্রতি আলোচনার মাধ্যমে এই জাতীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার ও সত্যানুসন্ধিৎসুও স্বদেশসচেতন ব্যক্তিমাত্রেরই কাম্য।

—"গণশক্তি"; ১৮ই নবেম্বর, ১৯৮৫.

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ, ভাষা সহজ এবং তত্ত্বের স্বার্থে তথ্যকে বলি দেওয়ার প্রবণতা না থাকায় গ্রন্থটি সমাদর পাবে।

—"দেশ"; ১০ই মে, ১৯৮৬

"দেশ" পত্রিকা (সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৩) কর্তৃক এক বছরের উল্লেখযোগ্য বই (২ বৈশাখ, ১৩৯২-১ বৈশাখ, ১৩৯৩) এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

"আনন্দ বাজার" পত্রিকার সম্পাদকীয় বাছাই এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। (৭ই অক্টোবর, ১৯৮৫)

প্রায় শ দেড়েক পৃষ্ঠার এই আলোচনায় শ্যামাপ্রসাদ যথেষ্ট পরিশ্রম করে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এবং যতটা জানি তিনি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী নিয়েই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর লেখার মধ্যেও সেই পরিচয় আছে।—এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য গান্ধিজী ও তাঁর সময়ের পশ্চিমবঙ্গ; ২৪-৩১ জানুয়ারি, ১৯৮৬

কংগ্রেসের কার্যক্রমের যুক্তিসংগত বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন। পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ছাপ সর্বত্র।—"যুবমানস"; মার্চ, ১৯৮৬

বইটিতে গ্রন্থকার বক্তব্যের উপস্থাপনা যে ভাবে করেছেন তার সপক্ষে সবচেয়ে বড় কথা তিনি বিরোধী দুটি বা ততোধিক মতবাদকে বিশেষভাবে উত্থাপিত করে নিজে যে মতবাদটিকে সব চাইতে তথ্য ও যুক্তিনির্ভর বলে মনে করেছেন সেটি তিনি পাঠকজনের কাছে তুলে ধরেছেন সহজবোধ্য ভঙ্গিতে। তথ্য-নিরপেক্ষ উপাদান সাজিয়ে তিনি তত্ত্বের বনিয়াঁদ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন নি—এটি সুস্থ মানসিকতার লক্ষন।

—অধ্যাপক নিশীথ রঞ্জন রায়, "আনন্দ বাজার" পত্রিকা; ২১শেসেপ্টেম্বর, ১৯৮৬।

গ্রন্থপঞ্জী

যে সমস্ত বইয়ের উদ্ধৃতি ও মতামত আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১। দি ইমারজেন্স অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম

—অনিল শীল; সংস্করণ, ১৯৮২

২। দি ব্রেক আপ অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া

—বি. এন. পাণ্ডে; সংস্করণ, ১৯৮১

৩। ইণ্ডিয়া টুডে; আর. পি. দত্ত; সংস্করণ, ১৯৭৯

৪। দি ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসী এণ্ড ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁস—২

—রমেশচন্দ্র মজুমদার, সংস্করণ, ১৯৬৫

৫। ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস; পট্টভী সীতারামাইয়া; (১ম খণ্ড)

(সংস্করণ, ১৯৩৫)

৬। রাইজ এণ্ড গ্রোথ অব কংগ্রেস ইন ইণ্ডিয়া

—এণ্ড্রুজ এবং মুখার্জী; সংস্করণ, ১৯৩৮

৭। ব্রিটিশ পলিসি ইন ইণ্ডিয়া (১৮৫৮-১৯০৫)

—এস. গোপাল; সংস্করণ, ১৯৭৫

৮। ফ্রিডম স্ট্রাগল; বিপানচন্দ্র এবং অন্যান্য;

৯। হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া—২; পার্সী ভাল স্পীয়ার; (পেঙ্গুইন, ১৯৭৮)

১০। হিস্ট্রি অব ফ্রিডম ম্যুভমেণ্ট (৩য় খণ্ড)

—তারাচাঁদ; ভারত সরকার, ১৯৮৩

১১। মডার্ণ ইণ্ডিয়া; সুমিত সরকার; ম্যাকমিলান, ১৯৮৩

১২। দি মহাত্মা এণ্ড দি ইজম; ই. এম. এস. নাম্বুদ্রীপাদ;

কলকাতা; ১৯৮১

১৩। দি লাইফ অব মহাত্মা গান্ধী ; লুই. ফিশার ; সংস্করণ, ১৯৮২
১৪। অ্যান অটোবায়োগ্রাফি ; এম. কে. গান্ধী ; আমেদাবাদ, ১৯৬৩
১৫। মহাত্মা (১ম-৩য় খণ্ড) ; ডি. জি. তেণ্ডুলকার ; সংস্করণ, ১৯৬১
১৬। ভারত সন্ধানে (বাংলা অনুবাদ) ; জওহরলাল নেহেরু ;
কলকাতা, ১৩৫৬
১৭। গান্ধীজ' রাইজ টু পাওয়ার ; জুডিথ. এম. ব্রাউন ; কেম্ব্রিজ, ১৯৭২
১৮। সাব অলটার্ণ স্টাডিজ (৩য় খণ্ড) ; রণজিত গুহ ; দিল্লী, ১৯৮৪।
১৯। এসেজ ইন দি সোস্তাল হিস্ট্রি অব মডার্ণ ইণ্ডিয়া ; রবীন্দর কুমার ;
দিল্লী, ১৯৮৩
২০। অ্যান অটোবায়োগ্রাফি ; জওহরলাল নেহেরু ; লণ্ডন, ১৯৫৫
২১। দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ; সুভাষচন্দ্র বসু ; সংস্করণ, ১৯৬৭
২২। ইণ্ডিয়া ফ্রম কার্জন টু নেহেরু এণ্ড আফটার ; দুর্গা দাস ;
লণ্ডন, ১৯৬৯।
২৩। হিস্ট্রি অব দি ফ্রিডম ম্যুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ; ৩য় খণ্ড ; রমেশচন্দ্র
মজুমদার ; কলকাতা, ১৯৬৩
২৪। নেহেরু ; এ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি ; মাইকেল ব্রেচার ; লণ্ডন, ১৯৫৯
২৫। হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া (২য় খণ্ড) ; অ্যানটোনোভা, বনগার্ড-লেভিন,
কোটোভস্কি ; মস্কো, ১৯৭৮
২৬। সোস্তাল-পলিটিক্যাল ভিউজ অব বিবেকানন্দ
—বিনয় কুমার রায় ; দিল্লী, ১৯৭৯
২৭। আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ;
—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
২৮। দেশবন্ধু-স্মৃতি ; হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; কলকাতা, ১৩৩৩।
২৯। ইন দি কজ দি পিপল ; এ. কে. গোপালন ; সংস্করণ, ১৯৭৬
৩০। মডার্ণ ইণ্ডিয়া ; বিপানচন্দ্র ; দিল্লী, ১৯৭৭
৩১। রূপনারায়নের কূলে (২য় খণ্ড) ; গোপাল হালদার ; সংস্করণ, ১৯৮১।
৩২। মাও সেতুঙ ; অ্যান ফ্রেমানটাল ; আমেরিকা, ১৯৬২
৩৩। গান্ধী ; জে. বি. কৃপালনী ;
৩৪। জওহরলাল নেহেরু ; ফ্রাংক মোরেস ; বোম্বে, ১৯৫৯
৩৫। জওহরলাল নেহেরু : এ বায়োগ্রাফি ; এস. গোপাল ; ১ম খণ্ড ;
সংস্করণ, ১৯৭৬
৩৬। ইণ্ডিয়া স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম ; হীরেন মুখার্জী ; কলকাতা, ১৯৬২

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঃ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সিবিলিয়ান অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে একটি সার্কুলার পত্র প্রচার করেন। পত্রের মূল বক্তব্য ভারতের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনের বিষয়ে গ্রাজুয়েটদের তৎপর হওয়া উচিত—যেহেতু তাঁরাই উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ভারতীয়।

ইংলণ্ডের র‍্যাডিক্যাল এম. পি. যোশেফ হিউমের পুত্র অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ১৮৪৩ সালে ভারতীয় সিবিল সার্বিসে যোগ দিয়ে কলকাতায় আসেন। সিবিল সার্বিসে থাকাকালীন তিনি অন্যান্য কাজের মধ্যে ভারত ও ভারতীয়দের সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করেন। ১৮৭২ সালে ভাইসরয় নর্থব্রুককে বলেন, "আমি জানি এটা বললে অবাক লাগবে—কিন্তু আমি অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর চেয়ে নেটিভদের সাথে বেশি দিন অতিবাহিত করেছি এবং তাদের ভাষা, ভাবনা এবং অনুভূতি বুঝতে পারি"। (দি ইমারজেন্স অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম, অনিল শীল, পৃঃ ২৬৮৩, সংস্করণ ১৯৮২) হিউমের চাকুরী জীবন কিন্তু সুখকর হয়নি। ১৮৭৭ সালে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের (Council) সদস্যপদটি তাঁর হাত ছাড়া হয়। তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক তরুণ এবং স্বল্প অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই পদটি লাভ করেন। লিটনের কাছে অভিযোগ করে হিউম মন্তব্য করেন যে, তাঁর ধারণায় তাঁর অমংগল কামনাকারীদের সংখ্যা ভারতে অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশি আছে। এর দু'বছর পরে হিউমের কপালে আরো দুর্দশা জুটলো। তাঁকে সরকারের সেক্রেটারীর পদ থেকেও বঞ্চিত করা হলো। তিন বছরের মধ্যে ১৮৮২ সালে হতাশাগ্রস্ত হিউম আত্মমর্যাদা রক্ষার তাগিদে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নিলেন। (ঐ, পৃঃ ২১০) চাকুরী থেকে অবসর নিলেও ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ যাতে করে আরো শক্ত ভিত্তির উপর গড়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্যে তিনি ভারতে সাময়িকভাবে বসবাস করা স্থির করেন। সিমলা হল তাঁর অস্থায়ী আস্তানা। ইউটিলিট্যারিয়ান বা উপযোগীবাদীদের মত হিউমের লক্ষ্য ব্রিটিশ শাসনের প্রতি শিক্ষিত ভারতীয়দের অনুরাগ বর্ধন করা এবং সেই কর্মে নিজেকে

সঁপে দেওয়া, একারণেই তিনি অবসর নেওয়ার পরেও ভাইসরয়দের ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে প্রায়ই পরামর্শ দিতেন। ভাইসরয় রিপনের সাথে তাঁর শুধু বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তাই নয়, রিপন এদেশ থেকে চলে যাওয়ার সময়ে লর্ড ডাফরিনকে হিউমের মূল্যবান পরামর্শ নিতে অনুরোধ করে গেছলেন। রিপন মনে করতেন ভারতীদের আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে হিউম উপযুক্ত সংবাদ দিতে পারবেন। যেহেতু শিক্ষিত ভারতীয়দের সাথে তাঁর অফুরন্ত মেলামেশা আছে। (ঐ, পৃঃ, ২৭১) লর্ড ডাফরিনও হিউমের পরামর্শ সময়ে সময়ে গ্রহণ করে যথেষ্ট উপকৃত বোধ করেছেন। তাঁর ভাষায় "রিপন আমাকে বলেছিলেন যে তিনি (হিউম) নেটিভদের ভালমত জানেন এবং আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন মাঝে-মধ্যে তাঁর সাথে দেখা করতে এবং আমি তা' আনন্দের সাথে করেছি।" ("I have done with both pleasure and profit")

ডাফরিন হিউমকে চালাক (clever) বললেও তিনি তাঁকে (হিউম) ভদ্রলোক-সদৃশ ("Gentlemanlike") বলেই অভিহিত করেছেন, (ডাফরিন টু রিয়ে, ১৭ই মে, ১৮৮৫, উদ্ধৃতির জন্য, ঐ, পৃঃ ২৭৫) অথচ ভারতীয় কাউন্সিলের সদস্য স্যার হেনরী মেইন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সাত মাস পরে এক গোপন পত্রে ডাফরিনকে জানিয়ে ছিলেন যে হিউম হলেন "আমার কালে ভারতে তাঁর মত মিথ্যাবাদী আর কেউ আসেন নি" (উদ্ধৃতির জন্য ঐ, পৃঃ ২৭৩, মেইন টু ডাফরিন, ২রা জুন, ১৮৮৬)।

১৭৮৪ সালের দিকে হিউম-এর চিন্তা হয় "যদি ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের বছরে একবার সামাজিক বিষয় আলোচনা করার জন্য একত্রিত করা যায় তা হ'লে দেশের খুবই উপকার হবে"। (সিলেক্ট ডকুমেণ্টস, সি. এইচ. ফিলিপস এবং অন্যান্য, পৃঃ ১৩৮-৩৯, উদ্ধৃতির জন্য "দি ব্রেক আপ অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া," বি. এন. পাণ্ডে, পৃঃ ৪২) হিউম আরো ভেবেছিলেন যে সব প্রদেশে রাজনীতিকরা সমবেত হবেন সেখানের গবর্নররা ওই সব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর ধারণা ছিল এর ফলে সরকারী আমলা অর্থাৎ ইউরোপীয়ানদের সাথে ভারতীয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

১৮৮৫ সালের গোড়ার দিকে হিউম তাঁর চিন্তা-ভাবনা নিয়ে লর্ড ডাফরিনের সাথে দেখা করলেন। ভাইসরয় তাঁকে পরামর্শ দিলেন যেহেতু ভারতে ইংলণ্ডের মত কোন বিরোধী দল নেই যাকে বলা যায় "হার ম্যাজেসটিস অপোজিসন"

সেহেতু "শাসক এবং শাসিত উভয়পক্ষের স্বার্থেই এটি খুবই কাম্য যে ভারতীয় রাজনীতিবিদরা প্রতি বৎসর মিলিত হয়ে সরকারের শাসন ব্যবস্থার কোন্ দিকটি ত্রুটিপূর্ণ এবং তার উন্নতি কিভাবে করা যায় দেখাবেন।" ডাফরিন আরো জানালেন যে এ-ধরনের সম্মেলনে গবর্নরদের সভাপতিত্ব করা উচিত হবে না— কারণ তাহলে তাঁদের সম্মুখে অন্যেরা খোলাখুলি ভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন। (দি ব্রেক আপ অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া; পৃ: ৪২, নতুন সংস্করণ, ১৯৮১)

হিউম ১৮৮৪ সালে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন" নামে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। এখন এই সম্মেলনের পক্ষ থেকে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে পুনায় একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহুত হল। কিন্তু শেষ সময়ে শহরে কলেরা দেখা দেওয়ায় সম্মেলনের স্থান বোম্বাইতে নির্দিষ্ট হল। "ইংরাজী ভাষার সাথে যাঁরা পরিচিত" কেবলমাত্র সেই সব নেতাদের সম্মেলনে আহ্বান করা হয়েছিল এবং তাঁরা ২৭শে ডিসেম্বর "গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ"-এ মিলিত হলেন। সম্মেলনের কয়েকদিন পূর্বে উদ্যোক্তাদের তরফে নামকরণ হল ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ইউনিয়নের পরিবর্তে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস"। কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশনে কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী থেকে মোট বাহাত্তর জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা ডব্লু. সি. ব্যানার্জী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দাদাভাই নাওরোজী, দীনশা ওয়াচা, কে. টি. তেলাং এবং ফিরোজ শা মেহতা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বাহাত্তর জন প্রতিনিধির মধ্যে ৩৯ জন ছিলেন ব্যবহারজীবী, ১৪ জন সাংবাদিক, ২ জন শিক্ষক এবং ১ জন চিকিৎসক। (অনিল শীল, পৃ: ২৭৮)

প্রতিনিধিরা জানালেন তাঁদের একমাত্র কামনা সরকারের শাসনের ভিত্তিকে ব্যাপক করা। যাতে করে আরো অধিক সংখ্যায় জনগণ এতে যোগ্য এবং বিধি-সম্মত অংশগ্রহণ করতে পারে। তাঁরা অবশ্য "ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য" জানাতে ভুললেন না। সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনে অধিবেশনে হিউমের প্রতি "থ্রি চীয়ার্স" দেয়া হল এবং তিনি তাঁর প্রত্যুত্তর দিলেন মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি শুধু "থ্রি চিয়ার্স" দিয়ে নয় সম্ভব হলে আরো তিনগুণ বেশী দিতে প্রতিনিধিদের কাছে আহ্বান জানালেন। এবং সেই সাথে প্রভুভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা হিসেবে সগর্বে ঘোষণা করতে ভুললেন না যে তিনি "মহারানীর পায়ের জুতোর ফিতে খোলারও অযোগ্য।"

সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক যাঁর রাজভক্তিতে এতটুকু সংশয় ছিল না সেই অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বিধা ছিল না। ইংরেজ রাজত্বের সম্ভাব্য বিপদে আশংকায় তিনি ছিলেন সর্বদা উৎকণ্ঠিত। কেননা তিনি মনে করতেন ভারতে ইংরেজ শাসকরা মহাবিদ্রোহের পরেও এদেশবাসীর অনুভূতি এবং অভিমত সম্পর্কে ঘৃণা না হলেও অশ্রদ্ধাপোষণ করেন। এটা তিনি মনে করতেন সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। তাঁর মতে সরকারের ভেবে দেখা উচিত দেশের শাসন-ব্যবস্থার সাথে ভারতীয়দের (নেটিভ) কিছুটা যুক্ত করা যায় কিনা? মনে হয় প্রজাদের এখনো আস্থা ও প্রীতি অর্জন করা সম্ভব হবে। নতুবা "দৃঢ়নিশ্চিতভাবে বুঝেছি সাম্রাজ্যের ভাগ্য হাওয়ায় দুলছে"। (অনিল শীল, পৃঃ ২৬৯)

সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে হিউমের শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর অগাধ আস্থা ছিল। তিনি মনে করতেন ভারতীয়রা যত বেশী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে তত বেশী তারা ইংরেজ শাসনের উপকারিতা উপলব্ধি করতে পারবে। তা ছাড়া তিনি মনে করতেন শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে যদি কোন অসন্তোষ দেখা দিয়ে থাকে (যা তাঁর ধারণায় শুধু দেখা দেয়নি, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে) তা হলে সেই অসন্তোষকে নিরাপদে পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেস একটি "সেফটি ভালভ"-এর কাজ করবে। অন্যথা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। (ঐ, পৃঃ ২৬৯)। হিউমের ভাষায় "আমাদের কাজের ফলে যে প্রচণ্ড ক্রমবর্ধমান শক্তির উদ্ভব ঘটেছে তার নিরাপদ বর্হিগমনের জন্য একটি ভালভের জরুরী প্রয়োজন"। হিউম মনে করতেন কংগ্রেস যদি শিক্ষিত ভারতীয়দের সামনে শান্তিপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক নিরাপদ রাস্তা খুলে দেন তাহলে তাঁরা আর কোনো অশান্তিপূর্ণ রাস্তায় যাবেন না এবং এর ফলে তাঁদের নেতৃত্বের অভাবে যে কোন গণবিক্ষোভ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে পরবর্তীকালে হিউম বলেছেন, অশান্তিময় "আলোড়ন........ক্রমশঃ বিপজ্জনকভাবে জোরদার হচ্ছিল এবং এটা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল উদ্ভূত পরিস্থিথির প্রতিক্রিয়ার নির্গমনের জন্য একটা পথ খুলে দেওয়া অন্যথা তা পচন ধরাত—যে কাজ শুরু হয়ে গেছিল উপরের স্তরে।"

হিউম কথিত "আলোড়ন"-এর বিষয় আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন হিউমের সরকারী উচ্চপদে থাকাকালীন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। ১৮৭০ সালে তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরে ছিলেন এবং পরবর্তী কালে (১৮৭১-৭৯) রাজস্ব, কৃষি এবং বাণিজ্য বিভাগের উচ্চপদে কাজ করেছিলেন। ফলে সরকারী উচু ধরনের আমলা হওয়ার সুযোগে দেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনাক্রম সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট দেখার সুবিধে তাঁর ছিল। ১৮৮২ সালে অবসর নেওয়ার সময়ে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে লক্ষ্য করছিলেন যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাষ, পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন, "আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ তখনও ছিল না এবং এখনও নেই যে আমরা সে সময়ে এক প্রচণ্ড বিপ্লবের ভয়ংকর বিপদের মধ্যে পড়েছিলুম।"

ভারত সরকারকে প্রচণ্ড বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্যে হিউম একটি স্মারক পত্র রচনা করেন। তাতে তিনি লেখেন, "প্রচুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এরকম সাতখণ্ডের (নথি) আমাকে দেখানো হয়েছিল—সব কিছু সাজানো ছিল জেলা, খণ্ড জেলা, মহকুমা এবং নগর, শহর ও গ্রাম ধরে, লিপিবদ্ধ করা। বিবরণের সংখ্যা ছিল বহু এবং সেগুলি নেওয়া হয়েছিল তিরিশ হাজারেরও অধিক তথ্য সংগ্রাহকদের কাছ থেকে। বিবরণীর অনেকগুলিই ছিল নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার। যেগুলি বোঝায় এই সব দরিদ্র ব্যক্তিরা বর্তমান অবস্থায় খুবই অসহায় বোধ করছে এবং তারা স্থির নিশ্চিত যে তাদের অনশনে থাকতে হবে। এ কারণে তারা কিছু করতে চায়। একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে তারা কিছু করবে এবং সেই কিছু করার অর্থ হিংসা (অশান্তি)। বহু তথ্য আছে লুকিয়ে রাখা বন্দুক, বর্শা এবং পুরানো তলোয়ার সম্পর্কে যেগুলি প্রয়োজন দেখা দিলেই ব্যবহার করা হবে······নিম্ন শ্রেণীর অর্থভুখ লোকেদের বর্তমান অবস্থায় প্রথমে কিছু অপরাধ সংঘটিত হলে তা সূচিত করবে ওই ধরনের শত শত অপরাধের এবং তারপরে অসাধারণ অরাজকতা। কর্তৃপক্ষ ও ভদ্রশ্রেণীকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলবে। এটা আরো মনে করা হয়েছিল যে সর্বত্রই ছোট গ্রুপগুলি একত্রিত হয়ে বড় গ্রুপে পরিণত হবে অনেকটা সেই পত্রপৃষ্ঠে জল বিন্দুর মত। দেশের সমস্ত মন্দ চরিত্রের লোকগুলো যোগ দেবে এবং শীঘ্রই যখন দলগুলি বিরাটত্বের আকার নেবে তখন সংখ্যায় অল্প কিছু শিক্ষিত শ্রেণী যাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে খুব সম্ভবতঃ অযৌক্তিক কারণে ক্রুদ্ধ তারা মরিয়া হয়ে এই আন্দোলনে যোগ দেবে এবং এখানে ওখানে নেতৃত্বও দেবেন। আন্দোলনে তারা আনবে সুশৃঙ্খল রূপ এবং

একে জাতীয় বিদ্রোহ হিসেবে পরিচালনা করবে'। (উদ্ধৃতির জন্য, ইণ্ডিয়া টুডে, আর. পি. দত্ত, পৃঃ ৩১৩-৩১৪, সংস্করণ, ১৯৭৯)

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ বিপানচন্দ্র কংগ্রেসের শতবর্ষ উপলক্ষে ইংরাজী "দি টেলিগ্রাফ" পত্রিকায় কতগুলি প্রবন্ধ লেখেন ধারাবাহিকভাবে। সেই ধারাবাহিক প্রবন্ধের একটিতে (কলকাতা, ২৪শে মে, ১৯৮৫) তিনি দাবী করেন যে হিউম কথিত সাত খণ্ডের নথিগুলির কোনো সরকারী স্বীকৃতি ছিল না। গোপন তথ্যগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তিব্বতে অবস্থিত একধরনের ধর্মীয় "মহাত্মা"দের মারফত—যাঁরা ভুতপ্রেত গূঢ় রসস্যাদিতে বিশ্বাস করতেন (Occultist)। এই সব "মহাত্মা"রা অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস রাখতেন এবং জাদু বিদ্যার দ্বারা ভূত ভবিষ্যত বলতে পারতেন। বিপানচন্দ্রের মতে হিউম মাদার ব্লাভাটস্কির সংস্পর্শে এসে আদিদৈবিক শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর মাদামের সাথে বিবাদ বাধে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি "মহাত্মা"দের ক্ষমতায় কখনোই আস্থা হারাননি। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি এঁদের সম্পর্কে ভাইসরয় রিপনকে লেখেন। "আমি এমন ধরনের লোকেদের সাথে মেলামেশা করছি যাঁদের সাধারণ মানুষ দেখতে পায় না অথচ ঈশ্বর মনে করে শ্রদ্ধাভক্তি করে—যাঁরা জনসাধারণের সামান্য অনুভূতি বুঝতে পারেন"। বিপানচন্দ্রের ধারণা হিউম কথিত সাত খণ্ডের গোপন নথিগুলিকে এ যাবত প্রায় সমস্ত ভারতীয় লেখকেরা যায় রজনীপাম দত্ত পর্যন্ত সবাই সরকারী গোপন রিপোর্ট বলে ভুল করে এসেছেন। এর কারণ ওয়েডারবার্নের লেখা যে বই থেকে এই তথ্য প্রথম জানা যায় সেটি এঁরা কেউই ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেননি। ডব্লু. ওয়েডারবার্নের (W. Wedderburn) লেখা "অ্যালান অকটাভিয়ান হিউম" (১৯১৩) গ্রন্থের ৮০-৮১ পৃষ্ঠা থেকে উপরোক্ত লেখকেরা সাত খণ্ড নথিতে লিপিবদ্ধ বিবরণগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন কিন্তু তাঁরা যদি ওই একই গ্রন্থের ৭৮-৮০ পৃষ্ঠা এবং ৮২-৮৩ পৃষ্ঠা ভাল করে পাঠ করতেন তাহলেই তাঁরা দেখতে পেতেন এই নথিগুলি প্রকৃতপক্ষে কী ছিল এবং হিউমকে কারা গোপন খবরগুলি জুগিয়ে ছিলেন।

বিপানচন্দ্রের উপরোক্ত বক্তব্যের পরও একটি ঘটনা সত্য বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে—তা হল হিউম তাঁর নিজস্ব সূত্রে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। হতে পারে এগুলি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আসে নি এবং সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের দ্বারা সমর্থিত ছিল না।

বিপানচন্দ্র উপরোক্ত প্রবন্ধে আরও দাবী করেছেন যে, হিউমের পক্ষে ১৮৭৮-

সালে কোনো সরকারী গোপন রিপোর্ট পড়া সম্ভব ছিল না। ১৮৭৮ সালটির কথা বলা হচ্ছে এই কারণে যে ওয়েডারবার্নের মতে ওই বছর তিনি সাত খণ্ডের গোপন রিপোর্ট পাঠ করেছিলেন সিমলায় বসে। বিপানচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন কিভাবে হিউম সিমলায় বসে দিল্লীর অফিসে রক্ষিত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গোয়েন্দা রিপোর্ট পাঠ করতে পারেন অথবা সেই রিপোর্ট তিনি জানতে পারেন? আর ১৮৭৮ সালে হিউম ছিলেন কৃষি, বাণিজ্য ও রাজস্ব দপ্তরের সেক্রেটারী। আপাতঃ দৃষ্টিতে বিপানচন্দ্রের বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হলেও একথা কি ভাবা একেবারে অমূলক হবে যে ব্যক্তি ১৮৭০ সালে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন সেই হিউম একেবারে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অপরিচিত ছিলেন বা তাঁর প্রাক্তন দপ্তরের অফিসারদের সাথে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না? বিশেষ করে যে আমলে দূর বিদেশে ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা গায়ে গা লাগিয়ে থাকাটা নিরাপদ বলে মনে করতেন। মনে রাখা দরকার হিউম তখন পর্যন্ত চাকুরী থেকে অবসর তো নেননি বরং রাজস্ব দপ্তরের মত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের সেক্রেটারীর আসন দখল করেছিলেন।

হিউমের জীবনীকার, পরবর্তী কালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউমের প্রশংসা করে বলেছেন, সে সময়ে লর্ড লিটনের রুশ ধরনের (জারের শাসনকালে) পুলিশি অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিপ্লবী আন্দোলন আসন্ন হয়ে পড়েছিল এবং "একমাত্র ঠিক সময়ে মিঃ হিউম এবং তাঁর ভারতীয় উপদেষ্টারা উদ্দীপ্ত হয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন"। (উদ্ধৃতির জন্য, দি ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসী এণ্ড ইণ্ডিয়ান রেনাসাঁস-২, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ৫৩১, সংস্করণ, ১৯৬৫)

উইলিয়াম ওয়েডারবার্নের উপরোক্ত সুস্পষ্ট মন্তব্যের পর হিউমের ভূমিকা সম্পর্কে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো সংশয় না থাকলেও কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাস প্রণেতা পট্টভী সীতারামাইয়া মনে করেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার চিন্তা কে করেছিলেন তা রহস্যাচ্ছন্ন। (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, পি. সীতারামাইয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১)। সীতারামাইয়ার ভাষায়:— ১৮৭৭-এর মহতী দরবার অথবা কলকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী যে সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে—যা হয়ত মহতী জাতীয় সমাবেশের পক্ষে উদাহরণের কাজ করে থাকবে সেগুলি ছাড়াও এটা বলা হয়ে থাকে ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বরে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির কনভেনশনের পর সতেরো জনের এক ব্যক্তিগত মিটিংএ এধরনের একটা চিন্তা গড়ে উঠেছিল। সিবিল সার্বিস থেকে অবসরপ্রাপ্ত মিঃ হিউমের প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া ইউনিয়নকে মনে করা হয়ে থাকে কংগ্রেস সম্মেলন আহ্বানের উদ্যোগ নিতে।

উৎপত্তি যে ভাবেই হোক, যিনিই এই ভাবনার জন্মদাতা হোন না কেন আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি যে ভাবনাটা 'বাতাসে ছিলই, এধরনের একটি সংগঠনের প্রয়োজন সবাই উপলব্ধি করছিলেন, কেবল-মিঃ অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম উদ্যোগটা নিয়েছিলেন এবং মাসটা ছিল ১৮৮৫ সালের মার্চ—যখন' ডিসেম্বর মাসে পুনায় সর্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয় ইউনিয়নের সম্মেলন আহ্বান করে নোটিশ জারী করা হয়েছিল। যা ছিল হাওয়ায় প্রবহমান, সাধারণ স্বেচ্ছা চিন্তা এবং একসাথে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম-এর চিন্তাশীল ভারতীয়দের উপর প্রভাব বিস্তার করছিল, তা এখন সুনিশ্চিত এবং কর্মসূচীর রূপ নিল"।

রমেশচন্দ্র মজুমদার সঠিক ভাবেই পট্টভী সীতারামাইয়ার বক্তব্যকে নাকচ করে দিয়েছেন। ১৮৭৭ সালের দিল্লীর দরবার অনুপ্রাণিত করেছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ সালে ন্যাশানাল কনফারেন্স আহ্বান করতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নয়। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে যেহেতু ওই সময়ে কলকাতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজনের সমাবেশ ঘটবে তাই তারিখটাও তারই সাথে সংগতি বজায় রেখে করা হয়েছিল। দ্বিতীয় যে সত্যটি সীতারামাইয়া হাজির করেছেন তারও উৎসটি সন্দেহজনক। তিনি যে বলেছেন মাদ্রাজে আহুত থিয়োজফিক্যাল কনভেনশনে যোগদানকারী সতেরো জন ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেছিলেন—তার একমাত্র ভিত্তি মিসেস অ্যানি বেশান্ত রচিত "হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর ফ্রিডম" (How India wrought for freedom)। মিসেস বেশান্তের বক্তব্য ছাড়া আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যার দ্বারা বলা যাবে সতেরো জন ব্যক্তিরা একসাথে মিলিত হওয়ার সাথে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কোনো যোগাযোগ ছিল। তাঁর বক্তব্যের মধ্যেও তথ্যগত প্রমাদ চোখে পড়ে। মিসেস বেশান্ত সতেরো জনের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপস্থিতির কথাও উল্লেখ করেছেন। অথচ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে ("এ নেশন ইন মেকিং, পৃঃ ৯২) লিখেছেন, "যখন আমরা কলকাতায় ন্যাশানাল কনফারেন্সের অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন একই উদ্দেশ্যে মিঃ অ্যালান হিউমের নেতৃত্বে আমাদের কিছু বন্ধু মাদ্রাজে মিলিত হয়েছিলেন"। সুরেন্দ্রনাথ শুধু মাদ্রাজে অনুপস্থিত ছিলেন তাই নয় তিনি নিজেই লিখেছেন এ ধরনের কনফারেন্স সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবহিতও ছিলেন না একমাত্র কনফারেন্স শুরু হওয়ার সময়ে ছাড়া। (পৃঃ ৯১) লক্ষণীয়, মাদ্রাজে হিউমের উপস্থিতির কথা অন্তর্ভুক্ত করেননি। প্রকৃতপক্ষে ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বরে থিয়োজফিক্যাল কনভেনশন যোগদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে

কয়েকজন পৃথক ভাবে মিলিত হয়ে চিন্তা করেছিলেন কিভাবে ভারতীয় রাজনীতিবিদদের একত্রিত করা যায় একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য। অধ্যাপক সুন্দর রাজন যিনি সতেরো জনের মিটিং-এ যোগ দিয়েছিলেন, তাঁর মতে "দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের আহ্বান তাঁর কতিপয় বন্ধু কিভাবে ভারতীয় রাজনীতিকদের একত্রিত করে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা যায় সে সম্বন্ধে পথ ও উপায় চিন্তা করেছিলেন"। (রাইজ এণ্ড গ্রোথ অব কংগ্রেস ইন ইণ্ডিয়া, এণ্ড্রুজ, সি. এফ. এবং মুখার্জী, জি., পৃঃ ১২৪, লণ্ডন, ১৯৩৮) বলাবাহুল্য সুন্দর রাজনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় সীতারামাইয়া কথিত কংগ্রেসের মত কোনো স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁদের ছিল না। মিসেস বেশান্ত লিখেছেন এই আলোচনা সভার শেষে সাময়িক ভাবে কতকগুলি কমিটি তৈরী হয়েছিল, কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, এইসব কমিটিগুলি শহরে এবং গ্রামে কি কাজ করেছিল তার কোনো রেকর্ড নেই। অথচ তিনিই আবার দাবী করেছেন পরোক্ষভাবে তাঁদেরই উদ্যোগে মার্চ মাসে সার্কুলার জারী করা হয়েছিল কংগ্রেস অধিবেশন আহ্বানের জন্য।

কিন্তু হিউমের জীবনীকার ওয়েডারবার্ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বানের যে বিবরণ দিয়েছেন তার কোথাও মাদ্রাজের উক্ত মিটিং অথবা কমিটির কথা উল্লেখ করেননি। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, এটা এক দেখার মত ব্যাপার বেশান্ত যে সতেরো জনের কংগ্রেস স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেছেন তার মধ্যে অধিকাংশই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দেননি। সুতরাং এই সব তথ্যের ভিত্তিতে মজুমদার যুক্তিসংগত ভাবেই বেশান্ত তথা সীতারামাইয়রা বক্তব্য নাকচ করে দিয়েছেন। (মজুমদার, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৫২৬)।

কেউ কেউ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দাদাভাই নাওরোজীর উপর অর্পণ করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর সমসাময়িক কংগ্রেসের অপর এক নেতা দীনশা ওয়াচাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার সুস্পষ্ট উত্তর দেন, "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার চিন্তা হিউম করেছিলেন, দাদাভাই নাওরোজী নন"। (উদ্ধৃতির জন্য, ঐ পৃঃ ৫২৭)

তবে রমেশচন্দ্র মজুমদার যে মনে করেন কলকাতায় ১৮৮৩ সালে অনুষ্ঠিত ন্যাশানাল কনফারেন্স কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার চিন্তার উদাহরণ জুগিয়ে ছিল এমন কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ হিউমের কোনো বক্তব্যে অথবা তাঁর জীবনীকারের লেখায় পাওয়া যায় না।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক ডেভিড টেলর (Daid Taylor) কংগ্রেস শতবর্ষ উপলক্ষে ইংরাজী অমৃতবাজার পত্রিকায় (২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫) একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাতে তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউম ও ডাফরিনের ভূমিকার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তাঁর ভাষায় "ডাফরিনের সাথে হিউমের প্রাথমিক যোগাযোগ-এর জন্যই কংগ্রেসের উৎপত্তি বিষয়ে কিছু "মীথ" (Myth) বা অতি কথনের সৃষ্টি হয়েছে। হয় এর পেছনে সরকারের উদ্যোগ ছিল অথবা ডাফরিনের পরামর্শে সামাজিক সংস্কার সংস্থার (Social Reform Organisation) পরিবর্তে রাজনৈতিক সংস্থা গঠনে সিদ্ধান্ত নেন"। টেলর মনে করেন এর কোনোটাই ঠিক নয়। হিউম "যদিও ব্রিটিশ যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন তথাপি তাঁর প্রাথমিক যোগাযোগ কলকাতা এবং সিমলার অফিসারদের সাথে ছিল না, ছিল তাঁর সমসাথী রাজনৈতিক সহকর্মীদের সাথে। তিনি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন ছাড়া কিছুতেই কাজে নামতে পারতেন না"।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিউমের জীবনীকার উইলিয়াম ওয়েডারবার্নের মতে হিউমের ইচ্ছা ছিল কংগ্রেস কেবল সামাজিক সংস্কারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবে।

সামাজিক প্রশ্নে তিনি (হিউম) যখন সংস্কারমূলক প্রচারের দিকে আগ্রহী হয়ে ছিলেন তখন বাহ্যতঃ লর্ড ডাফরিন-এর উপদেশক্রমে তিনি প্রথমে রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের কাজটি হাতে তুলে নিয়েছিলেন। (উদ্ধৃতির জন্য, ব্রিটিশ প্যারমাউন্টসী এণ্ড ইণ্ডিয়ান রেনাসাঁস-২, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পৃঃ৫৩০, সংস্করণ, ১৯৬৫)

অবশ্য ওয়েডারবার্নের প্রকাশিত গ্রন্থের (১৯১৩) পূর্বে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লু. সি. বোনার্জী) ১৮৯৮ সালে জি. এ. নটেশন সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান পলিটিকস্" গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন যে লর্ড ডাফরিনই হিউমকে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন কংগ্রেসের ন্যায় একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করতে।" অনেকের নিকট এটা একটা সংবাদ বলে মনে হবে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যা প্রাথমিক ভাবে শুরু হয়েছিল এবং যা এখনও চলছে, তা হল প্রকৃত পক্ষে মার্ক্ইস অব ডাফরিন এণ্ড আভা (Marquis of Dufferin and Ava)-রই কাজ, যে সময়ে সেই মহত ব্যক্তি ভারতে গবর্নর জেনারেল ছিলেন।" উমেশচন্দ্রের মতে হিউম চেয়েছিলেন বছরে একবার নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদরা কোনো একস্থানে মিলিত হয়ে সামাজিক সমস্যা নিয়ে যেন আলোচনা করেন। কিন্তু ডাফরিনের এধরনের কোনো পরিকল্পনা মনঃপুত ছিল না। "লর্ড ডাফরিন

বিষয়টি সম্পর্কে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং বেশ কিছু সময় ভাবনা-চিন্তা করার পর মিঃ হিউমকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর মতে মিঃ হিউমের পরিকল্পনা খুব একটা কার্যকরী হবে না। তিনি (ডাফরিন) বলেছিলেন, ইংলণ্ডের সরকারী বিরোধী পক্ষের মত কাজ করার অনুরূপ গণসংস্থা নেই...... এটা তাঁদের এবং শাসিতের উভয়ের স্বার্থেই ভাল হবে যদি ভারতীয় রাজনীতি-বিদরা একবার মিলিত হয়ে সরকারকে দেখিয়ে দেন কোথায় কোথায় তাঁদের শাসন ত্রুটিপূর্ণ এবং কি ভাবে তার উন্নতি করা যাবে? এর সাথে তিনি আরো যোগ করলেন যে, স্থানীয় গবর্ণরের পক্ষে তাঁর (ডাফরিন) পরিকল্পিত অ্যাসেম্বলী বা সভায় সভাপতিত্ব করা উচিত হবে না। কেন না, সেক্ষেত্রে তাঁর (গবর্নর) উপস্থিতিতে সাধারণ মানুষ মন খুলে কথা নাও বলতে পারে। ......লর্ড ডাফরিন মিঃ হিউমের কাছে শর্ত করিয়ে নিয়েছিলেন যে, যতদিন তিনি এদেশে থাকবেন ততদিন যেন তাঁর নাম প্রকাশ না করা হয়।" (উদ্ধৃতির জন্য, ইণ্ডিয়া টুডে, রজনীপাম দত্ত, পৃ-৩১৪-৩১৫, সংস্করণ, ১৯৭৯)

অধ্যাপক সুন্দর রাজনের মতে হিউম চেয়েছিলেন লণ্ডনে ভারতীয়দের স্বার্থে জনমত সংগঠন করতে। কিন্তু ডাফরিন তাঁকে বারণ করেন এবং পরামর্শ দেন ভারতের অভ্যন্তরে জনমত সংগঠিত করতে। তাঁর লক্ষ্য ছিল হিউমের সাহসী নেতৃত্বে ভারতের অগ্রগামী চিন্তার ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে উঠুক এক জাতীয় সংস্থা (রাইজ এণ্ড গ্রোথ অব দি কংগ্রেস ইন ইণ্ডিয়া, এ. ভুজ এণ্ড মুখার্জী, পৃ. ১২২-২৪)

রজনীপাম দত্ত উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়-এর রচনার উপর ভিত্তি করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ডাফরিনের ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েছেন, যেমনটি করেছেন এস. আর. মেহরোত্রা তাঁর "দি ইমারজেন্স অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস" (১৯৭১) গ্রন্থে। মেহরোত্রার সিদ্ধান্তের ভিত্তি রিপনকে লেখা হিউমের ১৩ জানুয়ারী, ১৮৮৯-এর পত্র। তাঁর মতে হিউম এ ব্যাপারে ডাফরিনের মত চেয়েছিলেন এবং বোম্বাইয়ের ছোটলাট লর্ড রিএ (Reay)-র সভাপতিত্বের প্রস্তাব ছাড়া অন্য ব্যাপারে সম্মতিও পেয়েছিলেন।

"দেশ" পত্রিকার কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যায় (১৯৮৫) অমলেশ ত্রিপাঠী "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯০৭)" নামক প্রবন্ধে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় লর্ড ডাফরিনের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে "হিউম যাই বলুন এবং উমেশচন্দ্র যাই লিখুন না কেন, ডাফরিন কোনদিন চাননি এ ধরনের সভা রাজনৈতিক আলোচনায় নামুক";

প্রবন্ধের অন্যত্র অধ্যাপক ত্রিপাঠী লিখেছেন, "আসলে ডাফরিন কোনও দিন এ রকম প্রতিষ্ঠান ত চানইনি, পরেও তাকে সমালোচনার দৃষ্টিতেই দেখেছেন"। তিনি ১৮৮৮ সালের ৩০শে নবেম্বর ডাফরিনের প্রদত্ত ভাষণকে নিজের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে খাড়া করেছেন। ত্রিপাঠীর ভাষায়, "ডাফরিন যদি কংগ্রেসের মত কোনো প্রতিষ্ঠান হোক চাইতেন তাহলে ১৮৮৮-র ৩০ নবেম্বর সেণ্ট অ্যানড্রুজ ডে ডিনার বক্তৃতায় তাকে 'আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি' বলে উপহাস করতেন না"।

লণ্ডন প্রবাসী অধ্যাপক অনিল শীল "দি ইমারজেন্স অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম" গ্রন্থে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কথিত ডাফরিনের ভূমিকাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি ডাফরিনের ভূমিকাকে একটি বহুল প্রচারিত 'মীথ' (Myth) বা অতিকথন বলে অভিহিত করেছেন। হিউমের কাছ থেকে শোনা কথার ভিত্তিতেই উমেশচন্দ্র তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু শীল খোদ হিউমের বক্তব্যকেই চ্যালেঞ্জ জানালেন। তাঁর কারণ হিউমের সত্যবাদিতা অনিল শীলের মতে মোটেই সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল না। প্রমাণ হিসেবে পেশ করলেন ১৮৮৬ সালে ২রা জুন তারিখে ডাফরিনকে লেখা মেইনের (Maine) হিউম সম্পর্কে অপ্রীতিকর মন্তব্য মেইনের মতে হিউম এক "মস্ত মিথ্যাবাদী" ("greatest liar")। শীল মনে করেন ডাফরিনের সাথে সাক্ষাতের বহু পূর্ব থেকে হিউম কংগ্রেসকে একটি রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা চিন্তা করেছিলেন। সমাজ সংস্কারক এবং সম্পাদক বি. এম. মালাকরীকে হিউম সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫) যে সামাজিক সমস্যার আলোচনা থেকে এ ধরনের জাতীয় সংস্থা বহু দূরে থাকবে। পক্ষান্তরে ডাফরিন "সব সময়ে দুঃখ করেছেন যে" কংগ্রেস সামাজিক বিষয়গুলিকে "অবহেলা করেছে"। অধ্যাপক শীল কলকাতায় "সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডে ডিনার" (Saint Andrews Day Dinner, ১৮৮০, ৩০শে নবেম্বর)-এ প্রদত্ত ডাফরিনের ভাষণ থেকে উপরোক্ত উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও ওই একই উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ "ব্রিটিশ প্যারামাউণ্টসী এণ্ড ইণ্ডিয়ান রেনাসাঁস—২-এর ৫৩১ পৃষ্ঠায়। তাঁরও উৎস ওই সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডে ডিনারে প্রদত্ত ডাফরিনের ভাষণ। তবে তিনি লিখেছেন অনিল শীলেরও তিন বছর পূর্বে (১৯৬৫)। মজুমদার ডিনারে প্রদত্ত ডাফরিনের ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন (যে কথা

অধ্যাপক শীলও তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন) যে, তাঁর (অর্থাৎ ডাফরিনের) মনে হয়ে ছিল কংগ্রেসের উচিত হবে কেবলমাত্র সামাজিক প্রশ্নগুলির প্রতি দৃষ্টি দেয়া। সুতরাং ডাফরিনের ভূমিকা সম্পর্কে যদি কিছু "মীথ" গড়ে উঠে থাকে তবে তা অনিল শীলের পূর্বেই মজুমদার আবিষ্কার করেছিলেন।

মজুমদারের ধারণা হিউম মনে করতেন না কংগ্রেস একেবারে একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠুক। তবে তিনি ডাফরিনের বক্তব্য সত্বেও তাঁর ভূমিকাকে একেবারে উড়িয়ে দেননি। মজুমদারের ভাষায় "এই পরিকল্পনায় ডাফরিনের অংশগ্রহণকে সম্ভবতঃ ভুল বোঝা হয়েছে অথবা অতিরঞ্জিত করে দেখা হয়েছে।" স্বভাবতঃই অনিল শীলের ডাফরিন সংক্রান্ত আলোচনা পড়লে মনে হবে তিনি রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। যদিও গ্রন্থে তার কোনো স্বীকৃতি নেই।

বিপানচন্দ্র "দি টেলিগ্রাফ" পত্রিকায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় ডাফরিনের ভূমিকাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায় "ডাফরিনের ব্যক্তিগত কাগজ-পত্র যা ১৯৫০-এর শেষের দিকে গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে তা' একবার চোখ বুলোলেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় ডাফরিনের সমর্থন বা উদ্যোগ সম্পর্কিত 'মীথে'র বা অতিকথনের অবসান ঘটবে।" ওই একই প্রবন্ধে তিনি জোরের সাথে বলেছেন যে ডাফরিন কোনোরকমেই কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। (Nor were Dufferin sympathetic to the Congress···) বিপানচন্দ্রের মতে কেবল ১৮৮৮ সালেই নয় ডাফরিন তার পূর্বেও ১৮৮৫ সালের মে মাসে (কোনো তারিখ উল্লেখ করেননি) বোম্বের গবর্ণর লর্ড রিএকে সাবধান করে দিয়েছেন যেন সরকারী কর্মচারীরা কংগ্রেসের সাথে নিজেদের মিশিয়ে না ফেলেন, অর্থাৎ বিপানচন্দ্রের বক্তব্য ডাফরিন শুধু নিজেই নন সকল সরকারী কর্মচারীকেও কংগ্রেস থেকে সতর্ক ও তফাতে থাকতে উপদেশ বা পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু কৌতূহলের বিষয় ডাফরিনের ব্যক্তিগত কাগজ-পত্র (Private Papers) পণ্ডিতদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার পরও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত অধ্যাপক বি. এন. পাণ্ডে এবং খ্যাতনামা রাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ কে. পি. করুণাকরণ (K. P. Karunakaran) যথাক্রমে তাঁদের ১৯৬৯ (The Break-up of British India) এবং ১৯৬৪ সালে (Continuity and Change in Indian Politics) প্রকাশিত গ্রন্থে ডাফরিনের সক্রিয় ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার সোবিয়েত ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা

(কে. আনতোনোভা, জি. বনগার্ড-লেভিন, জি. কোটোভস্কি) ১৯৭৮ সালে তাঁদের লেখা "হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া"-র দ্বিতীয় খণ্ডে ডাফরিনের ভূমিকাকে মোটেই নস্যাৎ করেননি। তাঁদের মতে কংগ্রেস তৈরী হয়েছিল সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এবং ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের অনুরোধেই হিউমকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল। ["It (Congress) was set up with the approval of the authorities, and Hume, at the request of the Viceroy, Lord Dufferin (1884—1888) was made its General Secretary." পৃ. ১১৪ ; নতুন সংস্করণ, ১৯৭৯]

অধ্যাপক শীল মেইনের ওই একটি মন্তব্য ছাড়া হিউমের বিরুদ্ধে প্রকৃত কোনো অসত্য ভাষণের উদাহরণ দিতে পারেননি। মনে রাখা প্রয়োজন মেইন এবং তাঁর সমগোত্রীয়রা সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণায় এত ভয়াবহ নিষ্করুণ মনোভাব পোষণ করতেন যে সামান্যতম ঔদার্য্যও তাঁদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিত। এ কারণে ভাইসরয় রিপনকেও "শয়তান" বলতে তাঁদের ভদ্রতায় বাধে নি। (Considered the new viceroy a "dangerous Radical second only in wickedness to Gladstone" ; অনিল শীল ; পৃ. ১৫২-১৫৩)। উল্লেখ্য, মেইন হিউম সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তি ("greatest liar") কিন্তু রিপনের কাছে করতে সাহস পাননি। অথচ তিনি যদি হিউমকে প্রকৃতই এক মিথ্যাবাদী বলে জানতেন তাহলে সত্য ও সাম্রাজ্যের স্বার্থে তাঁর সে কথা রিপনকে অতি অবশ্যই বলা উচিত ছিল।

দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় ডাফরিনের বহুল প্রচারিত ভূমিকাকে "মীথ" বলে অনিল শীল উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও ডাফরিন একেবারে এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন এবং কোনো প্রকার ভূমিকা নেননি তা' কিন্তু একেবারে হলফ করে বলা যাবে না। কংগ্রেস যে রাজনৈতিক ভূমিকা নেবে এ বিষয়ে ডাফরিনের কোনো সংশয় ছিল না এবং তার সদস্যদের সামাজিক সংস্কারের প্রতিই দৃষ্টি দেয়া উচিত এ ধরনের কোনো চিন্তা অন্ততঃ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সাত মাস পূর্বেও তিনি করেননি। অথচ তিনি তখন ইতিমধ্যেই হিউমের কাছ থেকে জেনে ফেলেছেন যে কংগ্রেস অদূর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। শুধু উমেশচন্দ্রের উপরিল্লিখিত বক্তব্য নয়—স্বয়ং ডাফরিনের লেখা চিঠিও এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। বোম্বাইয়ের গবর্ণর রিএ-কে লেখা (১৭ই মে, ১৮৮৫) এক চিঠিতে ডাফরিন জানাচ্ছেন: "এখানে হিউম নামে এক ভদ্রলোক আছেন আমার সাথে তাঁর সর্বশেষ সাক্ষাতকারে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি

এবং তাঁর বন্ধুরা ডেলিগেটদের নিয়ে এক রাজনৈতিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত করতে চলেছেন। এবং তিনি এটাও জানালেন তাঁরা আপনাকে (রিএ) চেয়ারম্যান হওয়ার প্রস্তাব দেবেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জানাচ্ছি আপনার অবস্থায় এ ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা অসম্ভব। কেননা এ ধরণের অ্যাসেমবলী অথবা জমায়েতের কাজই হবে প্রয়োজনের. তাগিদে সরকারী নীতি ও আইনের সমালোচনা করা এবং যা' মঞ্জুর করা অসম্ভব হবে সে ধরনের দাবি তুলে ধরা ও অন্যান্য সংস্কারবাদী সমিতিগুলির অনুসৃত পদ্ধতি গ্রহণ করা। আমি তাঁকে বলেছি (হিউমকে) এ রকম কর্মসূচীর সাথে কোনো প্রদেশের কার্যনির্বাহী সরকাবের প্রধানকে জড়ানোব চিন্তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।" (মূল ইংরাজী বয়ানের জন্য, ঐ, পৃ ২৭৫) ডাফরিনের উপরোক্ত চিঠিই প্রমাণ কবে যে তিনি হিউমের সাথে রাজনৈতিক কনভেনশন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন—যা' কয়েকমাসের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস রূপে আত্মপ্রকাশ করল এবং তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে সেখানে সবকাবী নিয়ম-নীতির সমালোচনা হবে। আবার এটাও বিশ্বাস করা শক্ত যে হিউম কেবল রাজনৈতিক কনভেনশনেব সংবাদটুকু দেয়ার জন্য ডাফবিনের সাথে দেখা করেছিলেন। বিশেষ করে ডাফবিন যখন ওই চিঠিব শুরুতেই হিউম সম্বন্ধে লিখছেন "রিপন আমাকে বলেছিলেন যে তিনি (হিউম) নেটিভদেব সম্পর্কে অনেক খোঁজ খবর রাখেন এবং আমায় উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁব সাথে মাঝে মধ্যে দেখা করতে এবং আমি আনন্দের সাথে তা' করে লাভবান হয়েছি।" (Which I hane done with bo h pleasure and profit")। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী "দেশ" পত্রিকার (কংগ্রেস সংখ্যা, ১৯৮৫) পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে হিউমের "মাথায় ছিট আছে" ("Seems to have got a bee in his bonnet") বলে ডাফরিন উপবোক্ত চিঠিতে রিএ (Reay)-র কাছে যে মন্তব্য করেছেন, সেটুকুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন (১৭ই মে, ১৮৮৫)। কিন্তু ওই একই চিঠিতে তিনি যে হিউম সম্পর্কে সপ্রশংস এবং সশ্রদ্ধ উক্তি করে বলেছেন যে তাঁর সাথে আলোচনা করে তিনি যথেষ্ট লাভবান হয়েছেন—সে কথাটি অধ্যাপক ত্রিপাঠী তাৎপর্যপূর্ণভাবে চেপে গেছেন।

যাইহোক, ডাফরিনের যেখানে নিজেরই স্বীকৃতি যে তিনি মাঝে-মধ্যে "নেটিভ"দের বিষয় নিয়ে হিউমের সাথে আলোচনা করে লাভবান হয়েছেন, সেখানে এটা খুবই স্বাভাবিক যে হিউম যখন তাঁকে রাজনৈতিক কনভেনশন অনুষ্ঠানের সংবাদ দিতে গেলেন তখন তিনি নিশ্চয় এ বিষয়ে তাঁর সাথে

আলোচনা করে এ ধরনের কনভেনশনের ভাল-মন্দ দিকটা খতিয়ে জেনে নিয়েছিলেন। হিউমের প্রস্তাবিত কনভেনশন যে রাজনৈতিক হবে এবিষয়ে তিনি পূর্ণ রূপে জ্ঞাত ছিলেন। ডাফরিন রিএকে উপরোক্ত পত্রে জানাচ্ছেন, (১৭ই মে, ১৮৮৫), হিউমের প্রস্তাবিত জমায়েত হবে প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজনৈতিক কনভেনশন। (**"he and his friends were going to assemble a Polilical Convention of delegates."**) আর রাজনৈতিক কনভেনশনের কথা শোনার পর কোনো ইংরাজ ভাইসরয় চোখ বুজে বসে থাকবেন অথবা আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করবেন, একথা ভাবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। স্বাভাবিকভাবে ডাফরিনও তা' করেননি। তিনি বোধগম্য কারণেই হিউমকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এ ধরনের কোনো কনভেনশনে সরকারী প্রতিনিধিকে সভাপতিত্ব করতে আহ্বান না জানতে। অবশ্য তিনি এর একটা গণতান্ত্রিক যুক্তিও দেখিয়ে ছিলেন। কেন না তাহলে "তাঁর উপস্থিতিতে মানুষ মন খুলে নাও কথা বলতে পারে।" (**"for in his presnce the people might not like to speak out their minds."**)

যদিও ডাফরিন সরকারের প্রধান হিসেবে হিউমের রাজনৈতিক কনভেনশনে সরকারী প্রতিনিধিকে সভাপতিত্ব করতে মানা করছেন, তথাপি তিনি এটাও চান যে এধরনের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হোক—অন্তত: রিএকে লেখা (১৭ই মে, ১৮৮৫) চিঠি থেকে এই বক্তব্যই বেরিয়ে আসে। ওই চিঠির কোথাও ডাফরিন বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেননি যে এ ধরনের কনভেনশনের উচিত হবে সামাজিক সমস্যা নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখা, যা' তিনি তাঁর বিদায়-কালীন সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডে ডিনারের ভাষণে পরবর্তীকালে ব্যক্ত করেছিলেন। বরং রিএ-কে লেখা উপরোক্ত চিঠি থেকে দেখা যায় ডাফরিন হিউমের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক কনভেনশনের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কারণ তাঁর কাছে হিউমের প্রচেষ্টাকে মনে হয়েছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিক মুক্তি আন্দোলনের পূর্বে ও'কোনলের প্রচেষ্টার সমতুল। (**"So far as I understood on the lines adapted by O'connell previons to Catholic emancipation."**) ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষে ক্যাথলিক মুক্তি আন্দোলনের গোড়ার কথা ছিল আইরিশ পার্লামেণ্টে প্রোটেষ্টাণ্ট সদস্যদের সাথে রোম্যান ক্যাথলিকদের সমমর্যাদার দাবি।

যে কোনো রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য যেমন সরকারের 'শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলীর সমালোচনা তেমনি ডাফরিনও চেয়েছিলেন কংগ্রেস যেন সরকারের

শাসনতান্ত্রিক কাজকর্ম সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করে। ("it should be allowed to know more and to have ampler opportunities of expressing its opinions on the admiı istrative acts of the government." ক্রশকে লেখা পত্র ডাফরিনের, ১৩ই মার্চ, ১৮৮৮) এর মধ্যে ডাফরিনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও নিহিত ছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল খুবই পরিষ্কার। ১৮৮৬ স্যালের মার্চ মাসে তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্র (স্টিফেন, ৬ই মার্চ; কিমবারলে, ২১শে মার্চ, ১৮৮৬) খুঁটিয়ে পড়লে তা' থেকে জানা যায় তিনি ভেবেছিলেন কংগ্রেস কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন বা সমালোচনার জবাব দেয়ার মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে আরোপিত মিথ্যা বক্তব্যকে খণ্ডন করতে পারবেন এবং ভারতীয় সংবাদপত্রও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে অক্ষম হবে। ("For this would enable the government to corectmis statements and thwart the efforts of the press to engender a widespread feeling of hostilily to British rule." উদ্ধৃতির জন্য, এস. গোপাল, পৃঃ ১৬১) সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৮৮৬ সালেও ডাফরিন কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েছেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল, "আমরা যখন এদের (ভারতীয়দের) শিক্ষিত করছি তখন নিজেদের ঘরোয়া ব্যবস্থা পরিচালনায় আরো অধিক অংশগ্রহণের ইচ্ছাকে আমি যথার্থ এবং যুক্তিসম্মত উচ্চাশা বলে মনে করি।" (কিমবারলের প্রতি ডাফরিনের পত্র, ২৬শে এপ্রিল, ১৮৮৬) ১৮৮৮ সালের মার্চ মাসেও ডাফরিন মনে করতেন সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে কংগ্রেসকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়া উচিত। (ক্রশকে লেখা পত্র, ১৩ই মার্চ, ১৮৮৮) বলা বাহুল্য ক্রশকে লেখা ডাফরিনের উপরোক্ত মন্তব্যের সাথে ১৮৮৫ সালের ১৭ই মে, রিএকে লেখা তাঁর (ডাফরিনের) পূর্বোল্লিখিত পত্রের মধ্যেই একটা সংগতি অতি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। রিএকে ডাফরিন জানিয়েছিলেন হিউম প্রস্তাবিত "অ্যাসেমবলীর কাজই হবে প্রয়োজনের তাগিদে সরকারের নীতি বা আইনের সমালোচনা করা।" লক্ষণীয়, ডাফরিনের এই সব পত্রের মধ্যে কোথাও উল্লেখ নেই যে কংগ্রেসের উচিত হবে "সামাজিক সংস্কারের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখা এবং শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে মাথা গলানো হবে সম্পূর্ণ অনুচিত কাজ।" (ডাফরিনের ভাষণ, সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ ডে ডিনার, ৩০শে নবেম্বর, ১৮৮৮)।

কংগ্রেস যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠুক, এ বাসনাও লর্ড ডাফরিন বহুবার বহুভাবে প্রকাশ করেছেন। মহীশূরের মহারাজা কংগ্রেস ফাণ্ডে

চাঁদা দিলে ডাফরিন তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, রাজ্যের বাইরের রাজনৈতিক কর্মে আগ্রহ প্রকাশ করা রাজন্যবর্গের উচিত হবে না। তবে তিনি একই সাথে এটাও জানিয়েছিলেন ব্রিটিশ ভারতে বসবাসকারী যে কোনো ব্যক্তি এধরনের চাঁদা কংগ্রেসে দিতে পারেন। কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রচার সম্পর্কে ডাফরিন পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিপানচন্দ্র যদিও স্থির নিশ্চিত যে ভাইসরয় ডাফরিন কোনোভাবেই কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না তথাপি কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনো সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণে রাজী ছিলেন না। অন্ততঃ পক্ষে ১৮৮৮ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত। সেন্ট্রাল প্রোভিনসের (অধুনা মধ্যপ্রদেশ) চীফ কমিশনার কংগ্রেসের কাজকর্ম রাষ্ট্রদ্রোহিতার কারণে নিষিদ্ধ করার অনুমতি চাইলে ডাফরিন সরাসরি তা' অগ্রাহ্য করেন। (কলভিনকে ডাফরিনের পত্র, ৯ই অক্টোবর, ১৮৮৮, উদ্ধৃতির জন্য; ব্রিটিশ পলিসি ইন ইণ্ডিয়া; এস. গোপাল, পৃ. ১৭৪-১৭৫) ডাফরিনের ব্যক্তিগত কাগজপত্র যিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন সেই এস. গোপালের দৃঢ় ধারণা ডাফরিনের এ সময়ে কংগ্রেসকে কাছে টানার খুবই চেষ্টা ছিল। ("was one of wooing the congress." ঐ পৃ. ১৭৪) এখনও প্রশ্ন ওঠে অক্টোবর মাস পর্যন্তও যে ডাফরিন কংগ্রেসকে কাছে পেতে চেয়েছেন এবং কোনো বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নিতে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন তিনিই হঠাৎ এক মাস পরে নবেম্বর মাসে বিদায়কালীন ভাষণে (৩০শে নবেম্বর) কেন কংগ্রেসের কঠোর সমালোচনা করলেন সামাজিক সমস্যায় জড়িত না থাকার জন্য ? সেন্ট এণ্ড্রুজ ডে ডিনারে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য: "কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হল, আমি এর কাজকর্ম আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে লক্ষ্য করতাম।...আমার মনে হয়েছিল এই ধরনের সংস্থা যদি দেশপ্রেমের তীব্রতা নিয়ে এইগুলি (সামাজিক প্রশ্ন) এবং সমগোত্রীয় বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেয়—যেমন ইংলণ্ডে এধরনের কংগ্রেসগুলি করে থাকে, তাহলে সরকার এবং এদেশবাসীর প্রভূত সাহায্য হবে।...কিন্তু আমি দুঃখের সাথে না বলে পারছি না যে...তাঁরা এমন বিষয়গুলি নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন যা' আমাদের ক্ষেত্রে খুব কম সাহায্যই করবে।" (উদ্ধৃতির জন্য, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৫৩১) আশ্চর্য লাগে, কেন ডাফরিন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে তাঁর প্রকৃত ভূমিকাকে (যথা, হিউমকে পরামর্শ প্রদান ও আলোচনা) গোপন রাখলেন ? মনে রাখা প্রয়োজন ভারতে থাকাকালীন ডাফরিন কোনো একটি পত্রেও কোনো উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষের কাছে (যথা, রিএ, কলভিন, ক্রশ, কিমবারলে প্রভৃতি) একথা

কখনো বলেননি যে কংগ্রেসের উচিত হবে না রাজনৈতিক কাজকর্মে নিজেদের জড়িয়ে ফেলা। বরং দেখা যায় উল্টো মতামতই তিনি প্রকাশ করছেন।

তাহলে কি এমন ঘটল যা তাঁকে প্ররোচিত করল সম্পূর্ণ একটি অসত্য উক্তি করতে—তিনি ভেবেছিলেন কংগ্রেস সামাজিক সমস্যা নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখবে! ডাফরিনের এই স্বেচ্ছাকৃত অসত্য ভাষণের সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া যাবে কংগ্রেসের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও আমলাতান্ত্রিক সুবিধাবাদী মনোভাবের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে।

ভারতে তাঁর পূর্ববর্তী ভাইসরয় লর্ড রিপনের জনপ্রিয়তাকে ডাফরিন বরাবরই ঈর্ষার চোখে দেখতেন। ভাইসরয় হিসেবে নিজেকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে চিন্তা করতেন। রিপনের বিদায়-প্রাক্কালে ভারতবাসী তাঁকে যে রকম বিরাট ভাবে হার্দিক সম্বর্ধনা দিয়েছিল ডাফরিনেরও সুপ্ত কামনা ছিল তিনিও যেন সেইরকম বিদায়কালীন সম্বর্ধনা লাভ করেন। এস. গোপাল লিখছেন, এ কারণে ডাফরিন ভারতে "তাঁর শেষ বছরটিতে শিক্ষিত ভারতীয় এবং কংগ্রেসের প্রতি প্রীত ছিলেন।" (ব্রিটিশ পলিসি ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৮৫৮-১৯০৫; পৃ. ১৭৩) অবশ্য কংগ্রেসের উপর তাঁর খুব একটা অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণও ছিল না। ১৮৮৭ সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের রিপোর্টে সেখানের গবর্ণর জানালেন—কংগ্রেস নেতারা "অত্যন্ত অনুগত এবং নিরীহ ব্যক্তি" ("a very loyal and harmless set of people")। ডাফরিন এই রিপোর্টের সাথে একমত ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের ওপর এত প্রসন্ন ছিলেন যে অন্যান্য ইংরাজ আমলারা কঠোর মনোভাব নিতে চাইলেও তিনি ঔদার্য দেখানোটাই শ্রেয়ঃ মনে করতেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইংরাজ আমলারা একটা বক্তব্য তুলেছিলেন যে তারা (কংগ্রেসীরা) ভারতে ইংরাজ রাজত্ব ও লণ্ডনের শাসকগোষ্ঠী এবং ইংরেজ জনগণের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে দুরভিসন্ধিমূলক প্রচার চালাচ্ছে এবং সে কারণে তাদের সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব নেয়াই উচিত কাজ হবে। কিন্তু আশ্চর্য-জনকভাবে ডাফরিন এবিষয়ে উদার দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করেছিলেন। (কলভিনকে লেখা ডাফরিনের পত্র, ১৬ই মে এবং ৬ই জুন, ১৮৮৮)

কিন্তু ১৮৮৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে কংগ্রেস সম্পর্কে ডাফরিনের উদার এবং নরম নীতির পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। বিশেষ করে যখন তিনি জানতে পারলেন তাঁর পক্ষে কোনো হার্দিক সম্বর্ধনা লাভ দূরে থাকুক বোম্বাইয়ের কর্পোরেশন তাঁকে বিদায়কালীন মানপত্রও দিতে প্রস্তুত নয়। এস. গোপাল মনে করেন এ কারণেই ক্ষুব্ধ ডাফরিন প্রকাশ্যে সেন্ট এণ্ড্রুজ ডে ডিনার বক্তৃতায় কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন।

ভাইসরয়ের মতে কংগ্রেসের উচিত কাজ হবে রাজনৈতিক দাবি উত্থাপন না করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া। (ব্রিটিশ পলিসি ইন্ ইণ্ডিয়া, পৃ. ১৭৫-১৭৬) রমেশচন্দ্র মজুমদার ও এস. গোপালের মত ডাফরিনের কংগ্রেস বিরোধিতার মধ্যে বিদায় সম্বর্ধনার ঘটনাটিকে একটি অন্যতম হেতু বলে মনে করেন। তাঁর লেখা পূর্বোল্লিখিত পুস্তকের (ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসী এণ্ড ইণ্ডিয়ান রেনাসাঁস-২) ৫৬৮ পৃষ্ঠার ৩৯ নং পাদটীকায় তিনি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কলকাতায় এইচ. পি. ঘোষ নামে জনৈক প্রধান কংগ্রেসসেবী লেখককে জানিয়ে ছিলেন যে তাঁর সংগৃহীত একটি পুস্তকের মধ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ এক ইংরাজ ভদ্রলোকের হাতে লেখা একটি মন্তব্য তিনি দেখে ছিলেন। সেই মন্তব্য পাঠ করলে মনে হয় লর্ড ডাফরিন রাজনৈতিক নেতাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষ উদগীরণ করেছিলেন। কেন না তাঁরা লর্ড রিপনের মত তাঁকে বিশালভাবে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে প্রস্তুত ছিলেন না। মজুমদার লিখেছেন যে তিনি নিজের চোখে ওই হাতে-লেখা মন্তব্য কংগ্রেসসেবীর বইতে দেখেছেন।

যাইহোক, কেবল বিদায় সম্বর্ধনা বিরাটভাবে না পেয়ে ক্ষুব্ধ চিত্তে ডাফরিন কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভূমিকার বিরোধিতা করেছিলেন, এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট সন্তোষজনক বলে মনে হয় না। এবং একই কারণে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানটিকেও অস্বীকার করবেন—এটাও খুব একটা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না।

বস্তুতঃ কংগ্রেস তার প্রথম অধিবেশনেই প্রভুভক্তির চরম নিদর্শন প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা সত্ত্বেও সামান্য যে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার দাবিগুলি (যথা, ভারতে শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য রয়েল কমিশন গঠনের দাবি ; ভারতীয় কাউনসিলের বিলোপ ; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি, অযোধ্যা এবং পাঞ্জাবের জন্য লেজিসলেটিভ কাউনসিলগুলিতে আনুপাতিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাজেট আলোচনা ও প্রশ্ন করার অধিকার প্রভৃতি) উত্থাপন করেছিল তাতেই ইংলণ্ডের উগ্র সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাদের যোগ্য মুখপত্র লণ্ডনের "দি টাইমস" পত্রিকা সম্পাদকীয় নিবন্ধে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও তার দাবিগুলিকে তীব্র আক্রমণ করে লিখল, কংগ্রেসের উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি মেনে নেয়ার অর্থ হবে ভারতে হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন। কংগ্রেসের প্রথম দু'টি অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট নরম এবং নিরীহ হলেও ডাফরিনের ঠিক মনঃপূত হয়নি। তাঁর মতে কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি খুব

লম্বা-চওড়া। ("extravagant pretensions as embodied in their resolutions." ক্রশকে ডাফরিনের পত্র, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭) তা' ছাড়া জনসভার মাধ্যমে কংগ্রেসের প্রচার পদ্ধতিও ডাফরিনের অপছন্দ ছিল। ১৮৮৮ সালে বোম্বাই পুলিশের কাছে প্রদেশের সর্বত্র কংগ্রেস অনুষ্ঠিত জনসভার সংবাদ পৌঁছাচ্ছিল। ১৮৮৭ সালে দেশীয় ভাষায় সহজ ভংগীতে কংগ্রেস প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে এক দাবিপত্র প্রকাশ করে। অনিল শীল লিখেছেন, এধরনের খোলাখুলি পুস্তিকা হাজারে হাজারে দেশময় ছড়ানো হয়েছিল এবং ১৮৮৮ সালের গোড়ার দিকের মাসগুলোয় সক্রিয় প্রচারের ভাষা জুগিয়ে ছিল। "এটাই শেষ পর্যন্ত কলভিন (লেফটন্যাণ্ট গবর্ণর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) এবং ডাফরিনকে নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে ছিল যে ক্রমশঃ কংগ্রেস হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং একে আর অনুগ্রহ দেখানো উচিত হবে না।" (অনিল শীল, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ২৯৪) কংগ্রেস সম্পর্কে ডাফরিনের শুরুতে ধারণা ছিল যে নেতৃত্ব নরমপন্থীদের হাতে থাকবে কিন্তু শেষের দিকে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ চরমপন্থীদের হাতে চলে যাচ্ছে। (ঐ; পৃ. ১৯০) সুতরাং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে ঝানু আমলা হিসেবে ডাফরিন স্বভাবতঃই প্রকাশ্যে এধরমের প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজের জড়িত থাকার ঘটনাকে যে অস্বীকার করবেন, এতে আর বিচিত্র কী?

কংগ্রেস সম্পর্কে ডাফরিন শেষের দিকে প্রায় আতংকে ভুগতেন। তাঁর ধারণা জন্মেছিল, কংগ্রেস কেবল গণ-বিদ্রোহ নয় "সামরিক বিদ্রোহের চাবিকাঠিও করায়ত্ত করেছে।" ("hold in their hands the keys not only of a popular insurrection but of a military revolt."; ঐ, পৃ. ২৯৪, পাদটীকা।) অনেকটা সেই ফ্রাংকেনস্টাইনের মত। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে দেখে ভীত, আতংকিত।

কংগ্রেস সম্পর্কে লর্ড ডাফরিনের প্রতিকূল মনোভাব যে খুব শেষের দিকে তৈরী হয়েছিল তার এক পরোক্ষ প্রমাণও হিউমের পত্র থেকে জানা যায়। ডাফরিনের বিখ্যাত সেণ্ট অ্যানড্রুজ ডে ডিনার বক্তৃতার মাত্র পঁচিশ দিন পূর্বে ৫ই নবেম্বর, ১৮৮৮ হিউম বদরুদ্দীন তায়েবজীকে এক পত্রে জানাচ্ছেন, "একটা গোপন ব্যাপার এই সপ্তাহে মাত্র জানতে পারলুম। লর্ড ডাফরিন এখন আমাদের বিরুদ্ধে।" ("Lord Dufferin is now against us."; ঐ, পৃ, ১৯০। "এখন" শব্দটির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। অনিল শীল "now" শব্দটিকে বাঁকা ছাঁদে লিখেছেন।) বিপানচন্দ্র তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে লিখেছেন, ১৮৮৫ সালের মে মাসের শেষ থেকে হিউমের সাথে ডাফরিনের সম্পর্ক শীতল হচ্ছিল এবং

তিনি হিউমকে তফাতে রাখতে শুরু করেছিলেন। ("In fact from the end of May, 1885, Dufferin had grown cool to Hume and began to keep him at arms length.") কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডাফরিনের সাথে ১৮৮৮ সালের নবেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত হিউমের মোটামুটি সুসম্পর্ক বজায়ই ছিল। মাঝে মাঝে মতান্তর ঘটেছে তবে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো অবনতি ঘটেনি বলা চলে। ১৮৮৫ সালের কথা দূরে থাকুক ডাফরিনের ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ১৮৮৬ সালের শেষের দিকে তিনি হিউমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তাঁর লেখা "দি ষ্টার ইন্ দি ইষ্ট" (The star in the East) পুস্তিকার জন্য। ডাফরিনের ধারণা এই পুস্তিকা ভারতীয়দের সাথে ইংরেজদের ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে অনেক সাহায্য করবে। (এস. গোপাল; পৃ. ১৬৪) উচ্ছ্বসিত ডাফরিন ১৮৮৬ সালের ২৭শে অক্টোবর হিউমকে একপত্রে সরাসরি লিখলেন, "আমি আপনার আন্তরিক নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়েছি।" (ঐ)। এস. গোপালের মতে দু'জনের হৃদ্যতার সম্পর্ক আরো এক বছর চলেছিল অর্থাৎ ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত। (ঐ; পৃ. ১৬৫) এমন কি ১৮৮৮ সালের ১১ই নবেম্বর "দি ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকায় হিউমকে দেখা যায় এক প্রবন্ধ মারফত ডাফরিনের শাসনব্যবস্থাকে প্রশংসা করতে।" এ ছাড়া, এও মনে করা হয় তিনি অনেক দিক থেকেই শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য এবং অনেক বিষয়ে ভারতীয় জনগণের কৃতজ্ঞতাই।" (ঐ, পৃ. ৩৫৬; ২৭৩ নং পাদটীকা)।

যাইহোক, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত কতটা সরকারের বশংবদ জনসংযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারবে সে বিষয়ে আমলাতান্ত্রিক সন্দেহ ডাফরিনের প্রথম থেকেই ছিল। একারণেই তিনি (উমেশচন্দ্র বোনার্জীর বক্তব্য অনুযায়ী) হিউমকে অনুরোধ করেছিলেন ভারতে অবস্থানকালীন তাঁর নাম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যেন প্রকাশ না করা হয়। (রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ৫৩০) সেন্ট অ্যানড্রুজ ডে ডিনারের বক্তৃতাটি ছিল পুরো রাজনৈতিক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং নিজেকে সাধু সাজানোর জন্যেই ডাফরিন উক্ত বক্তৃতাটি (৩০শে নবেম্বর, ১৮৮৮) দিয়েছিলেন। তাঁর কারণ বক্তৃতাটি দেয়ার তিন দিন পরেই তিনি এর একটি কপি ভারত সচিব ক্রশকে পাঠান। মুখবন্ধে লেখেন, কংগ্রেস ক্রমশঃ হোমরুল আন্দোলনের দিকে বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকছে। এ কারণে "আমি (ডাফরিন) মনে করি (স্বদেশ) প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এটি আমার কর্তব্য কংগ্রেসের দাবিগুলি যা খুব আতিশয্যপূর্ণ হুককারজনক তার

ওপর আপনাকে কিছুটা আলোকপাত করা। এইজন্য কলকাতায় স্কচ ডিনার সভার সুযোগ নিয়ে একটি বক্তৃতা দিই যার কপি আপনাকে এবং আপনার কাউনসিলের সদস্যদের কাছে পাঠাচ্ছি।" (ডাফরিনের পত্র ক্রশকে, ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮৮; উদ্ধৃতির জন্য রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ: ৫৫৮)

ডাফরিনের এধরনের কাজ যে তাঁর চরিত্রের সাথে খুব অসংগতিপূর্ণ একথা মনে হয় না। যখন দেখি তিনি উক্ত পত্রে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন নিজের সম্পর্কে প্রশংসাসূচক এই কথাগুলি লিখে—"আমি সত্যই কৃতজ্ঞ যখন দেখি ভারত থেকে বেরিয়ে এসেছি…নিজের খ্যাতি এবং সম্মানের ওপর খুব কোনো গভীর দাগ না রেখে।" ("Without any very deep scratches on my credit and reputation."; এস. গোপাল; পৃ. ১৭৮) সুতরাং এটা কোনোভাবেই আশা করা যায় না যে ডাফরিন উপরোক্ত ডিনার বক্তৃতায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর ধাত্রী মাতার ভূমিকা স্বীকার করবেন।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি শুধু ওয়াকিবহাল ছিলেন না হিউমের সাথে আলোচনাও করেছিলেন। হিউমকে যদি জন্মদাতা বলা যায় তবে ডাফরিনের ভূমিকা প্রথম দু'টি বছরে (১৮৮৫-১৮৮৭) নিঃসন্দেহে ছিল ধাত্রীমাতার। এটি কোনো "মীথ" নয় যা অনিল শীল তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইতে বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন। ডাফরিনের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক সত্য। পার্শীভাল স্পীয়ার ১৯৭৮ সালে তাঁর "হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া—২" বইটির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। গ্রন্থপঞ্জীতে তিনি অনিল শীলের উপরোক্ত পুস্তক "দি ইমারজেন্স অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম" গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এতৎ সত্ত্বেও স্পীয়ার (Percival Spear) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় ডাফরিনের ভূমিকাকে স্বীকার না করে পারেননি। তাঁর মতে "ভাইসরয় ডাফরিনও একে (কংগ্রেসকে) সতর্কতার সাথে প্রাথমিক সম্মতি দিয়েছিলেন।" ("The Viceroy Dufferin even gave it guarded initial approval."; P. 170; Penguin, 1978)

তবে হিউমের জীবনীকার ওয়েডারবার্ণ যে বলেছেন হিউমের লক্ষ্য ছিল প্রস্তাবিত কংগ্রেস কেবল সামাজিক সংস্কারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে, এ বক্তব্যও সঠিক নয়। হিউমের সমালোচক অনিল শীলকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে হিউম ছিলেন ভারতীয়দের প্রতি খুবই আন্তরিক। "উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হেনরী বেভারেজ এবং হেনরী কটনের মত যে সব ব্যক্তিরা শিক্ষিত ভারতীয়দের সাথে সহযোগিতা করার বিশ্বাস

রাখতেন ঠিক তাঁদের মতই ভারতের প্রতি তাঁর (হিউমের) সহানুভূতি ছিল বাস্তব।" (অনিল শীল, পৃ. ২৭১) শীলের মতে র‍্যাডিকাল পিতার প্রভাবে হিউম ছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে এদেশবাসীর প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন। হিউম এ দেশে এসেছিলেন মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) পূর্বে এবং সংকটের সময়ে তাঁর সাহসের অভাব ঘটেনি। তথাপি তিনি অন্য রাজপুরুষদের মত এদেশবাসীর প্রতি হিংসাপরায়ণ ছিলেন না। তিনি যথেষ্ট নরম দৃষ্টিভংগী নিয়েছিলেন। মহাবিদ্রোহ থেকে তিনি শেখার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে একটা আতংক গ্রাস করে বসেছিল। সব সময়ে তাঁর মনে হত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বোধহয় ভারতে এক ধ্বংসের মুখে পড়তে চলেছে! একে কে বা কারা রক্ষা করবে? তবু মহাবিদ্রোহের সময়ে জনগণের এক অংশ এবং রাজন্যবর্গ ছিল। কিন্তু এখন? মহাবিদ্রোহের পর ভারতে যে নতুন শিক্ষিত প্রজন্মের উদ্ভব ঘটেছে তারা বিপজ্জনকভাবে ক্রমশঃ শাসক সম্প্রদায় থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এর একটা বিহিত করা প্রয়োজন। ১৮৭২ সালে ১লা অগাস্ট ভাইসরয় নর্থব্রুককে হিউম এক চিঠি লিখে তাঁর আশংকা জানাচ্ছেন। তাঁর মতে ভারতে যদি এই মুহূর্তে কোনো বিপদ দেখা দেয় তাহলে কোনো ভারতীয়কে পাশে পাওয়া যাবে না। বিশ বছর পূর্বেও যে আনুগত্য বোধ ছিল এখন তার বিন্দুমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর ভাষায় "সাম্রাজ্যের ভাগ্য দাঁড়িপাল্লার মত কাঁপছে। একটা চাকায় একটা পাথর পড়ে গেলেই গোটা গাড়ীটাই উলটে যাবে।" হিউমের ধারণা ব্রিটিশরা আইন প্রণয়ন ও শাসন চালাচ্ছে বেয়োনেট আর কামান দিয়ে। সাধারণ মানুষের অনুভূতির প্রতি দেখাচ্ছে ক্রমাগত অশ্রদ্ধা। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক গণঅসন্তোষ। ("The British were legislating and governing by virtue of their bayonets and artillery and in systematic disregard of popular feeling; and the result was general discontent." এস. গোপাল, পৃ. ১২৪) হিউমের তাই ভাইসরয়কে পরামর্শ যে খুব দেরী হওয়ার আগে প্রজাদের ভালবাসা ও আস্থা যতটা সম্ভব (বিদেশী শাসকের প্রতি) ফিরে পেতে হবে। ভেবে দেখতে হবে শাসনব্যবস্থায় কতটা এদেশবাসীকে সংযুক্ত করা যায়। অধ্যাপক শীলের মতে এক ধরনের আশংকা যেন হিউমকে ধাওয়া করেছিল। আর তার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে তিনি শিক্ষিত ভারতীয়দের দিকেই আশার দৃষ্টি ফিরিয়ে ছিলেন। নর্থব্রুককে লেখা উপরোক্ত চিঠিতে তিনি মতামত জানান এইভাবে—সাম্রাজ্যের কালো দিনগুলোর অবসান ঘটবে এবং শিক্ষার প্রসারই শুধু "আমাদের গৃহীত ব্যবস্থা-

গুলোকে প্রশংসা করতে শেখাবে।" পরের দিকে হিউম নিজেকে শিক্ষিত ভারতীয়দের মুখপত্র হিসেবে জাহির করেছিলেন। (অনিল শীল, পৃ. ২৬৯)

সুতরাং এটা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যখন হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন বছর পূর্বে এধরনের একটি রাজনৈতিক সংস্থা শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের কাছে পত্র মারফত আবেদন রাখেন। ১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ স্নাতকদের উদ্দেশ্যে তিনি যে পত্র লেখেন তাতে সুস্পষ্টভাবে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের ঔচিত্য সম্পর্কে ভেবে দেখতে বলেন। কেন না, হিউমের মতে "বিচ্ছিন্নভাবে ছিটিয়ে থাকা ব্যক্তি যত যোগ্য বা বিচক্ষণ্ হোন এককভাবে তিনি শক্তিহীন। প্রয়োজন হল ঐক্যের, সংস্থার এবং এগুলো অর্জন করতে গেলে দরকার একটি সমিতির যাকে তৈরী করতে হবে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে। কেন না, এর লক্ষ্য হবে ভারতের জনগণের মানসিক, নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতি বিধানের। (পত্রের উদ্ধৃতির জন্য, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ৫২৯)। হিউম নিজেও বলেছেন আমাদের (ইংরাজদের) নিজেদের কাজকর্মের দরুন যে ভয়ারহ শক্তির উদ্ভব ঘটেছে তার হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে জরুরী প্রয়োজন সেফটি ভালভের। আমাদের কংগ্রেস আন্দোলনের চেয়ে দক্ষ সেফটি ভালভ বোধ হয় আবিষ্কার করা যাবে না"। (**no more efficacious safety valve than our congress movement could possibly be devised."**)

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে হিউম ও ডাফরিন যদি সক্রিয় ভূমিকা নাও নিতেন তাহলেও তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ ধরনের একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত এ বিষয়ে কোন ভারতীয় বা ভারতীয়রা নেতৃত্ব নিতেন। সেক্ষেত্রে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে হিউমের সপক্ষে যে কৃতিত্বের উল্লেখ করেছেন তা' কিছুটা অতিশয়োক্তি মনে হয়। গোখলে ১৯১৩ সালে বলেন, কোনো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন করতে পারতেন না। যদি কোন ভারতীয়…সমগ্র ভারতকে কেন্দ্র করে এধরনের আন্দোলনের শুরু করতে এগিয়ে আসতেন তা হলে রাজকর্মচারী তা' করতে অনুমতি দিতেন না। যদি কংগ্রেসের *প্রতিষ্ঠাতা একজন মহত ইংলিশম্যান এবং প্রাক্তন* রাজকর্মচারী না হতেন তাহলে সে সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনকে এত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা হত যে কর্তৃপক্ষ কোনো না কোনো উপায়ে সেই আন্দোলনকে দমন করতেন"। (গোখলের বক্তব্য, ফ্রিডম ষ্ট্রাগল, বিপান চন্দ্র এবং অন্যান্য, পৃঃ ৫৭)

বিপানচন্দ্র "দি টেলিগ্রাফ" পত্রিকার অপর-এক প্রবন্ধে (৩১শে মে, ১৯৮৫) গোখলের বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেছেন সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য তিনি এবং অন্যান্য "সাহসী এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ" (Caurageous and Committed) ব্যক্তিরা (যথা, দাদাভাই নাওরোজী, জাস্টিস রানাডে, ফিরোজশাহ মেহতা প্রমুখ) হিউমের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। প্রথমের দিকে এর প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বুঝেছিলেন। বিপানচন্দ্রের মতে কংগ্রেসের এই সব নেতারা হিউমকে "বিদ্যুত সঞ্চালক" (lightning conductor) হিসেবে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। এবং পরবর্তী ঘটনার বিকাশ কংগ্রেস নেতাদের আশাকেই পূর্ণ করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদীদের অনুমতি ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের জন্য কোনো রাজনৈতিক দল সংগঠিত করা যায় না এক অদ্ভুত তত্ত্ব যা' ইতিহাসের দিক থেকে শুধু অসমর্থিত নয় অসম্ভবও বটে। কারণ তা' যদি ঘটত তাহলে কোনো দেশই মুক্তির জন্য লড়াই করে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারত না। প্রায় সমসাময়িক সময়ে অস্ট্রিয়ার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ম্যাজিনি (Mazzini) মার্সাইতে নির্বাসনে বাস করে ইতালীর প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য ১৮৩০ সালে গড়ে তোলেন "তরুণ ইতালী" (Young Italy) আন্দোলন। মাত্র তিন বছরের মধ্যে ইতালীতে এর সদস্য ষাট হাজারে দাঁড়ায় এবং ডেভিড থমসনের মতে প্রায় সমস্ত ইতালী শহরেই তৈরী হয়েছিল স্থানীয় কমিটি। এর জন্য নিশ্চয় কোনো অস্ট্রিয়বাসী বা অস্ট্রিয় সরকারের অনুমতি ম্যাজিনিকে নিতে হয়নি!

তবে একথা সত্য হিউম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়ে প্রকৃত কংগ্রেস যা' ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে পারত তার বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে কিছুকালের জন্য রোধ করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। একদিক থেকে বলা যায় তিনি পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছিলেন।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে হিউম এবং ডাফরিন কেন কংগ্রেসের মত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে এক জরুরী প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন? এটা নিশ্চয় করে বলা যায় দেশের তৎকালীন অবস্থা জনমতকে ক্রমশঃ সরকার-বিরোধী করে তুলছিল এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বিশেষ কারণ ঘটাতে পারত এমন সম্ভাবনা ডাফরিনকে বিচলিত করেছিল। সে সাত খণ্ড রিপোর্ট হিউম পাঠ করেছিলেন, সে ধরনের অন্য কোনো রিপোর্ট সরকারী গোয়েন্দা দপ্তর

মারফত ডাফরিনের কাছেও হয়ত পৌছে থাকবে—তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্য একটা বিষয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে ওয়েডারবার্নের বক্তৃতা থেকে বোঝা যায় পরোক্ষভাবে লর্ড ডাফরিন ১৮৮৫ সালে সম্ভাব্য রুশ আক্রমণ সম্পর্কে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেসের মত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের রাজনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশদের অনুকূলে নিয়ে আসতে। অধ্যাপক নন্দলাল চ্যাটার্জীর মতে ভারতবর্ষে সম্ভাব্য রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ ব্যবস্থা হিসেবে কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে লর্ড রিপণের মন্তব্য তুলে ধরেছেন। "...রুশরা যত আমাদের সীমান্তের কাছে আসবে তত তারা চেষ্টা করতে পারে আমাদের রাজ্যের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্র মারফত অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে এবং এ কারণে প্রধান প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল কিভাবে এই ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করা যাবে এবং তাকে পরাস্ত করা যাবে।" রমেশচন্দ্র মজুমদার নন্দলাল চ্যাটার্জীর মতামতকে অগ্রাহ্য করলেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন কংগ্রেস তার প্রথম যুগে রুশ-বিরোধী এবং ব্রিটিশ প্রশংসার প্লাটফরম হিসেবে কাজ করেছিল। (ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসী প্রভৃতি পৃঃ ৫৩৫-৫৩৬) কেবলমাত্র রুশ আক্রমণের সম্ভাবনাকে মোকাবিলা করার জন্য কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল এ ধরনের মন্তব্যকে নিশ্চয় কিছুটা সরলীকরণ বলে মনে হয়। দেশের বিগত পঞ্চাশ বছরের অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ সম্পর্কে ডাফরিন কোনো ধ্যান-জ্ঞান দেবেন না একথা ভাবা খুবই শক্ত।

১৮৬০ সাল থেকে ব্রিটেনের অর্থনীতি ক্রমশঃ ধনতন্ত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে পৌছাচ্ছিল। ফলে এদেশের অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক জীবনেও তার চাপ ও শোষণ অনুভূত হতে লাগল। ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠন অব্যাহত তো রইলই কেবল পদ্ধতি আর আকারে পরিবর্তিত হয়ে আরো তীব্র হল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিস্তৃতভাবে জমি জরিপ ও বন্দোবস্তের ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশবাসীদের ক্ষমতার খুঁটি এদেশে আরো শক্ত হয়ে গেড়ে বসল এবং নতুন ঐতিহাসিক অবস্থার শোষণের যন্ত্রটিও আরো ক্ষুরধার ও নিশ্চিত হয়। ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে ভারতে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের আরো একটি পর্যায় হল এদেশকে পণ্যের বাজারে পরিণত করা। এবং এখান থেকে সস্তায় কাঁচামাল রপ্তানী করা। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ঔপনিবেশিক চরিত্র তথা শোষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি ১৮৭৯ সালে ভারতীয় রপ্তানীর মধ্যে মাত্র আট শতাংশ ছিল উৎপাদিত সামগ্রী কিন্তু

আমদানীকৃত সামগ্রীর মধ্যে পঁয়ষট্টি শতাংশই ছিল বিদেশে প্রস্তুত উৎপাদিত সামগ্রী। ষাটের দশকের মাঝামাঝি গ্রামীন মানুষের উপর চাপল নতুন কর এবং ক্রমশঃ ভূমি-করের হারও দ্রুত বেড়ে চলতে লাগল। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের পরিমাণ ১৮৫৯ সালে ৩৬১ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৮৯০ সালে ৮৫১ মিলিয়ন টাকা হয়ে দাঁড়াল। করের বোঝা বৃদ্ধির পরিমাণ থেকেই বোঝা যায় কিভাবে ভারতবর্ষ এক কৃষিভিত্তিক দেশ কাঁচামালের বাজারে পরিণত হল। দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী এক সুপরিচিত ঘটনা হয়ে দাঁড়াল।

অন্যদিকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষ ব্রিটিশ পুঁজির লগ্নী কেন্দ্র হয়ে পড়ল। ভারতে বৃহৎ ধনতান্ত্রিক উদ্যোগ সমূহ (যথা, কারখানা, রেলপথ, বাগিচা শিল্প) ভারতের জাতীয় ধনতান্ত্রিক বিকাশে সাহায্য করল। স্বভাবতঃই ধনতান্ত্রিক বিকাশ শ্রমিক-শ্রেণীর আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করল এবং সেই সাথে নিয়ে এল নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ। উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারতের কারখানাগুলিতে শ্রম সপ্তাহ ছিল ৮০ ঘণ্টা যেখানে ব্রিটেনে কেবল ৫৬ ঘণ্টা। শ্রম দিবস প্রায় ১৬ ঘণ্টার মত ছিল। ঔপনিবেশিক রূপে জাতীয় পুঁজির কোনো স্বাধীন বিকাশ ঘটে না। তার ভূমিকা মুতসুদ্দী পুঁজির। তাই শ্রমিক-শ্রেণীর আক্রোশস্থল চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্রিটিশ-পুঁজি এবং পুঁজিপতি (দেশী ও বিদেশী)-দের বিরুদ্ধে ধাবিত হল।

নব্যোত্থিত জাতীয় বুর্জোয়ার যে অংশটিকে বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত বলা যায় তাদেরও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি প্রাথমিক অনুরাগ ক্রমশঃ বীতরাগে পরিণত হচ্ছিল। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে তারা উদাসীন ছিলেন, এঁদের কেউ কেউ ব্রিটিশ শাসনকে প্রকাশ্যে সমর্থনও করেছিলেন। আশা ছিল দেশের অর্থ-নীতিকে আধুনিকীকরণ করে ভারী শিল্পের বিকাশ ঘটাবে ইংরেজরা। কিন্তু সে আশা ঔপনিবেশিক শোষণের জাঁতাকলে অচিরেই ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। ভারতের উৎপাদিকা-শক্তিকে কোনো ভাবেই তারা সাহায্য করল না। বরং চোখের সামনে তাঁরা দেখতে পেলেন ব্রিটেন এদেশকে এক অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করতে চলেছে।

রাজনৈতিক দিক থেকেও শিক্ষিত ভারতীয়রা ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়তে লাগল যখন দেখল স্বয়ত্ত শাসনের দিকে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কোনো রকম উপযুক্ত, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করার অভিপ্রায় ইংরেজ সরকারের নেই। ডাফরিনের মতে ২০০ মিলিয়নের মধ্যে যেখানে মাত্র আট হাজার ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত সেখানে কি করে এই "আনুবিক্ষণিক সংখ্যালঘু"র

হাতে শাসন ভার তুলে দেওয়া যায়? ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন (১৮৮৪ ৮৮) আরো মনে করতেন ভারতীয়রা শিক্ষিত সমাজ অর্থাৎ "বাবু"দের দ্বারা শাসিত হতে চায় না বরং আমাদের কর্তব্য, আমাদের স্বার্থেও, তার চেয়েও বড় জনসাধারণের স্বার্থে ইংরেজ রাজত্ব চলবে (দি ব্রেক আপ অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, বি. এন. পাণ্ডে, পৃঃ ২০)।

তার উপর সামান্য যে কয়েক হাজার ভারতীয় উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিল তাদের সামনে অপেক্ষা করছিল হয় বেকারী নয়ত যোগ্যতার তুলনায় অনেক নিম্নমানের চাকুরী। উচ্চ মর্যাদাপন্ন সরকারী চাকুরীগুলি কেবলমাত্র ইংরেজদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৭৬ সালে লর্ড লিটন ভাইসরয় হয়ে এলেন। তিনি মাত্র চার বছর ছিলেন কিন্তু তার এই চার বছরের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "জনসাধারণকে ঔদাসীন্য থেকে জাগ্রত করল এবং জনজীবন-এ যোগাল প্রেরণা। রাজনৈতিক অগ্রগতির বির্বতনে রুক্ষ শাসন ছদ্ম আশীর্বাদ হয়। তারা জনগোষ্ঠীর মধ্যে আনে প্রাণ যা বছরের পর বছর আন্দোলন করেও লাভ করা বোধ হয় সম্ভব হতো না"। লিটনের আমলে ব্রিটেনে প্রস্তুত আমদানীকৃত বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক তুলে দিয়ে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের যেমন খুশি করা হল তেমনি সর্বনাশ হল ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠিত বস্ত্র শিল্পের। সারা দেশময় এর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে ভারতীয় কোষাগারের উপর অত্যধিক চাপ দেশের লোককে বিদ্বিষ্ট করে তুলল। মহাবিদ্রোহের সময়েও আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র বহন করার উপর কোনো বাধা নিষেধ ছিল না কিন্তু লিটন ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্ট পাশ করে সমগ্র জাতিকে নিরস্ত্র করার দম্ভ জাহির করলেন। উদ্দেশ্য সশস্ত্র প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করা। ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টও পাশ হল। জনসাধারণ মনে করল সরকার একদিকে মাতৃভাষা অপর দিকে সমালোচনার সুযোগটুকুকেও সহ্য করতে রাজী নয়। ১৮৭৭ সালে সারাদেশ যখন প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন তখন শিক্ষিত তরুণ সমাজ বিস্ময় ও ঘৃণার সাথে লক্ষ্য করল সরকার প্রচণ্ড আড়ম্বরের সাথে রাজকীয় দরবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন। ১৮৭৮ সালে শিক্ষিত ভারতীয়দের সিবিল সার্বিসের চাকুরী থেকে বঞ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২১ থেকে নামিয়ে ১৯ করে দেওয়া হল। এমনি বিলেতে গিয়ে ইংরেজীতে পরীক্ষা দেওয়া কষ্টসাধ্য ছিল এখন বয়ঃসীমা আরো কমিয়ে তাকে প্রায় দুঃসাধ্য করে তোলা হল। ভারতীয়রা সুস্পষ্ট বুঝতে পারল এসব চক্রান্ত সরকারী উচ্চ পদগুলিকে ইংরেজদের একচেটিয়া করে রাখার

জন্যে। এরপর এল ভাইসরয় রিপনের আমলে ল'মেম্বার ইলবার্ট রচিত ইলবার্ট বিল। যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং সেসন বিচারপতিরাও ফৌজদারী অপরাধে য়ুরোপীয়দেরও বিচার করতে পারবেন। য়ুরোপীয়দের তরফে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হল। ভারতীয়দের যোগ্যতা ও সংস্কৃতি কুৎসামূলক প্রচারের শিকার হল। ভারত সরকার য়ুরোপীয়দের সন্তুষ্ট করার জন্যে শেষ পর্যন্ত বিল প্রত্যাহার করে নিলেন। ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলন শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে উদাহরণ হয়ে দাঁড়াল। একদিকে এই আন্দোলন জাতিগত বিদ্বেষ দু'বারের মধ্যে বৃদ্ধি করল অপরদিকে ভারতীয়রাও বুঝল য়ুরোপীয়দের মত সংঘবদ্ধ আন্দোলনের কার্যকারিতা। কেম্ব্রিজ ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম ইতিহাসবিদ লর্ড ওয়েলের ভাষায় "য়ুরোপীয়দের আধিপত্য বিস্তারের তীব্র দাবীর প্রত্যুত্তর দিল ভারতীয়রা সমতার তীব্র দাবী জানিয়ে।"

শিক্ষিত ভারতীয়দের হতাশা ও ঘৃণা শুধু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় আর বক্তৃতা মঞ্চে সীমাবদ্ধ রইল না। ১৮৭৯ সালে বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে (১৮৪৫-৮৩) যিনি পুনায় সরকারী দপ্তরে একজন কেরাণী ছিলেন তিনি রামোশী কৃষকদের সংগঠিত করে মহারাষ্ট্রের ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান রচনা করেন। ফাড়কের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও বুদ্ধিমান ইংরেজরা বুঝতে পারল আগামী দিনগুলোয় কি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। কারণ প্রায় একই সময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী নদীর তীরে রাম্পায় অবস্থিত পাহাড়ীয়াদের ওপর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কর বৃদ্ধি করতে গেলে শুরু হলো সশস্ত্র প্রতিরোধ। চলেছিল ১৮৭৯ সালের মার্চ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত। এক সময়ে সমগ্র রাম্পা এলাকাকেই বিদ্রোহীরা কিছুকালের জন্য মুক্ত করে ফেলেছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনার অভাবে এই বিদ্রোহও ব্যর্থ হল। এঁদের নেতা আম্মল রেড্ডি বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হলেন। স্মরণ রাখা ভাল ১৮৭৭ সালে নাগপুরে বস্ত্রশিল্পে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট হল এবং ১৮৮২ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে কমপক্ষে পঁচিশটি ধর্মঘট বোম্বে এবং মাদ্রাজে সংগঠিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ ও অশান্তির প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে কেন হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি "সেফটি ভালভ" তৈরী করতে চেয়েছিলেন? কেনই বা তিনি চেয়েছিলেন এর মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতীয়রা সশস্ত্র বিদ্রোহের দিকে না ঝুঁকে সাংবিধানিক বিধিসম্মত উপায়ে তাঁদের অভাব অভিযোগ জানাবেন।

১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫-এর মধ্যে অর্থাৎ বিগত দশ বছরে দেশের মধ্যে

নিয়মতান্ত্রিক পথে যে নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন পেটি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে এবং সামন্ত প্রভুও সংখ্যাল্প দেশীয় শিল্পপতিদের আর্থিক সাহায্যে গড়ে উঠছিল তা' অবশ্যই হিউমের দৃষ্টি এড়ায়নি এবং নিশ্চিত তাঁর মনঃপুত ছিল। বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে ১৮৭৬ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, মাদ্রাজে তৈরী হল ১৮৮৪ সালে পি. আনন্দ চালু, এম. বীররাঘবচারিয়ার এবং জি. সুব্রামানিয়া আয়ারের নেতৃত্বে মহাজনসভা এবং বোম্বেতে সৃষ্টি হল কে. টি. তেলাং ও ফিরোজ শাহ মেতোর নেতৃত্বে ১৮৮৫ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সী অ্যাসোসিয়েশন। কোনো সন্দেহ নেই এই সমস্ত সমিতির প্রবক্তরা পূর্বের প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলির চেয়ে (অর্থাৎ কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন এবং মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন) ইংরেজদের কাছে তাঁদের দাবীগুলির বিষয়ে অনেক বেশি সরব ছিলেন কিন্তু নেতৃত্বের শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যে স্বাভাবিকভাবেই তা' বুর্জোয়া জমিদারতন্ত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিফলিত করেছিল। যেমন এই সমস্ত অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বিভিন্ন সময়ে দাবী উঠেছিল এবং যা' কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রস্তাব হিসেবে পাশও হয়েছিল—তা' হল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সংস্কার, একই সাথে ভারতে ও ইংলণ্ডে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণ, ভারতের ঘটনাবলী অনুসন্ধানের জন্যে রয়েল কমিশন গঠন, আর্মস্ অ্যাক্টের বিলুপ্তি, সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস, পুলিশ শাসন ও আইন ব্যবস্থার সংস্কার, শাসনবিভাগ থেকে বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণ এবং ভূমি রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বোঝাই যায় এই সমস্ত দাবীগুলির কোনোটাই সমাজের বৃহত্তম অংশ চাষী, মজুরের মূল আর্থিক সমস্যা সুরাহা করার দিক থেকে করা হয়নি। করা এই কারণে সম্ভব ছিল না যখন দেখি "কংগ্রেসের তহবিলে প্রথমদিকে যাঁরা মোটা অংকের অর্থ সাহায্য করতেন তাঁরা......দ্বারভাঙার মহারাজার মত বিরাট জমিদার বা ভিজিয়ানা-গ্রাম, বরোদার মত দেশী রাজন্যবর্গ।" (সি. এস. বেইলির প্রতিবেদন, ১৮ই জুন, ১৮৯১ ; উদ্ধৃতি, "দেশ" কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা, অমলেশ ত্রিপাঠীর প্রবন্ধ, পৃঃ ১০) অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে কংগ্রেস যে প্রথমদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমর্থন করত তার কারণ এখানেই। (ঐ) ব্রিটিশ সুবিচারের ওপর এই সব অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের ছিল অচলা আস্থা। তাই ১৮৬৮ সালে দাদাভাই নাওরোজী বলেন, "আমি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট যে ইংরেজরা ভারতের প্রতি সুবিচারে খুবই ইচ্ছুক ও আগ্রহী"। ১৮৭৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ জনগণের কাছে থেকে

সুব্যবহার পাবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন। (অনিল শীল, পৃঃ ২৫৪) সুতরাং এধরনের নেতাদের নিয়ে কংগ্রেস তৈরীর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন ঝানু আমলা হিউম—যিনি ভারতে সাম্রাজ্য বিলুপ্তির আশংকায় সদা আতংকিত তিনি যে সশস্ত্র বিক্ষোভ বা আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি "সেফটি ভালভ" তৈরী করবেন এতে আর সন্দেহ কী? বিপানচন্দ্র বলেছেন হিউম কথিত সাত খণ্ড গোপন রিপোর্ট বাস্তবে "মহাত্মা"দের দেয়া আষাঢ়ে এবং আজগুবি তথ্যে ভরা। (দি টেলিগ্রাফ; ২৪শে মে, ১৯৮৫) ওতে ভারতের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর প্রকৃত সত্যতা ধরা পড়েনি। তাই "সেফটি ভালভ" তত্ত্বটিকে বিপানচন্দ্র অগ্রাহ্য করেছেন।

সাতখণ্ড রিপোর্ট যদি মিথ্যাও হয় তাহলেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিগত ত্রিশ বছরে দেশের অভ্যন্তরীণ বিপজ্জনক পরিস্থিতি ও মাঝে মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ নিশ্চয় মিথ্যা নয়। চড়া হারে রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে সর্বত্র কৃষকরা অসন্তুষ্ট হচ্ছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং বাংলায় বিভিন্ন জমির বন্দোবস্ত সুস্পষ্টভাবে রায়তদের স্বার্থবিরোধী ছিল। রিকার্ডোর তত্ত্ব প্রয়োগের ফলে ১৮৭২ সালে বোম্বাই অঞ্চলে রাজস্বের হার ৩২ শতক বেড়ে গেছল। মাদ্রাজে রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্যই ছিল প্রত্যেক রায়তের সাথে আলাদা বন্দোবস্ত করে রাজস্ব বৃদ্ধি করা আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার দরিদ্র কৃষকরা যে উৎসন্নে যেতে বসেছিল, সে কথা নতুন করে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বিদ্রোহ কী শুধু একটাই একটি প্রদেশে সংগঠিত হয়েছিল? না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের সশস্ত্র বিক্ষোভ ছিল একান্ত সত্য। বাংলায় নীল বিদ্রোহ, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, ১৮৭৫-এ দাক্ষিণাত্যে কুনবিদের নেতৃত্বে বিরাট কৃষক বিদ্রোহ—এ সব কিছুই হিউম গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন এবং একারণেই তাঁর প্রয়োজন ছিল একটি "সেফটি ভালভ" উদ্ভাবনের। কংগ্রেসের মাধ্যমে তিনি সেই কাজই করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে হিউম এলাহাবাদ বক্তৃতায় স্বয়ং কংগ্রেসকে "সেফটি ভালভ" হিসেবে বর্ণনাও করেছেন। (অনিল শীল, পৃঃ ২৬৯) "সেফটি ভালভ"-এর সার্থকতা পুরোপুরি ধরা পড়ে যখন দেখি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই তার মঞ্চ থেকে প্রতিনিধিদের তরফে সুব্রামানিয়া-আয়ার (Subramania Iyer) ইংরাজ সরকারকে আশ্বস্ত করছেন এই বলে—"আমাদের সবারই ইংরাজ জনগণের সুবিচার ও সততার উপর বিশ্বাস এবং আস্থা আছে।" অবশ্য এর পরেও যদি কোনো ইংরাজ রাজপুরুষের মনে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে সে সন্দেহ নিরসন করার জন্যে কংগ্রেসের অন্যতম প্রাণপুরুষ দাদাভাই

নাওরোজী মাত্র তিন বছরের মধ্যে (২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮, ইউলসনের নিকট পত্র) লিখিতভাবে জানান, "আমি বা আমার মত কোনো ভারতীয় ভারতের জন্য" আয়ার্ল্যাণ্ডের ন্যায় হোমরুল (Home Pule) চাই না।" সুতরাং কোনো দিক থেকেই কংগ্রেস ইংরাজ সরকারের দুঃশ্চিন্তার কারণ ছিল না—বরং এর উল্টোই ছিল অসংগঠিত হলেও দেশের মধ্যে বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ। তাই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পনেরো বছর পরেও ভারত-সচিব হ্যামিলটন কংগ্রেস সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করে ভাইসরয় কার্জনকে লিখতে পারেন অক্লেশে—"আমি কংগ্রেস আন্দোলনকে ভারতীয় জনমতের ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা হিসেবে দেখি না—এটি হল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা।" ("I look upon the Congress movement as an uprising of Indian Native opinion against, not British rule, but Anglo-Indian bureaucracy." 20th October, 1899. উদ্ধৃতির জন্য, অনিল শীল, পৃঃ ২৮২ এবং অন্যান্য উদ্ধৃতির জন্য, পৃঃ ২৮০ পাদ-টীকা, আয়ারের উক্তি।)

বলা বাহুল্য, এধরনের কংগ্রেসে শ্রমিক, কৃষকের কোন স্থান থাকতে পারে না। অনিল শীল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব উল্লেখ করে লিখেছেন, কৃষকদের জমায়েত করার জন্যে কংগ্রেসের সামনে কোনো কর্মসূচী ছিল না। সাধারণ মানুষের সমস্যা কংগ্রেস মঞ্চে কখনো গুরুত্ব পায়নি। কংগ্রেস নেতাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান আদায় করা। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রস্তাবিত ভোটের অধিকার শুধুমাত্র শিক্ষিত এবং সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। (১৮৮৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৪নং প্রস্তাব, উদ্ধৃতির জন্য, ঐ, পৃঃ ২৮১)

লক্ষণীয় পরবর্তীকালে তিলক এবং মৃত্যুর পর গান্ধিজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দরজা ধনী, দরিদ্র সবার জন্যে নীতিগত ভাবে খুলে গেলেও শ্রমিক, কৃষকের মৌল সমস্যা বার বার সেই দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়েছে। আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় সেনানী জওহরলাল নেহেরু ক্রমান্বয়ে এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত কিভাবে গান্ধিজীর আকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং শ্রেণী প্রণোদিত রাজনৈতিক বুদ্ধির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তা'ও আমরা আগামী দু'টি আন্দোলনের পর্যালোচনায় লক্ষ্য করব।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯১৪ সালের জুলাইতে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল, ইংলণ্ডের সাথে তার উপনিবেশগুলিও জড়িয়ে পড়ল। ভারতের অর্থ, সম্পদ ও জনশক্তিকে ইংলণ্ড নিজের স্বার্থে কামানের খোরাকরূপে ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করল না। দেশের বাইরে ফ্রান্স, পালেস্তাইন প্রভৃতি রণাঙ্গনে পাঁচশতাধিক ভারতীয় সেনা অংশ নিয়েছিল।

ইংলণ্ডের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে ভারতীয়দের যোগদানকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাঁদের ব্যাখ্যায় "স্বাধীনতা" ও "জাতীয়তাবাদ" সংরক্ষণের জন্যে ভারত ইংলণ্ডকে সমর্থন করছে। উদারপন্থী ভারতীয় নেতারা যুদ্ধের রসদ ও সেনা সংগ্রহে সক্রিয় ভূমিকাও নিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মাস পরে (জানুয়ারী, ১৯১৫) গান্ধিজী দক্ষিণ আফ্রিকা হতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ছিলেন। তিনি প্রবল উৎসাহে সেনাবাহিনীর সংগ্রহ কার্যে নেমে পড়লেন। মান্দালয় থেকে মুক্তিলাভ করে (১৯১৪) লোকমান্য তিলক আশা প্রকাশ করেছিলেন, ইংলণ্ড এই যুদ্ধে জয়ী হবে। তাঁর মতে সাম্রাজ্যের এই সংকটে "প্রতিটি ভারতীয়র বড় অথবা ছোট, ধনী অথবা দরিদ্র প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী রাজকীয় সরকারকে সমর্থন ও সাহায্য করা উচিত।" (উদ্ধৃতির জন্য, হিস্ট্রি অব ফ্রিডম ম্যুভমেণ্ট ; ৩য় খণ্ড ; তারাচাঁদ ; পৃঃ ৪৫৬)।

কিন্তু যুদ্ধে যোগদানের স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসাহ ভারতীয়দের কখনোই ছিল না। ত্রিশ কোটি জনসংখ্যার সামান্য কিছু অংশ আর্থিক হতাশা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে স্বেচ্ছায় কামানের খোরাক হতে চেয়েছিল। যুদ্ধের প্রতিকূল চাকা ভারতীয় অর্থনীতিতে অচিরেই প্রতিভাত হল। বৃহৎ জমিদারগোষ্ঠী বাধ্যতামূলক যুদ্ধোত্থানে (warloan) চাঁদা দিতে দিতে ক্লান্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ল। যুদ্ধকালীন লাভ আনন্দজনক হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর জরুরী বাধা-নিষেধ দেশীয় পুঁজিপতিদের ক্রমশঃ বিরক্ত করে তুলল এবং অন্যদিকে কৃষিজাত পণ্য নিয়ে দালাল, মহাজন ও ফড়ের দল যত বেশি মুনাফা লুঠতে লাগল তত বেশি দরিদ্র চাষীর দল আর্থিক সর্বনাশের সম্মুখীন হল।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের অনেকে আয়ার্লাণ্ডের ইংলণ্ড-বিরোধী সিনফিন আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনে

অবতীর্ণ হল। তিলক যিনি কিছুদিন পূর্বেও যুদ্ধে ইংলণ্ডের সাফল্য কামনা করেছিলেন তিনিও এখন যুদ্ধের অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে হোমরুল আন্দোলন শুরু করে দিলেন (১৯১৬)। হোমরুল বা স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে তিলক হোমরুল লীগ গঠন করলেন প্রধানতঃ মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকে। অন্যদিকে অ্যানি বেশান্ত যিনি তিলকেরও পূর্বে হোমরুল আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনি চার মাসের ব্যবধানে (সেপ্টেম্বর, ১৯১৬) সারা ভারত জুড়ে তাঁর হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রচারের কণ্ঠস্বর হয়ত লিবারেল বা মডারেটদের চেয়ে কিছু তীব্র ছিল না কিন্তু ব্যাপকতা ও গভীরতা পূর্বাপেক্ষা প্রচারকে ম্লান করে দিল। লুই ফিশারের মতে ইষ্টারের সময়ে আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহ তিলককে উৎসাহ জুগিয়ে ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করতে। ইতিমধ্যে হোমরুলের সমর্থনে আরো অনেক ভারতীয় নেতা এগিয়ে এলেন। এঁদের মধ্যে সি. পি. রামস্বামী আয়েঙ্গার এবং মহম্মদ আলী জিন্নার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধের প্রথম দু'বছর ইংলণ্ডের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। ১৯১৬ সালের এপ্রিলে প্রতিপক্ষ তুর্কীরা কুট (Kut) দখল করে নিল এবং মেসোপটেমিয়ার অভিযানও অনিশ্চিত হয় পড়ল। ভারতের অভ্যন্তরেও অশান্তির ছায়া পড়তে শুরু করে দিল। জিনিষপত্তরের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছিল। তার উপর লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ (১৯১৬) জাতীয় প্রশ্নে তাদের সহমত ঘোষণা করল। তাদের দাবীপূর্ণ সংবিধান রচনা সাপেক্ষে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুল প্রদান করতে হবে। লুই ফিসারের ভাষায়, অভ্যন্তরীণ আগ্নেয়গিরির গোলমালে ভারতীয় মৃত্তিকায় কম্পন অনুভূত হল। শুধু রাজনীতি করা নয়, সেনারা এমন কি চাষীরাও ব্রিটিশ যুদ্ধে ভারতীয় রক্তপাতের ক্ষতিপূরণ দাবী করল। (দি লাইফ অব মহাত্মা গান্ধী, লুই ফিশার; পৃঃ ২২৩; প্রাভো ১৯৮২)

১৯১৭ সালের মে মাসে ভাইসরয় লণ্ডনে অনুরোধ জানালেন, ব্রিটিশ সরকার যেন অবিলম্বে ভারত সম্পর্কীত নীতি ঘোষণা করেন। ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট ভারতসচিব এডুইন এস. মণ্টেগু হাউস অব কমন্সে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশনীতি ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন যে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে শাসন ব্যবস্থার সাথে ভারতীয়দের আরো অধিক-মাত্রায় জড়ানো এবং স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো সাহায্য করা যাতে করে ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হতে পারে। মণ্টেগুর এই ঘোষণাকে

ভারতে মনে করা হয়েছিল ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের সপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি।

১৯১৮ সালের নবেম্বরে বিশ্ব যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল ইংলণ্ডের জয়ের মধ্যে দিয়ে। জার্মানীর সাথে তুরস্কের সুলতানের পরাজয় ঘটল। কিন্তু ভারতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অশান্তি আবার ঘনীভূত হল। এর প্রধান দায়িত্ব অবশ্য ইংলণ্ডের। সম্ভাব্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ঘোষণা করার পূর্বে মণ্টেগু ১৯১৭ সালের নবেম্বরে ভারতীয় রাজনৈতিক দল গ্রুপের নেতাদের সাথে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে ভারতে এলেন। কিন্তু সৌকত আলী এবং মহম্মদ আলী (আলী ভ্রাতৃদ্বয়) প্রমুখ যে সব নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন যুদ্ধের সময়ে তাদের মুক্তি দেওয়া হল না, এমন কি সংবাদপত্রের উপর যুদ্ধকালীন বাধা-নিষেধও তুলে নেওয়া হল না। অথচ বোঝাই যাচ্ছিল ইংলণ্ড যুদ্ধে জয়ী হতে চলেছে। সবাই আশা করছিল নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি ব্রিটিশ সরকার যত্নবান হবেন।

কিন্তু তার পরিবর্তে যুদ্ধকালীন কঠোরতাকে আইনসিদ্ধ করার জন্যে ১৯১৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর বিচারপতি রাওলাটের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হল। উদ্দেশ্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে কঠোর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দমন করা। অবশ্য অজুহাত দেওয়া হল বিপ্লবী কার্যকলাপকে ঠেকানোর জন্যেই এই বিশেষ প্রচেষ্টা সরকারের তরফে। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে রাওলাট কমিটির প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হল। জাতীয় নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে বিরোধিতা জ্ঞাপন করলেও সরকার প্রস্তাবগুলিকে আইনের মর্যাদা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। চার মাস পরে জুলাই মাসে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড (তৎকালীন ভাইসরয়)-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হল। প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গেল ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কোন মর্যাদাই দেওয়া হয়নি। যুক্তরাজ্য ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং প্রদেশের কথা বলা হয়েছিল। কেন্দ্র বা ফেডারেল সরকারের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কেবল প্রদেশগুলিতে ডায়ার্কি বা দ্বৈত শাসনের কথা বলা হলেও ব্রিটিশ গবর্নরের হাতে অর্থ এবং পুলিশ দপ্তর রইল এবং সর্বোপরি আইন পরিষদের অথবা ভারতীয় মন্ত্রীর যে-কোনো প্রস্তাব নাকচ করার ক্ষমতা তাঁর হাতে ন্যস্ত রইল। ফলে ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে যে সমস্ত দপ্তরগুলি রইল সেগুলি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও স্বাভাবিকভাবে খর্ব হয়ে গেল।

১৯১৮ সালের আগস্টে বোম্বাইতে ভারতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল মণ্টেগু চেমসফোর্ড প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি বিবেচনার জন্যে। একমাত্র

গান্ধিজী ছাড়া প্রায় সমস্ত নেতাই এই প্রস্তাবিত সংস্কারগুলিকে হতাশজনক বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন। কেবল গান্ধিজী মনে করলেন ভারত যতটা চিবুতে পারবে ততটাই তাকে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত অ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বে প্রস্তাবিত সংস্কারগুলিকে নাকচ করে দিয়ে দাবী জানালো আগামী পনেরো বছরের মধ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে। এবং যতদিন না তা হচ্ছে ভারতীয়দের হাতে আরো ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে বলেও অভিমত প্রকাশ করল। বস্তুতঃ বোম্বাই কংগ্রেসে নরমপন্থী রাজনীতির অবসান ঘটলো। উদারপন্থী রাজনীতিকরা কংগ্রেসের কার্যকলাপকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন না এই আশঙ্কায় অধিবেশনকে বয়কট করে ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশান নামে স্বতন্ত্র দল গঠন করলেন।

১৯১৯ সালের শুরুতেই রাজনৈতিক আকাশে অশান্তির ঘনঘটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়দের মতামত অগ্রাহ্য করে রাওলাট কমিটির প্রস্তাবগুলিকে কেন্দ্রীয় আইন সভার মাধ্যমে আইনে পরিণত (৩রা মার্চ, ১৯১৯) করা হল। আইনে পুলিশ এবং কার্যনির্বাহীদের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়া হল। তারা তাদের ইচ্ছামত সরকারের বিরুদ্ধে তথাকথিত ষড়যন্ত্রকে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হলে তার আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন উকীলকে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না এবং বিচারের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলবে না। আইন সভায় (Imperial legislative) আলোচনার সময়ে সমস্ত ভারতীয় সদস্য এমন কি লিবারেলরাও (উদারবাদী) এর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিছু সদস্য, তাঁদের মধ্যে মোহম্মদ আলী জিন্না অন্যতম যিনি প্রতিবাদে আইনসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। গান্ধিজী তখন অসুস্থ ছিলেন কিন্তু রোগশয্যা থেকে ভাইসরয়ের কাছে আবেদন জানালেন যেন তিনি রাওলাট-বিলকে আইনের মর্যাদা না দেন। তিনি এই বিলকে ব্যক্তি স্বাধীনতা হস্তারক এবং অন্যায় বলে মন্তব্য করলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের মতামতকে কোনরকম মূল্য না দিয়ে ১৯১৯ সালের ২১শে মার্চ রাওলাট বিলকে বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত করলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রাওলাট আইনকে অসহযোগ আন্দোলনের জনক বলে অভিহিত করেছেন। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যখন তীব্র আকার ধারণ করছিল ঠিক সেই সময়ে গান্ধিজী নেতৃত্বের সমস্ত রকম গুণ নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় দলনের

বিরুদ্ধে গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ তাঁকে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে অল্পবিস্তর পরিচিত করেছিল। ব্রিটিশ সরকারও তাঁর শক্তি সম্পর্কে একেবারে অপরিচিত ছিল না। ১৯১৪ সালে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক গিলবার্ট ম্যুরে ইংরেজদের গান্ধিজী সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, এই ব্যক্তি (গান্ধী) সম্পর্কে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। কেননা ইনি পার্থিব ভোগ সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। ইনি অত্যন্ত বিপজ্জনক—এর দেহকে বিজয় করা যাবে, আত্মাকে নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতের রাজনীতিতে স্থায়িভাবে অংশগ্রহণের জন্যে গান্ধিজী ১৯১৫ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথম এক বছর তাঁর পরামর্শদাতা গোখলের উপদেশ অনুযায়ী তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত পরিক্রমা করে এদেশের মানুষ ও সমস্যাগুলিকে চিনবার ও বুঝবার চেষ্টা করেন। সাবরমতীতে (আমেদাবাদ শহরের নিকট) সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে (১৯১৫) সত্যাগ্রহ ও অহিংসার মর্মকথা লেখনীর মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরায় ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু ১৯১৭ থেকে ১৯১৮-র মধ্যে স্থানীয় ভিত্তিতে ব্রিটিশ অসাম্যের বিরুদ্ধে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে খ্যাতি ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষন হন।

চম্পারণে (বিহার) ইংরেজ ভূম্যধিকারীদের বিরুদ্ধে বর্গাদারদের পক্ষে, গুজরাটের খেড়ায় (Kaira) সরকারের বাড়তি হারে খাজনা দাবীর বিরুদ্ধে কৃষকের সপক্ষে এবং আমেদাবাদে মিল শ্রমিকদের বাড়তি মজুরীর সমর্থনে গান্ধিজী সত্যাগ্রহীর সমস্ত শক্তি ও আদর্শ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যদিও এই তিনটি আন্দোলনের সবগুলিতেই তাঁকে শেষ পর্যন্ত আপোষের প্রস্তাব মেনে নিতে হয়েছিল এবং প্রতিপক্ষ গান্ধিজীর পুরো দাবী কোথাও মেনে নেয়নি। তথাপি এই আন্দোলনগুলি শুধু সত্যাগ্রহের ক্ষমতা সম্পর্কে ভারতীয়দের সচেতন করে তুলেছিল তাই নয় তারা প্রচণ্ড কৌতূহল ও শ্রদ্ধার সাথে আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। (দ্রষ্টব্য, "আইন অমান্য আন্দোলন")

সুতরাং রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে যখন গান্ধিজী তাঁর তীব্র বিরোধিতা জানালেন তখন দেশবাসীর চোখে তিনি আপনা থেকেই জাতীয় নেতায় পরিণত হয়েছেন।

রাওলাট বিল (রাওলাটের প্রস্তাবকে ভিত্তি করে দুটি বিল) আইনসভায় পেশ হয়েছিল। আইনে পরিণত হওয়ার পূর্বেই গান্ধিজী একে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ফেব্রুয়ারী (১৯১৯) মাসে সত্যাগ্রহ কমিটি তৈরী করেছিলেন। সদস্যদের শপথ নিতে হয়েছিল যে তাঁরা অহিংস ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রস্তাবিত আইনের

ধারাগুলিকে অমান্য করবেন। গান্ধিজী গণ-আইন অমান্যের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের অন্যতম নেত্রী অ্যানি বেশান্ত আপত্তি জানালেন। আশংকা হল এর ফলে জনসাধারণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে এবং হিংসার ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু গান্ধিজীর জনপ্রিয়তা নেতৃত্বের লড়াইতে বেশান্তকে অনেক পেছনে ফেলে দিল। বোম্বাইয়ের সমর্থন সুনিশ্চিত করার জন্যে গান্ধিজী মাদ্রাজ গেলেন, সেখানের সমর্থন লাভের জন্যে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সমস্ত ভারতীয়দের অধিকারের জন্যে লড়াই করেছিলেন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এসেছিল দক্ষিণ ভারত থেকে। তাই মাদ্রাজ তথা দক্ষিণের সমর্থন অতি সহজেই গান্ধিজী লাভ করতে সমর্থ হলেন।

আইন অমান্যের দিন প্রথমে ৩০শে মার্চ সাব্যস্ত হয়েছিল পরে তারিখ পরিবর্তন করে ঠিক হল ৬ই এপ্রিল। ওইদিন সারাভারত দোকান পাট, কাজ-কর্ম বন্ধ রেখে হরতাল পালন করবে। সেই সমস্ত আইনগুলি অমান্য করা হবে যেগুলি অতি সহজে সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব হবে, যেমন লবণকর। লোকেরা অতি সহজে সমুদ্রের জল নিয়ে যে যার বাড়ীতে লবণ তৈরী করে সরকারী নিয়ম ভঙ্গ করতে পারবে।

আন্দোলনের এই নতুন রূপ জনসাধারণকে অতি সহজে আকৃষ্ট করল। ভারতের বিভিন্ন শহরে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই জমায়েত, মিছিল ও সরকার-বিরোধী প্রচার জোরকদমে শুরু হয়ে গেল। তরুণ জাতীয়তাবাদীদের মনোভাব জওহরলালের লেখায় ধরা পড়ে। তাঁর মতে তরুণরা এই আন্দোলনকে সাদরে গ্রহণ করল। আন্দোলনের রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে সবাই যখন একবদ্ধ গলিতে আটকে গেছিল, গান্ধিজী তা থেকে সবাইকে মুক্তি দিলেন—সোজা, খোলাখুলি অথচ সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পদ্ধতি প্রয়োগ করে। (অ্যান অটো-বায়োগ্রাফী ; পৃ. ৪১ ; লণ্ডন, ১৯৫৫) ৬ই এপ্রিল সারা ভারত শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সম্পূর্ণ হরতাল পালন করল। সরকার আন্দোলন দমনে চণ্ডমূর্তি ধারণ করল। সবচেয়ে জঘন্যতম নির্মম ঘটনা ঘটল পাঞ্জাবে। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে বহির্গমনের পথ রুদ্ধ করে নিরীহ নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা নির্বিশেষে যারা সেখানে জমায়েত হয়েছিলেন তাঁদের উপর বিনা প্ররোচনায় জেনারেল আর. ই. এইচ. ডায়ারের নেতৃত্বে ইংজেদের সেনা-বাহিনী গুলি চালিয়ে হত্যার বন্যা বহিয়ে দিল। পাঞ্জাবের কোনো সংবাদ দেশের অন্যত্র যাতে না পৌছায় তার জন্যে সামরিক আইনের শাসন জারী হল (১৫ই এপ্রিল থেকে ৯ই জুন) সেখানে। আর সামরিক আইনের বলে শারীরিক

নির্যাতনের মাত্রা পাঞ্জাব সরকার আরো বাড়িয়ে দিল। তবু অত্যাচারের সংবাদ পুরোপুরি গোপন রাখা সম্ভব হল না। দেশের সর্বত্র পাঞ্জাবের সমর্থনে প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাইসরয়কে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পত্র দিলেন (৩০শে মে, ১৯১৯) এবং সরকারী "নাইটহুড" বর্জন করলেন।

কিন্তু 'গান্ধিজী' রবীন্দ্রনাথের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর একমাস পুর্বেই নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ (**passive resistanee**) আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। তাঁর বক্তব্য আন্দোলনে হিংসার ছোঁয়া লেগেছে। কারণ কলকাতা, বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রমুখ কিছু শহরে সামান্য হিংসাত্মক ঘটনার প্রকাশ দেখা দিয়েছিল। গান্ধিজীর কাছে সেটাই ভয়ংকর মনে হয়েছিল। তিনি বললেন যে তিনি হিমালয়সদৃশ ভুল করেছেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা আন্দোলনে প্রবেশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। ২১শে জুলাই এক বিবৃতিতে জানালেন, "একজন প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী নাগরিক সরকারকে বিপন্ন করতে চাইবে না।" অবশ্য সরকারী ভাষ্যে বলা হয়েছিল, "এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে আন্দোলন ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে এক সংগঠিত বিদ্রোহের আকার ধারণ করেছিল।" (উদ্ধৃতির জন্য, ইণ্ডিয়া টু ডে ; আর. পি. দত্ত ; পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯ ; কলকাতা, ১৯৭৯) তবে এপ্রিলের মাঝামাঝি প্রতিরোধ আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে বিক্ষোভ তার চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার সুযোগ পেল না। প্রতিরোধ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার ফলে ভারতীয় জনগণের পাঞ্জাব সম্পর্কে তীব্র মনোভাবকে কিছুটা শীতল করার জন্যে ইংরেজরা লর্ড হাণ্টারের নেতৃত্বে পাঞ্জাব এবং বোম্বাইয়ে অসন্তোষ ও অশান্তি সম্পর্কে তদন্তের জন্য সাত সদস্যের (৪ জন ব্রিটিশ ও ৩ জন ভারতীয়) একটি কমিটি ১৫ই অক্টোবর নিয়োগ করলেন।

এদিকে পাঞ্জাবের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি জানানোর জন্যে কংগ্রেস তার বাৎসরিক অধিবেশনের (১৯১৯) স্থান অমৃতসর নির্দিষ্ট করল।

ভারত সরকারের প্রতি বিদ্বেষ আরো তীব্র আকার ধারণ করল যখন আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও মণ্টেগু চেমসফোর্ডের প্রস্তাবিত সংস্কারাবলীর ওপর ভিত্তি করে ১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ভারত শাসন বিধি (**Government of India Act, 1919**) ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পাশ করল। কিন্তু সেই সাথে কংগ্রেস নেতাদের সম্ভাব্য তীব্র প্রতিক্রিয়াকে কিছুটা শান্ত করার জন্যে রাজকীয় অনুজ্ঞা জারী করে যুদ্ধকালীন সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের ব্রিটিশ সরকার মুক্তি দিলেন।

অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধিজী ছাড়া অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনকে সরাসরি গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন না। তিলক শর্ত সাপেক্ষে একে গ্রহণ করার মত দিলেন। কিন্তু গান্ধিজীর অভিমত ছিল শর্তহীন গ্রহণ করার পক্ষে। তাঁর বক্তব্য "বিশ্বাস হল ধর্ম"। শেষ পর্যন্ত একটি আপোষ ফরমুলা গৃহীত হল। মন্টেগুকে ধন্যবাদ দেওয়া হল সংস্কারাবলীর জন্যে। পুরোপুরি পার্লামেণ্টারী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশা নিয়ে আপাততঃ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা হবে। বস্তুতঃ তিলকের উপস্থিতি সত্ত্বেও অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধিজীই অধিকাংশ প্রতিনিধির চোখের মণি ছিলেন এবং তাঁর চেষ্টাতেই কগ্রেস সংস্কারাবলীকে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছিল। জওহরলাল সঠিকভাবেই একে "প্রথম গান্ধী কংগ্রেস" বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে লিবারেল বা নরমপন্থীদের আবেদন জানানো সত্ত্বেও তারা কংগ্রেসে পুনরায় যোগ দিতে রাজী না হওয়ায় বরাবরের মত কংগ্রেস থেকে বিদায় নিল।

অমৃতসরে সরকারের প্রতি যে সহযোগিতার নীতি প্রধানতঃ গান্ধিজীর প্রচেষ্টায় নেওয়া হয়েছিল সেই সহযোগিতার নীতিই বর্জন হল আবার তাঁরই প্রচেষ্টায় মাত্র এক মাসের মধ্যে। এই পরিবর্তনের পেছনে প্রধানতঃ দু'টি কারণ ছিল। প্রথমতঃ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকারী ডায়ার ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট নিন্দা করা দূরে থাকুক অভিনন্দন জানালো। তাঁর সপক্ষে ডায়ারকে স্পষ্টতঃই সমর্থন জানালো হাউস অব কমন্সের একটি অংশ এবং হাউস অব লর্ডসের প্রায় সবাই। ব্রিটিশ জনসাধারণের মানবিক গুণের উপর আস্থাশীল গান্ধিজী দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। দ্বিতীয়তঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের সম্ভাব্য পরাজয়ে সুলতানের মর্যাদারক্ষার প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে— যিনি মুসলমানদের কাছে একজন ধর্মগুরু বা খলিফা, ভারতীয় মুসলমানদের মনে যথেষ্ট পরিমাণে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। এখন ১৯২০ সালের শুরুতে ইংরেজসহ মিত্রপক্ষের সাথে তুরস্কের সুলতানের পৃথক সন্ধি চুক্তির শর্ত নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হলে ভারতীয় মুসলমানরা আরো বেশী চঞ্চল হয়ে পড়ল, সন্ধি চুক্তিতে (সেভরের সন্ধি সাক্ষরিত হয়েছিল ১০ই আগস্ট, ১৯২০) সুলতানের প্রতি যাতে পরে অমর্যাদাকর ব্যবস্থা না নেওয়া হয় সে কারণে ভারতে মুসলমানরা আরো বেশী করে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করে সরকারের উপর চাপ দিতে চাইল। গান্ধিজী যিনি দীর্ঘকাল ধরে নানা কাজের মাধ্যমে, বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেখানে তাঁর অধিকাংশ বন্ধু ও মক্কেল

ছিল মুসলমানরা—নিজেকে মুসলমানদের বন্ধু বলে চিহ্নিত করে এসেছেন, স্বভাবতঃই তাঁর পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব হল না। ভারত শাসন আইনের ক্ষেত্রে (১৯১৯) তিনি সরকারকে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিলেও খলিফার সম্মান রক্ষার লড়াইতে তাঁকে মুসলমানদের শুধু পাশে এসে দাঁড়াতে হল না—এমন কি সরকার বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে হল।

১৯১২-১৩ সালে বলকান যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের তুরস্ক-বিরোধী মনোভাবও সব শেষে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে তুরস্কের যোগদান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানগণকে ক্রমশঃ ব্রিটিশ-বিরোধী করে তুলেছিল। "খিলাফত" (উত্তরাধিকার অথবা successor) আন্দোলনের কারণ প্রসঙ্গে রমঁ্যা রলঁ্যা বলেছেন ভারতীয় মুসলমানরা বিবেকের একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। ইংলণ্ড যখন প্রতিশ্রুতি দিল যে সুলতান বা খলিফার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে তখনই তারা সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের রায় দিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সমাপ্তির পর ইংলণ্ড যখন কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না তখনই শুরু হল খিলাফত আন্দোলন, যা রঁল্যার ভাষায় খিলাফত বিদ্রোহ।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী গান্ধিজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে দেশের বহু মুসলমান নেতার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং মুসলীম লীগের সভাতেও বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। জুডিথ ব্রাউনের মতে গান্ধিজী ১৯১৯ সালের মাঝ থেকে সরাসরি খিলাফত আন্দোলনের সমর্থনে মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। (গান্ধিজী রাহিজ টু পাওয়ার জুডিথ ব্রাউন; পৃঃ ১৯; কেম্ব্রিজ, ১৯৭২) রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে গান্ধিজী সুযোগ পেলেই সরকারকে খিলাফতের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেওয়ার জন্যে চাপ দিয়েছেন, এমন কি এই আন্দোলনের প্রধান নেতৃদ্বয় সৌকত আলী, মহম্মদ আলী যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের মুক্তির দাবী জানিয়েছেন। (হিষ্ট্রি অব ফ্রিডম ম্যুভমেণ্ট; পৃ. ৫৫; ৩য় খণ্ড; কলকাতা ১৯৬৩)

ভারতীয় মুসলমানরা গান্ধিজীর সমর্থনকে শ্রদ্ধার সাথে স্বীকৃতি দিলেন দিল্লীতে (২৩শে নভেম্বর, ১৯১৯) অল ইণ্ডিয়া খিলাফত কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত করে। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল যদি মুসলমানদের পক্ষে সন্তোষজনকভাবে তুরস্কের প্রশ্ন মীমাংসা না হয় তাহলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বয়কট এবং অসহযোগিতার অস্ত্রও প্রয়োগ করা হতে পারে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সভাও এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানালো।

অমৃতসর কংগ্রেসের ঠিক পূর্বে ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে

আলীভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ চরমপন্থী মুসলমান নেতারা জেল থেকে মুক্তি লাভ করায় খিলাফত আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠল। ঠিক হল কংগ্রেসের অধিবেশনের পর হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের নিয়ে গঠিত একটি যৌথ ডেপুটেশানে ভাইসরয়ের কাছে মুসলমানদের খিলাফত সম্পর্কিত ন্যায়সংগত দাবী মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবেন। ১৯২০ সালের ১৯শে জানুয়ারী এই মর্মে যে আবেদননামা ভাইসরয়ের কাছে পেশ করা হল তাতে অন্যান্য সাক্ষরকারীদের মধ্যে গান্ধিজীও ছিলেন। ভাইসরয় কোনোরকম প্রতিশ্রুতি দিতে অসমর্থ প্রকাশ করলেন আর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে অন্যান্য পরাজিত জাতির মতই তুরস্কের সাথে ব্যবহার করা হবে।

এদিকে সৌকত আলী এক ফতোয়ায় জানালেন যে, আগত সন্ধিশর্তে খিলাফতের সম্মান রক্ষিত না হলে ইংরেজের সাথে সহযোগিতা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ১০ই মার্চ, ১৯২০ সালে গান্ধিজী "খিলাফত"-এর অন্যায়ের প্রতিকার হিসেবে নিরস্ত্র বা অহিংস আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের কাজকে অবাস্তব বলে বাতিল করলেন। অসহযোগ আন্দোলনের পথেই খিলাফতের মীমাংসা করতে হবে।

আন্দোলনের দিন-ক্ষণ নির্ধারণের জন্যে খিলাফত কমিটি গান্ধিজী, সৌকত আলী এবং মৌলানা আজাদকে নিয়ে একটি সাবকমিটি গঠন করল। কমিটি শান্তিচুক্তির শর্তগুলি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন শুরু না করার পরামর্শ দিল।

১৯২০ সালের ১৫ই মে তুরস্কের সঙ্গে আসন্ন শান্তিচুক্তির শর্তগুলি ভারত সরকারের বিশেষ গেজেট মারফত ভারতীয় মুসলমানরা জানতে পারল তুরস্কের প্রতি মিত্রপক্ষের অবিচারের শর্তগুলি। তুরস্ক তার এশীয় অঞ্চল থেকেও বঞ্চিত হল। "ম্যাণ্ডেট" বা অছির আড়ালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সেগুলো গ্রাস করল। খোদ তুরস্কের মধ্যেই সুলতানের শাসন-ক্ষমতা খর্ব করা হল। ক্ষমতার প্রধান উৎস হলেন মিত্রপক্ষের নিযুক্ত হাই কমিশন।

২৮শে মে সারা ভারত খিলাফত কমিটি বোম্বাইতে তাঁদের সভায় গান্ধিজী প্রস্তাবিত অসহযোগিতার কর্মসূচী মুসলমানদের সামনে বাঁচার একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করলেন।

আর ওই একইদিনে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সরকারী তদন্ত কমিশন বা হাণ্টার রিপোর্ট প্রকাশিত হল। কমিটি তাঁর রিপোর্টে সংখ্যাধিক্য সদস্যদের সমর্থনে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে লঘু করে

দেখিয়ে সমস্ত ঘটনার জন্য পাঞ্জাবের আন্দোলনকেই দায়ী করল। দেশবাসী এই রিপোর্ট পাঠ করে শুধু স্তম্ভিত হল তাই নয়, ঘৃণায় ফেটে পড়ল যখন দেখল ওই রিপোর্টের অভিমতকে ভারত সরকার পুরোপুরি মেনে নিল।

গান্ধিজী জনগণের এই অসন্তোষ ও ঘৃণাকে পুরোপুরি ইংরেজ-বিরোধিতার ক্ষেত্রে কাজে লাগালেন। রাওলাট আইন, খিলাফত ও পাঞ্জাবের অত্যাচার এই তিনটি ঘটনাকে ব্রিটিশ-বিরোধিতার মূল ভিত্তি করে গান্ধিজী অসহযোগ আন্দোলনকে প্রধান অস্ত্র হিসেবে হাতে নিয়ে এক অভূতপূর্ব জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন যার গভীরতা এবং ব্যাপকতা ব্রিটিশ ভারতে এর পূর্বে কখনো দেখেনি। এমন কি ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহও ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতের সমস্ত সীমান্ত এমন ভাবে ছুঁতে পারেনি।

১৯২০ সালের ৩০শে মে বেনারসে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসল। কমিটি হাণ্টার রিপোর্টকে একপেশে বলে নিন্দা করল; রাওলাট আইন বাতিল দাবী করল এবং তুরস্কের উপর প্রস্তাবিত সন্ধিশর্তগুলিকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-বিরোধী এবং ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় বোধের উপর আঘাত বলে ঘোষণা করল।

১৯২০ সালে ১লা আগষ্ট অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভের তারিখ হিসেবে নির্দিষ্ট হল। ঠিক তার আগের দিন ৩১শে জুলাই জনগণকে উপবাস ও প্রার্থনা করতে অনুরোধ জানানো হল।

এ সিদ্ধান্ত কিন্তু প্রথমে কংগ্রেসে গৃহীত হয়নি। এটি ছিল খিলাফত কমিটি গঠিত (২রা জুন, ১৯২০) অসহযোগ কমিটির (Non-co-operation committee) জুলাই (১৯২০) সালের সিদ্ধান্ত। যাইহোক গান্ধীজীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি ১লা আগষ্ট (১৯২০) সারা ভারতব্যাপী হরতালের প্রস্তুতি নিল। ১লা আগষ্ট যে'দিন বিপুল উৎসাহের সাথে হরতাল পালিত হল সেদিনই দুর্ভাগ্যবশতঃ লোকমান্য তিলকের দেহাবসান ঘটল। সেপ্টেম্বরে (৪ ৯) কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে আগষ্ট মাসের অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীকে অনুমোদন করা হল। লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে মূল প্রস্তাবের উত্থাপক ও ব্যাখ্যাকারী ছিলেন গান্ধিজী স্বয়ং। জাতীয়স্তরে তিনটি প্রধান দাবীকে অবিলম্বে পূরণ করার জন্যে ব্রিটিশ সরকারকে আহ্বান জানানো হল: পাঞ্জাব, খিলাফত এবং স্বরাজ। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল, "দুটি অন্যায়ের (খিলাফত এবং পাঞ্জাব) প্রতিকার না হলে কংগ্রেস মনে করে ভারত শান্ত হবে না। জাতীয় মর্যাদারক্ষা ও ভবিষ্যতে এ-ধরনের অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি রোধ

করতে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।" (উদ্ধৃতির জন্য, মহাত্মা, ডি, জি,—তেণ্ডুলকার ; ২য় খণ্ড ; পৃ. ১০) আন্দোলনের তিনটি স্তর সূচিত হল। প্রথম স্তর :—আইনসভা, আদালত ও শিল্প প্রতিষ্টান বর্জন বা বয়কট। দ্বিতীয় স্তর : প্রতিটি গৃহে চরকায় সুতা কাটার ব্যবস্থা এবং তৃতীয় স্তরে আন্দোলনের এক বিশেষ পর্যায়ে শুরু হবে সম্পূর্ণরূপে কর বর্জন বা নো-ট্যাকস নীতি।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মত যে সব প্রবীণ নেতারা অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন না, গান্ধীজী তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, এরকম কাজ হবে মুসলমান ভাইদের প্রতি মিথ্যাচারণ। অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিংসার ঝুঁকি নিতেও তিনি প্রস্তুত। তাঁর ভাষায় "একটি জাতিকে হীনবীর্য করার ঝুঁকির চেয়ে আমি হাজারো হিংসার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।" (ঐ, পৃ. ৪) ১১ই আগষ্ট "ইয়ং ইণ্ডিয়া" (**Young India**) পত্রিকায় তিনি এক লিখিত প্রবন্ধে জানালেন, যদিও তিনি অহিংসাকে হিংসার বহুগুণ উর্ধ্বে শক্তিশালী রূপে স্থান দেন তথাপি ভীরুতা ও হিংসার মধ্যে তিনি হিংসাকেই বেশি মূল্য দেবেন। তাঁর ভাষায় "নিজের অমর্যাদাব প্রতি অসহায় সাক্ষ হয়ে থাকার চেয়ে আমি চাইব ভারত বরং তার মর্যাদা রক্ষার জন্যে অস্ত্রের প্রয়োগ করুক।" (ঐ ; পৃ. ৫) অবশ্য তিনি ওই একই প্রবন্ধে ভারত যে অসহায় নয় সে কথাটিও লিখতে ভুললেন না।

মুসলীম লীগ (**Muslim league**) ৭ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় এক বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনেব পথ বেছে নিল। যদিও পুরোপুরি গান্ধিজীর কর্মসূচী নয়।

বোঝা গেল অসহযোগ আন্দোলনের চরিত্র ক্রমশঃ বিশাল ও ব্যাপক হতে চলেছে। কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধিজী বলেছিলেন যদি দেশবাসী তাঁর অনুসৃত পথে চলে তাহলে তিনি এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন। তাঁর মতে "স্বরাজ অর্জনই কেবল দ্রুত খিলাফতের অন্যায় দূর করতে পারে।" (উদ্ধৃতির জন্য. মজুমদার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৬) সুমিত সরকার তাঁর "মডার্ণ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে গান্ধীজী "স্বরাজ আসবে এক বছরে" প্রথমে লেখেন (গান্ধীজী) ২২ শে সেপ্টেম্বর "ইয়ং ইণ্ডিয়া"র এক প্রবন্ধে। (মডার্ণ ইণ্ডিয়া ; পৃ. ১৯৭ ; সংস্করণ, ১৯৮৩) কিন্তু তেণ্ডুলকারের লেখা থেকে জানা যায় গান্ধিজী এক বছরে স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কলকাতা কংগ্রেসের (৪-৯ সেপ্টম্বর) বিশেষ অধিবেশনে, (মহাত্মা, পৃ. ১২ ; ২য় খণ্ড) অর্থাৎ "ইয়ং ইণ্ডিয়া"র প্রবন্ধের অন্ততঃ

পক্ষে পনেরো দিন পূর্বে। অধিবেশনে অসহযোগ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপিত করে গান্ধিজী যে বক্তৃতাটি দেন, তাতে তিনি বলেন, "আমার পরিকল্পনার (অসহযোগ) সপক্ষে যদি যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায় তাহলে অমি পুনরায় জোরের সাথে বলছি যে এক বছরের মধ্যে আপনারা স্বরাজ অর্জন করতে পারবেন। (that you can gain swaraj in the course of an year") বস্তুতঃ পক্ষে ২২শে সেপ্টেম্বরের "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকাতে তিনি কলকাতা কংগ্রেসে প্রদত্ত "এক বছরে স্বরাজ আনার" ভাষণেরই পুনরাবৃত্তি করেন। (ঐ, পৃ. ১৯) কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নাগপুরের বাৎসরিক ডিসেম্বর মাসের অধিবেশনে পুনরায় অনুমোদিত হল। একমাত্র জিন্না ব্যতীত কলকাতায় যাঁরা অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীকে বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরাও এবার নাগপুরে গান্ধিজীর প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন। সবচে মজার ব্যাপার যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রায় ছত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে এক বিরাট প্রতিনিধি দল নিয়ে গেছলেন গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবকে বিরোধিতা করার জন্যে। তাঁকেই শেষ পর্যন্ত দেখা গেল অসহযোগ আন্দোলন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় প্রস্তাবকে উত্থাপন করতে। জুডিথ ব্রাউন দেশবন্ধুর মনোভাবের এই হঠাৎ পরিবর্তনের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সে সময়ে বাংলায় তিনটি প্রধান রাজনৈতিক প্রথা ছিল। একটি গান্ধিজীর সাধিত অনুরাগী জীতেন্দ্রলাল ব্যানার্জীর দল—যাঁদের মোটামুটি মুসলমান কৃষকদের উপর, স্বচ্ছল হিন্দু এবং তরুণ ভদ্রলোকের উপর প্রভাব ছিল। দ্বিতীয় দলটি স্বয়ং চিত্তরঞ্জনের, আর তৃতীয়টি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের—যাঁরা মণ্টেগু চেমস ফোর্ড সংস্কারাবলীর সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দেশবন্ধু দেখেছিলেন নাগপুরে গান্ধিজীর সপক্ষে যে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে তাতে তিনি অনায়াসে প্রকাশ্যে গান্ধিজীর হাতে পরাজিত হবেন এবং তাঁর প্রভাবও স্বাভাবিকভাবে বাংলায় হ্রাস পাবে। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথের সাথে হাত মেলানো হবে সুস্পষ্টভাবে প্রতিক্রিয়াশীল কাজ। সুতরাং রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করতে গেলে গান্ধিজীর সাথে মিত্রতা বা অ্যালায়েন্স করা ছাড়া দেশবন্ধুর অন্য কোন উপায় ছিল না। (জুডিথ ব্রাউন; পৃ. ৩০২) আবার গান্ধীর দিক থেকেও বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনকে সার্থক করতে গেলে দেশবন্ধুর মত জনপ্রিয় নেতার সক্রিয় সমর্থনের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

কংগ্রেসের প্রস্তাবকে সমর্থন করে জমায়েত উল উলেমা-ই হিন্দ মুসলমানদের কাছে ফতোয়া (ধর্মীয় আদেশ) জারী করল। বলা হল মুসলমানরা যেন

'নির্বাচন, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইন-আদালত এবং সরকার প্রদত্ত খেতাব ও মর্যাদা বর্জন করেন। ৯০০ জন উলেমা এই ফতোয়াতে সাক্ষর দিলেন।

নাগপুরে কংগ্রেস গঠনতন্ত্রকে পরিবর্তন করে আরো বেশি সক্রিয় করা হল।

শুরু থেকেই অসহযোগ আন্দোলন অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করল। ভারত শাসন বিধির (১৯১৯) ভিত্তিতে নতুন আইন সভা সমূহে যে নির্বাচন হল তা সাফল্যের সাথে বয়কট করা হল। ছাত্ররা স্কুল-কলেজ এবং আইনজীবীরা ইংরেজের তৈরী আদালত বর্জন করলেন। মহম্মদ আলীর উপদেশে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু ছাত্র বেরিয়ে এসে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা করলেন। সুভাষ চন্দ্র বসু আই. সি. এস.-এর চাকুরী পরিত্যাগ করে কলকাতায় নব প্রতিষ্ঠিত ন্যাশানাল কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। মোতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাস, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালচারী এবং জওহরলাল আদালত বর্জন করলেন। আন্দোলন ক্রমঃশ সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ল। স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ও জনসভাসমূহ নিষিদ্ধ হল। গান্ধিজী ব্যতীত দেশের প্রায় সমস্ত শীর্ষস্থানীয় নেতা ও অসংখ্য কর্মী কারারুদ্ধ হলেন। সরকার দিশেহারা হয়ে ক্রমশঃ মারমুখী হয়ে পড়ল। ফলে দেশবাসীর পক্ষেও সব সময়ে অহিংসাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে তেজোদৃপ্ত ভাবটা ক্রমশঃ বেশি করে ফুটে উঠতে লাগল। ১৯২১ সালে শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা কমপক্ষে চারশোতে দাঁড়াল। মেদিনীপুরে, রংপুরে এবং অন্ধ্রে গুণ্টুর জেলায় গান্ধিজীর নির্দেশ অমান্য করে শুরু হল কর বন্ধের আন্দোলন, দক্ষিণে জমিদারী শোষণ ও ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘটল মালাবার অঞ্চলের মোপলা কৃষকের বিদ্রোহ। বিদ্রোহী কৃষক। সরকারী দলিল অফিসে অগ্নিসংযোগ করল এবং পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে গণ-আদালত স্থাপন করল। সবচেয়ে কৌতুহলের বিষয় সরকারী কোষাগারের অর্থ এবং জমিদারের গোলাঘর থেকে খাদ্য জোর করে ছিনিয়ে এনে সাধারণ মানুষের মধ্যে তারা বিতরণ করল। (দি মহাত্মা এণ্ড দি ইজম ; ই. এম. এস. নাম্বুদ্রীপাদ, পৃ. ৩০-৩১ ; কলকাতা, ১৯১৮) দক্ষিণ মালাবারের দু'টি তালুক এরনাদ এবং ওয়াল্লু-ওয়ানাদে ব্রিটিশরা বেশ কয়েক মাস ধরে কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইকে ব্রিটিশরা অভূতপূর্ব অত্যাচারে ডুবিয়ে দিয়েছিল। বিদ্রোহীরা মারা গেছল ২৩৩৭ জন ; আহত হয়েছিল ১৬৫২ জন এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৪৫,৪০৪ জনকে। ২০শে নভেম্বর (১৯২১) একটা রেলওয়াগনে ৬৬ জন মোপলা বন্দীর গলিত মৃতদেহ পোড়ানুরে পাওয়া গেছল যা অভ্রান্তভাবে

প্রমাণ করে যে ইংরেজরা এক ধরনের "অন্ধকূপ হত্যার" ঘটনা সংগঠিত করেছিল পোড়ানুরে। (মর্ডান ইণ্ডিয়া, সুমিত সরকার; পৃ. ২১৭, ম্যাকমিলান, ১৯৮৪) আসামের চাবাগিচাগুলোয় মাঝে মাঝেই বিক্ষোভ আর হরতাল ঘটতে লাগল, পাঞ্জাবে ধনী মোহান্ত ও সরকার সমর্থিত শিখদের ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শুরু হল গণতন্ত্রীকরণের জন্যে আকালী আন্দোলন। রাজস্থানের মত দেশীয় রাজ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে কৃষকরা সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামল। প্রধানতঃ সেস ব্যবস্থা ও বেগারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। আলোয়ারের মেও উপজাতিরা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করলে যৌথভাবে ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশ এবং আলোয়ার রাজ্য পুলিশ তা' দমন করল।

সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত করাচীর খিলাফত সম্মেলনে আলীভ্রাতৃদ্বয় মুসলমান সৈনিকদের আহ্বান জানালেন ইংরেজদের সেনাবাহিনী পরিত্যাগ করতে। মহম্মদ আলী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যদি খ্রীষ্ট মাসের মধ্যে সম্মানজনক মীমাংসা না হয় তাহলে কংগ্রেসের আগামী আমেদাবাদ অধিবেশনেই ভাবতে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হবে। '(মহাত্মা; ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২) রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আলীভ্রাতৃদ্বয় এবং আরো চারজন মুসলমান নেতার দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। আলীভ্রাতৃদ্বয়ের বক্তৃতাগুলিকে গান্ধিজী সমর্থন করলেও লেখনীর মাধ্যমে যে বক্তব্য বেরোলো তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর শিরোনাম দিলেন, "ধীরে চল"। ডিসেম্বর মাসে গান্ধিজীর নেতৃত্বে আমেদাবাদ অধিবেশনেব দিকে সারা দেশবাসী অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইল। কিন্তু গান্ধিজী আমেদাবাদে "ধীরে চল" নীতিকেই প্রয়োগ করতে বদ্ধ পরিকর। রিপাবলিক্যাল নেতা হজরত মোহানী যখন "স্বরাজ"-কে পূর্ণ স্বাধীনতা এব বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত বলে ব্যাখ্যা করলেন তখন গান্ধিজী তা' অগ্রাহ্য করলেন। আমেদাবাদের যেকোন রিপোর্ট দিতে গিয়ে ভাইসরয় ভারত সচিবকে সানন্দে জানালেন, খিলাফত দলের এক অংশ অহিংসার পথ পরিত্যাগ করার যে প্রস্তাব দিয়েছিল গান্ধিজী তা' বাতিল করেছেন, এমন কি কংগ্রেস তাদের প্রস্তাবে বস্তু বিজ্ঞাপিত কর-বন্ধেরও কোনো উল্লেখ করেনি।

কিন্তু দেশবাসী বিদ্রোহের উত্তেজনায় উদ্বেলিত। কর-বন্ধের প্রস্তাব না থাকলেও গান্ধিজীকে শেষ পর্যন্ত জনগণের চাপে তা' মেনে নিতে হল। কারণ কংগ্রেসের উপদেশ উপেক্ষা করেই মেদিনীপুর, গুন্টুর প্রভৃতি জায়গায় জনসাধারণ নিজেরাই কর বন্ধের আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। ' গান্ধিজী এটা অনুমোদন করলেন না। গুন্টুর জেলার লোকেদের আইন-মাফিক ট্যাক্স

বন্ধের পরিবর্তে গান্ধিজী স্থির করলেন একমাত্র বারদৌলী জেলাতে তাঁর নেতৃত্বে ট্যাকস্ বন্ধের আন্দোলন হবে। ত্রিশকোটি ভারতবাসীর মধ্যে ওই সময়ে বারদৌলীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র সাতাশী হাজার।

যাইহোক, বারদৌলীর সত্যাগ্রহ শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হল। যুক্তপ্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে অত্যাচারের প্রতিশোধে আকুল জনসাধারণ পুলিশ ফাঁড়িতে অগ্নিসংযোগ করল এবং প্রায় বাইশজন পুলিশ নিহত হল। এই সংবাদ ভারতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধিজী অনুভব করলেন হিংসার বিরুদ্ধে অশুভ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দেশের সর্বত্র হাজার হাজার চৌরিচৌরা সংঘটিত হবে। ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২২, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী মিটিং-এ চৌরিচৌরার জনতার অমানুষিক কার্যাবলীর তীব্র নিন্দা করা হল এবং গান্ধিজী ঘোষণা করলেন আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধের। তাঁর মতে দেশবাসী এখনও অহিংস সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়, রজনীপাম দত্তের ভাষায়—"যুদ্ধ শেষ। সমগ্র অভিযানও শেষ হয়ে গেল। পর্বত বাস্তবে মূষিক প্রসব করল।"

১০ই মার্চ গান্ধিজী গ্রেপ্তার হলেন, বিচারে ছ'বছরের কারাদণ্ড হল। গান্ধিজীর আচরণে হতবাক দেশবাসী নেতার এতবড় সাজাতে এতটুকু প্রতিবাদ করল না। স্বরাজ ও খিলাফত দু'য়েরই প্রাপ্তির ঘরে জুটলো বিরাট শূন্য।

(২)

আন্দোলন কখনোই ব্যাপক বা বিরাট হতে পারে না—যদি না তার ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে। নেতা নেতৃত্ব দিতে পারেন, জনগণ ব্যক্তিত্বে চমৎকৃত হতে পারেন কিন্তু আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে না যদি না বাতাবরণ অনুকূল থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের জাতীয়তাবাদ অতীত ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও ভারতীয়রা তাদের গৌরব গাথাকে অতীতাশ্রয়ী করে রেখেছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশ রাজের ছত্রছায়াকে তারা নিরাপদ ও সংরক্ষিত বলে মনে করত। মহাবিদ্রোহের পর নতুন নতুন কল-কারখানা এবং সরকারী দপ্তরে কিছু চাকুরীর সুযোগ একদিকে যেমন শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কিছুটা আর্থিক সন্তুষ্টি এনেছিল তেমনি ক্রম-বর্ধমান শ্রমশক্তিরও কিছুটা অর্থনৈতিক সংস্থান ঘটিয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা এখনো পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সদিচ্ছার উপর

নির্ভরশীল। পুনাতে ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে যে-কোনো ইংরেজের সাথে সহযোগিতার আবেদন জানালেন। তিনি এর জন্য সুস্পষ্ট দু'টি কারণ উল্লেখ করলেন। "প্রতিকূল অবস্থা বিবেচনা করলে বলতে হয় ব্রিটেন ভারতের ভালই করেছে এবং দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ-শাসনের কোনো বিকল্প নেই অন্ততঃ বহুদিন পর্যন্ত।" পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন এবং দিল্লীর দরবারে খুশী হয়ে কংগ্রেসের অন্যতম নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার অভিমত প্রকাশ করলেন: 'ব্রিটিশ রাজ-মুকুটের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে প্রত্যেকের (ভারতীয়দের) অন্তঃকরণ আপ্লুত। আমাদের মধ্যে অনেকেই চরম নিরাশার দিনেও ব্রিটিশ সুবিচারের উপর আস্থা ও বিশ্বাস হারাইনি।" জাতীয় বুর্জোয়াদের এই আস্থা না হারাবার আরো কারণ ছিল যখন দেখা গেল মর্লে-মিণ্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কারাবলী (১৯১৯) নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের কিছুটা রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিল এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠনেব ভেতর দিয়ে ক্ষীণ স্বরে হলেও কিছু মতামত প্রকাশের অধিকাব স্বীকাব কবে নিল। এ ছাড়া যুদ্ধেব মাঝামাঝি (১৯১৬) ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় পুঁজিপতিদের আরো খুশী করল তুলোর উপর ৭½ পার্সেণ্ট আমদানী শুল্ক বাড়িয়ে দিয়ে। অথচ ভারতে প্রস্তুত তুলোব উপর কোনো এক সাইজ ডিউটি বা অন্তঃশুল্ক বাড়ানো হল না। এই কনশেসন বা সুবিধা ভাবতীয় পুঁজিপতিদেব সুযোগ দিল তাদের শিল্পকে একটা শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করতে। তার উপর বিশ্বযুদ্ধ ইংলণ্ডের শিল্পগুলোকে প্রায় তছনছ করে দিয়েছিল ফলে দেশীয় শিল্পপতিদের ল্যাংকাশায়ারে প্রস্তুত বস্ত্রের প্রতিযোগিতা থেকে আতংক হওয়াবও কোনো কাবণ রইল না। অন্যদিকে নতুন ট্যারিফ বা শুল্ক আইন জাপান ও আমেরিকায় প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যগুলিকেও প্রতিযোগিতার প্রচণ্ড অসুবিধায় ফেলে দিল। তা'ছাড়া ব্রিটিশ সরকার শুধু ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকেই সুবিধা দিল তাই নয় মিশর, প্যালেস্টাইন এবং মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধ সামগ্রী সত্বর পাঠানোর স্বার্থে ভারতে ভাবী শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ-সুবিধা দিতেও বাধ্য হল। শ্রীমতী ফেড্রাউটলে তাঁব "ল্যাংকাশায়ার এণ্ড দি ফার ইষ্ট" গ্রন্থে লিখেছেন, "ভারতের প্রতিরক্ষা এবং মিশব, প্যালেস্টাইন ও পূর্ব আফ্রিকায় যুদ্ধ পরিচালনার সামগ্রী টাটা লৌহ কাবখানা পাঠিয়েছিল। কয়লা উৎপাদন বাড়ানো হয়েছিল। তা'ছাড়া যুদ্ধের সময়ে যখন যুদ্ধ-সামগ্রী এবং সামরিক সাহায্যেব প্রয়োজন তখন কেবল জমিদাব, রাজা এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করা যায় না ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সন্তুষ্টি রাখার জন্যও কিছু করার প্রয়োজন।"

যখন শিল্পে নিয়োজিত পুঁজির শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে তখন ভারতীয় শিল্পপতিরা

সহজবোধ্য কারণে ব্রিটিশ স্বার্থের সাথে দেশের স্বার্থকে অভিন্ন করে দেখতে শুরু করলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তাদের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ ইংলণ্ডের যুদ্ধ প্রস্তুতিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। যুদ্ধে সেনাবাহিনীতে সৈন্য সংগ্রহের জন্য গান্ধিজী দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে বিহার ও গুজরাটে তাঁর প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন।

তবে বৃহৎ পুঁজিপতি ও জমিদারশ্রেণীর যুদ্ধের সাহায্যে যতটা উৎসাহ দেখা গেছল সাধারণ মানুষের মধ্যে তার বিন্দুমাত্র ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। ১৫ই জুলাই, ১৯১৮-র এক পুলিশের রিপোর্টে দেখা যায় গান্ধিজীর আপ্রাণ প্রচার সত্ত্বেও ১২০ জনের বেশী লোক তিনি সেনাবাহিনীর জন্য সংগ্রহ করতে পারেনা নি। উল্লেখ্য, পছন্দ করুক না করুক কোনো কংগ্রেস নেতা গান্ধিজীর সেনা সংগ্রহের প্রচারে প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন নি। এমন কি তিলক এবং অ্যানি বেশান্ত শর্ত সাপেক্ষে সেনা সংগ্রহে সাহায্য করতে রাজী ছিলেন। (গান্ধিজী রাইজ টু পাওয়ার ; জুডিথ. এম. ব্রাউন, পৃ. ১৪৮, কেম্ব্রিজ ১৯৭২)

সাধারণ মানুষ বলতে যদি প্রধানতঃ শ্রমিক, কৃষক বোঝায় তাহলে দেখা যাবে যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের ক্রমশঃ শোচনীয় পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

কৃষকদের আর্থিক অবস্থা কোনো সময়েই স্বচ্ছলতার মুখ দর্শন করেনি। অষ্টাদশ এবং উনিশ শতকের গোড়ায় খুবই খারাপ ছিল, এখন যুদ্ধের সময়ে ভূম্যধিকারীরা সরকারপ্রদত্ত অবাধ স্বাধীনতার অলিখিত সুযোগ পেয়ে ঘাড় ভেঙে খাজনা আদায় করতে লাগল। দাবী করল নানা বে-আইনী "ভেট" বা "সালামী", চাষীকে জমি থেকে অন্যায় উৎখাতের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত শক্তিশালী রক্ষাকবচ না থাকায় জমিদারের প্রায় অর্ধ-ক্রীতদাসে তারা পরিণত হল। যে বেশী খাজনা দেবে তাকে জমি চাষের জন্য দেওয়া হবে এই নীতি প্রয়োগ করে বহু চাষীকে যেমন উৎখাত করা হল, তেমনি যারা তা' সত্ত্বেও টিঁকে রইল তারা প্রকৃত পক্ষে খাজনা দেওয়ার তাগিদে গ্রাম্য মহাজনের হাতে ভিটে-মাটি বন্ধক রাখতে বাধ্য হল। জমি থেকে উৎখাত চাষীর দল ক্রমশ ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িয়ে চলল। অন্যদিকে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। প্রতাপগড়, রায়বেরিলী এবং ফৈজাবাদে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন থেকে বোঝা যায় সারা উত্তরপ্রদেশে কৃষকের আর্থিক অবস্থা কি রকম সংকটজনক অবস্থায় পড়েছিল। শিল্পজাত সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেলেও কৃষিজাত পণ্যের মূল্যে বিশেষ কোনো

তারতম্য ঘটেনি। মহাজনের কাছে ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬ হাজার মিলিয়ন টাকা (১৯১১-১৯২৫)।

রবীন্দর কুমার (Ravinder Kumar) তাঁর বইতে (এসেজ ইন দি সোশ্যাল হিষ্ট্রি অব মডার্ণ ইণ্ডিয়া ; পৃ. ২১ ; সংস্করণ ১৯৮৩) দেখিয়েছেন কিভাবে স্বচ্ছল উদ্যমী কৃষকরাও সরকারের আর্থিক ও সামাজিক নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিল। তাঁর মতে উনিশ শতকের শেষ দিকে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র অথবা গুজরাটের উচ্চাভিমুখী গতিশীল কৃষকরা (upward mobile peasantry) যারা রায়তওয়ারী অথবা জমিদারী ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বিত্তশালী হয়েছিল তারা চাইছিল তাদের এই আর্থিক সম্পদকে সামাজিক এবং আর্থিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে। এদের অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল যখন সরকার জমিগুলোর পুনরায় জরিপের মাধ্যমে আরও বেশি করে কর বসাতে চাইল। তা'ছাড়া জমিদারী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির ভোগদখলকারী প্রজারা যাদের অবস্থা রায়তওয়ারী অঞ্চলের কৃষক-মালিকদের সমতুল ছিল তারা চলতি সামাজিক ব্যবস্থা যাকে তারা অন্যায় বলে মনে করত তার সাথে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছিল না।

ইস্পাত ও সুতীজাত বস্ত্র থেকে প্রচুর লাভ এবং চাকুরীর সংস্থান বৃদ্ধি পেলেও সাধারণের আর্থিক মান কিছু উন্নত হয়নি। বরং শ্রমিকদের উপর শোষণের জাঁতাকল আরো বেশী করে চেপে বসেছিল। জীবন ধারণের ন্যূনতম মজুরী থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে হত। এবং কাজের সময় কম করেও রোজ দশঘণ্টা ছিল। ইণ্ডিয়া লীগ ডেলিগেশনের ১৯৩২ সালে প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কলকাতার নিকটস্থ চটকলে একজন নারী শ্রমিক মাসে ২ টাকা চার আনা (পঁচিশ পয়সা) এবং পুরুষ শ্রমিক ৩ টাকা চার আনা (পঁচিশ পয়সা) মজুরী হিসেবে আয় করে, বার্ড কোম্পানীর কয়লাখনিতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে দৈনিক আয় করে এক টাকা দু'আনা (১২ পয়সা)।

যুদ্ধ এবং স্বদেশী আন্দোলন দেশী পুঁজিপতিদের শিল্প বিকাশের সুযোগ এনে দেওয়ার ফলে তাদের সর্ববিধ চেষ্টা হল শ্রমিককে তার প্রাপ্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করে মুনাফার পুরো অংশটাই আবার পুঁজি হিসেবে নতুন কল-কারখানায় বিনিয়োগ করা। ফলে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে দেখা দিল অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। ১৯১৮ সালে বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর এবং আমেদাবাদে ঘন ঘন মিল শ্রমিকদের ধর্মঘট দেখা গেল। এইসব ধর্মঘটের প্রধান মূল কারণ অর্থনৈতিক। একদিকে মজুরী বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে ছাঁটাই ও ইচ্ছামত লক আউটের বিরুদ্ধে

ছিল স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। ফলে এইসব প্রতিবাদ ও বিক্ষোভকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠল বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন—যাদের দাবী কেবল অর্থনৈতিক সমস্যাকে ঘিরে ঘুরপাক খেতে রাজী ছিল না, মূল সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য রাজনৈতিক আসর নিতে লাগল। ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তুললেন বি, পি, ওয়াডিয়া।

বৃহদায়তন ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে গ্রামে-গঞ্জে হাজার হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবার যারা কুটির শিল্পের সাথে জড়িত ছিল তারা আসল উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে না পেরে প্রায় উৎসন্ন হয়ে পড়ল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে শুরু হয়েছিল এবং এখন যুদ্ধোত্তরকালে কারিগর ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক অবস্থা প্রায় ভিক্ষুকে পরিণত হল। এবং এই সব কর্মহীন কারিগররা শহরের কলকারখানায় যখন কাজের আশায় ভিড় জমালো তখন প্রকৃত শিল্প শ্রমিকের মজুরীর হার প্রতিযোগিতায় নিম্নমুখী হয়ে পড়ল।

শ্রমিক ও কৃষকের সাথে মধ্যবিত্তদেরও দৈনন্দিন অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। ১৯১৮-১৯১৯ এবং ১৯২০-১৯২১ সালে এক বছর বাদ দিয়ে পরপর দু'টো অজন্মা বা শস্যহানি ঘটায় শস্যের দাম দারুণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আর্থিক পীড়ন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছল। তারপর মুদ্রাস্ফীতি এত প্রচণ্ড ভাবে ঘটল যে চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তদের প্রকৃত আয়ের মূল্যও দ্রুত কমে গেল। একদিকে শস্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তেমনি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জাও মহামারী রূপে ভারতের প্রায় তেরো মিলিয়ন লোককে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিল। উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ চাকুরীর সম্ভাবনাও মধ্যবিত্তদের সামনে অন্তর্হিত হয়েছিল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বেই লর্ড কার্জনের (১৮৯৯-১৯০৫) বর্ণবিদ্বেষ বা জাত্যাভিমানের নীতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের হতাশ করেছিল। তিনি দম্ভের সাথে ঘোষণা করলেন, "নিয়ম মাফিক সরকারী চাকুরীর উচ্চতম পদ ইংরেজদের হাতেই থাকবে।" "The highest ranks of civil employment, as a general rule, be held by Englishmen" এ ছাড়া বহির্ভারতে ভারতীয় শ্রমিকরা যেভাবে ব্রিটিশ উপনিবেশ ও ডোমিনিয়ানগুলিতে নির্যাতিত হচ্ছিল (দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় শ্রমিকরা ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার শিখরা) তা'ও শিক্ষিত ভারতীয়দের বিবেককে দারুণভাবে আঘাত করছিল।

রাজনৈতিক দিক থেকেও মধ্যবিত্তদের কোনো আশার কারণ ছিল না।

মর্লে-মিন্টো সংস্কারাবলীতে যে সামান্য প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তা রাজন্যবর্গ, ভূস্বামীদের মত কায়েমী স্বার্থবাজীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একজন মুখপত্র হিসেবে গোখলের সমালোচনা উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে এই সংস্কারাবলী ছিল নিতান্ত শূন্যগর্ভ। ১৯১২ সালে ব্রিটিশ সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিযুক্ত করল। কমিশন দু'বছর ধরে সংগ্রহ করলেও রিপোর্ট ১৯১৭ সালের পূর্বে প্রকাশিত হল না। যে ভাবে সরকারী যন্ত্র ঢিমেতালে কাজ করল তা জনসাধারণের পক্ষে যথেষ্ট সমালোচনার কারণ হল

জাতীয় বুর্জোয়ারা যুদ্ধের সময়ে শিল্প সংগঠনের ভূমিকা পালন করে নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অনেক জোরদার করেছিল। ফলে দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিত ক্ষেত্রে উপনিবেশিক খবরদারীকে পূর্বের মত নতজানু হয়ে তারা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ভারত শাসনের নীতি নির্ধারণে তাদের কণ্ঠস্বর ও যোগ্য মর্যাদা লাভ করুক এটাই ছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের কাম্য ও দাবী। তারা চাইছিল সাম্রাজ্যে এক ধরনের অংশীদারি।

এ ছাড়াও ইংরেজ আমলে গড়ে-ওঠা শিল্পাঞ্চলগুলি বিশেষ করে কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে আর্থ-সমাজিক বিচারে সমাজের নিচুস্তরে অবস্থিত এক শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল যাদের ফরাসীদেশে বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে একটি শব্দে চিহ্নিত করা হয়েছিল, "সাঁকুলেতে" (sans-culotte) বলে। এরা মুটে-মজদুরি নানা ধরনের ছোট-খাটো কাজের সাথে জড়িত ছিল। বাড়ীর মিস্ত্রী থেকে দোকানের কর্মচারী পর্যন্ত সবাই। দৈনন্দিন মজুরীর উপর নির্ভরশীল। চাকুরীর কোনো স্থিরতা ছিল না। আর এদের সাথে যুক্ত হয়েছিল বেকার, অশিক্ষিত ভবঘুরের দল। যাদের অনেকে ভারী শিল্প গড়ে ওঠার দরুন গ্রামাঞ্চলের কুটির শিল্পের সাথে সম্পর্কিত রুজি-রোজগারের সুযোগ হারিয়ে শহরে এসে ভীড় করছিল। পরিস্থিতি স্বভাবতঃই সরকারের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল এবং যে কোনো সামান্যতম প্ররোচনায় বিস্ফোরণের জন্য উন্মুখ হয়েছিল।

সবশেষে, ১৯১৭ সালের (নবেম্বর) রুশ বিপ্লবের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ভারতে ইংরেজ রাজকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। কংগ্রেস সভাপতি অ্যানি বেশান্ত এক বক্তৃতায় বললেন, "রুশ বিপ্লব এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় রিপাবলিক' প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ভারতের পূর্বতন অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে'। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নবেম্বর বিপ্লবের মাত্র সাত মাসের মধ্যে

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারাবলী (জুলাই, ১৯১৮) ভারতীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে কিছুটা সন্তুষ্ট করার জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও রুশ বিপ্লবের প্রকৃত গুরুত্ব তখনো পর্যন্ত ভারতের শ্রমিক সংগঠনগুলিতে পৌঁছায়নি তথাপি তার বাণী এবং মূল আদর্শ ক্রমশঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মনে প্রভাব বিস্তার করছিল। শোষণ এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জয় তাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ভারতে হোমরুল কমিটি এই নামে একটি ছোট পুস্তিকাও "রাশিয়ার শিক্ষা" (Lesson from Russia) নামে প্রকাশ করেছিল। আহ্বান জানানো হয়েছিল শিক্ষিত তরুণ সমাজ যেন সাধারণ মানুষের কাছে রাশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের ঘটনাবলী তুলে ধরেন। রাশিয়ার ঘটনাবলী ভারতে যাতে না পৌঁছায় সেদিকে ব্রিটিশ সরকার বিশেষ নজর রেখেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্যকে চাপা রাখা সম্ভব হয়নি। মণ্টেগু-চেমসফোর্ডকেও তাঁদের রিপোর্টে স্বীকার করতে হয়েছে ভারতে রুশ বিপ্লবের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, ১৯১৮ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে তাঁরা লিখছেন, "ভারতে রুশ বিপ্লবকে মনে করা হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধ বিজয়।...ভাবতীয়দের আশা-আকাঙ্খাকে আরো তীব্র করে তুলেছে।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাককালীন ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া ধীরে ধীরে ব্রিটিশ বিরোধিতার দিকে মোড নিচ্ছিল, দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ শাসনতান্ত্রিক দাবী-দাওয়ার বিষয়ে ক্রমশঃ অভিন্ন মনোভাব পোষণ করায় দেশের মধ্যেও দুই সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন গড়ে উঠেছিল। ১৯০৭ সালে সুরাটে তথাকথিত নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিভেদের ফলে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয়. চরমপন্থীরা তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যান এবং মডারেট বা নরমপন্থীরা কংগ্রেসের নেতৃত্ব দখল করেন। যদিও চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা কেউই পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন না তবু চরমপন্থীরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য অসাংবিধানিক পদ্ধতিও প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, যে ব্যাপারে নরমপন্থীরা একেবারেই রাজী ছিল না। তাঁরা উপরোক্ত লক্ষ্যে পৌছতে চেয়েছিলেন কেবল আইনগত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। কিন্তু ১৯১৪ সালে মান্দালয়ের জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিলকের প্রচেষ্টায় এবং অ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল, ১৯১৫ সালের বোম্বাই কংগ্রেসের দরজা পুনরায় চরমপন্থীদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। অন্যদিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দুই প্রধান পুরোধা গোখ্‌লে এবং ফিরোজ শাহ মেহেতার মৃত্যু (১৯১৫) কংগ্রেসে তিলকের নেতৃত্বকে

সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ এনে দিল। বোম্বাই কংগ্রেসে তিলক যোগ দেন নি। অ্যানি বেশান্তের হোমরুল (Homrule) আন্দোলনের শরিক হয়ে দেশের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে (১৯১৬) তিলক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সময়েই তিলক তাঁর বিখ্যাত উক্তি করেন, "হোমরুল আমার জন্মগত অধিকার, আমি তা অর্জন করবই।" অবশ্য হোমরুল আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন। লক্ষ্য এক হলেও তিলক এবং বেশান্ত দু'টি পৃথক হোমরুল লীগ গঠন করেছিলেন। ১৯১৭ সালের মধ্যে দু'টি লীগের সম্মিলিত সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলে ৬০,০০০—যা আন্দোলনের বিস্ময়কর সাফল্যেরই প্রমাণ।

হোমরুল আন্দোলনের জনপ্রিয়তা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মডারেটদেরও আগ্রহী করে তুলল চরমপন্থীদের সাথে ঐক্যবন্ধন গড়ে তুলতে। এর ফলশ্রুতি ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস—যেখানে দুই বিরোধী-গোষ্ঠীর মধ্যে পুনর্মিলন ঘটল। গোখ্‌লের মৃত্যুর পর তিলকই অবিসংবাদিত কংগ্রেসের নেতা হলেন—যার জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। অন্যদিকে হোমরুল আন্দোলনের স্রষ্টা অ্যানি বেশান্ত কলকাতা কংগ্রেসের (১৯১৭) সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন।

লক্ষ্ণৌতে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। মুসলীমলীগ ও কংগ্রেসের যৌথ আঁতাত। মুসলীমলীগ ও বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে ক্রমশঃ ব্রিটিশ-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করছিল। ব্রিটিশ আমলে মুসলমান রাজনীতিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত প্রাথমিক গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার থেকে জানা যায় মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূ ছিলেন তাঁরাই সর্ব প্রথম ইংরেজদের সাথে নিজেদের ভাগ্যের গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। কিন্তু একই সাথে গ্রামীন অর্থনীতির বাজার যখন বৃহদায়তন শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্যের চাপে ভেঙে পড়ল না তখন দেখা গেল গ্রামীণ বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমান তাঁতী, জোলা, কারিগররাও নতুন কোনো জীবিকার সন্ধানে কলকাতা, বোম্বাইয়ের মত শহরে ভীড় জমাতে শুরু করল। এবং স্বভাবতঃই নতুন পরিস্থিতিতে তাদের জীবনধারণের মানও দ্রুত আধোমুখী হয়ে পড়ল।

ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাও মুসলমান চাষীকে বিশেষ করে বাংলায় যারা ছিল সংখ্যাধিক্য তাদের দৈনন্দিন জীবনকে খাজনার চাপ এবং মহাজনী ঋণের দায়ে প্রায় অর্ধাশনে ঠেলে দিল। সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে এই শ্রেণীর নিচুস্তরের মানুষরা তাদের অভাব অভিযোগ জানানোর মুখপাত্র হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত উলেমাদের গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কেন

-না একমাত্র উলেমাদেরই সুযোগ ছিল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অশিক্ষিত নির্ধনী মুসলমানদের সাথে আত্মিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে। আবার উলেমাদের দৃষ্টিতে ইংরেজ শাসন ছিল তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর প্রচণ্ড আঘাত। ইংরেজরা শুধু মুসলমান শাসনের অবসান ঘটায়নি, উর্দু'র পরিবর্তে ইংরাজীকে করেছিল সরকারী ভাষা এবং অন্যদিকে দিয়েছিল খ্রীষ্ট ধর্মকে অস্বাভাবিক রাজানুকুল্য। মোল্লা, উলেমারা হারালো তাদের এতদিনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশশতকের শুরুতে মুসলমান সমাজের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ও আর্থিক কারণে এক ক্রুদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। (বিস্তৃত আলোচনাস্ত জন্য ; রবীন্দ্র কুমার, পৃ: ২৪-২৫) কিন্তু এই অসন্তোষকে মুসলিম লীগের মধ্যে যাঁরা সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতীক ছিলেন তাঁরা কোনো সার্বিক ইংরেজ বিরোধিতার রূপ দিতে গররাজী ছিলেন। তখন মুসলমানদের মধ্যেই পাতি বুর্জোয়া এবং বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে এসে লীগের অভ্যন্তরে এই সামন্ত-তান্ত্রিক নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানালেন।

এঁদের নেতৃত্বে ছিলেন নোমানি শিবলী, আবুল কালাম আজাদ, জিন্না, মহম্মদ আলী প্রভৃতি। তাঁদের চাপে শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব বাধ্য হল লীগের গঠনতন্ত্র সময়ের সাথে তাল রেখে পরিবর্তন করতে। বলা হল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে থেকে স্বায়ত্তশাসন হল লীগের লক্ষ্য। ১৯১৩ সালে গঠনতন্ত্র পবিবর্তিত হল আর দু'বছরের মধ্যে (১৯১৫) লীগে ব্রিটিশ বিরোধীদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হল যখন মহম্মদ আলী জিন্না, আজাদ এবং অন্যান্য বামপন্থীদের সমর্থনে মুসলীম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। বস্তুতঃ বোম্বাই (১৯১৫)-তে অনুষ্ঠিত মুসলীম লীগের কনফারেন্সে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন গান্ধিজী, মদনমোহন মালব্য এবং সরোজিনী নাইডু প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগের রাজনৈতিক কার্য যখন এক অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, তখন দু'টি দলের সম্মিলিত কর্মসূচী গ্রহণ করতেও অসুবিধা হল না। প্রধানতঃ তিলকের প্রচেষ্টায় লক্ষ্ণৌ (১৯১৬)-তে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল এই উদ্দেশ্যে ঐক্যমতে পৌছালো এবং সাক্ষরিত হল লক্ষ্ণৌ চুক্তি। মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকার স্বীকার করে নিয়ে লক্ষ্ণৌ চুক্তি ইংরেজদের কাছে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী জানানোর ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য হিন্দু-মুসলমানের নিকট আহ্বান জানালো। রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতের দু'টি প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে লক্ষ্ণৌ চুক্তি তারই প্রমাণ। সাম্প্রদায়িক

প্রতিনিধিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ বিভেদ নীতিকেই প্রশ্রয় দিয়েছিল এই সমালোচনা যাঁরা করেন তাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই সংকটময় মুহূর্তে (বিশ্বযুদ্ধে তখনো পর্যন্ত ইংরেজরা সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই) ভারতের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা ছিল সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য। কিছু সামন্ততান্ত্রিক আপোষ বা সম্প্রদায় বিশেষকে সুবিধা দিয়েও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে নামতে হয়। কারণ সেটাই তখন একনম্বর কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৮৩ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে যে তেরোটি উপনিবেশ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে লড়াইতে নেমেছিল তারা তাদের প্রত্যেকের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রশ্নটিকে অমীমাংসিত রেখেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল। ওয়াশিংটনের কাছে প্রধান প্রশ্ন ছিল যুদ্ধে জয়। তিনি জানতেন যুদ্ধে জয় হলে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে উপনিবেশগুলির স্ব স্ব সার্বভৌম ক্ষমতা ত্যাগের প্রশ্নটির উপযুক্ত সমাধানও হয়ে যাবে। তেমনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইতে হিন্দু-মুসলমানরা যদি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করে তাহলে হয়ত শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের নীতিও অর্থহীন হয়ে যেতে পারে। আস্থার অভাব থেকে রক্ষা কবচের প্রশ্ন আসে কিন্তু পারস্পরিক বিশ্বাস অর্জন করলে সেটা আর বড় হয়ে দাঁড়ায় না। এই কারণেই রুশ ঐতিহাসিকরা সঠিক ভাবেই লিখেছেন যে, লক্ষ্ণৌ চুক্তিকে ভারতের জনগণ দেখেছেন দেশের স্বাধীনতার লড়াইতে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টা হিসেবে। (হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া; আন্তনোভা; লেভিন এবং কটোভস্কি; ২য় খণ্ড; পৃঃ ১৪৬)

(৩)

১৯১৯ সালের ২২শে মে, ভারত সচিব "হাউস অব কমন্স"-এ একটি বিবৃতি দেন ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে। তাঁর মতে "অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়···অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ও বিপ্লব দেখা যাচ্ছে।" এর কারণ হিসেবে তিনি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকেই দায়ী করেন। কি কি কারণে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শোচনীয় অবস্থায় পৌচেছে তারও বিবরণ দেন, সেই কারণগুলি হল—অনাবৃষ্টি, পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব, অত্যধিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সেনাবাহিনীতে যোগদানের ফলে বিশেষ করে পাঞ্জাবে, পরিবারে সাধারণ রুজি রোজগারের লোকের ঘাটতি—ফলাফলে স্বল্পায়তন জমিতে আবাদ, ইনফ্লুয়েঞ্জাতে

৫ থেকে ৬ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু এবং জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ লোক অসুস্থ হওয়ায় কৃষি ও শিল্পে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। (মণ্টেগুর বক্তৃতা ; উদ্ধৃতির জন্য, হিষ্ট্রি অব দি ফ্রিডম ম্যুভমেণ্ট ; তারাপদ ; ৩য় খণ্ড ; পৃ. ৪৭১ ; ভারত সরকার ; ১৯৮৩) ১৯১৮-র শেষ থেকে ১৯১৯-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত ভারতে এক অভূতপূর্ব শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা গেল। ১৯১৮-র ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই মিলে ধর্মঘট শুরু হল। জানুয়ারীতে সে ধর্মঘটে প্রায় একলক্ষ পঁচিশ হাজার শ্রমিক সামিল হল। যুদ্ধের সময়েই সেনাবাহিনীতে কোথাও কোথাও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ অবসানে অর্থনৈতিক অবস্থা আরো দুঃসহ হয়ে পড়ল। জীবনযাত্রা খরচের সাধারণ পরিমাণ কিভাবে বেড়েছিল তা' বোঝা যায় যদি ১৮৭৩ সালে ১০০কে ভিত্তি ধরা যায়। তাহলে দেখতে পাব মূল্যসূচক এই ভাবে বেড়েছে— ১৯১৭ = ১৯৭ ; ১৯১৮ = ২২৫ ; ১৯১৯ = ২৭৬ ; ১৯২০ = ২৮১। কেবল গমের এবং বাজরার মূল্য সূচক ভয়াবহ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা' প্রধানতঃ ভারতের সাধারণ মানুষের খাদ্য। ১৮৭৩কে ভিত্তি বছর (১৮৭৩ = ১০০) ধরে দেখা যায় গম: ১৯১৭ = ১৭৯ ; ১৯১৮ = ২৫৯ ; আর বাজরা: ১৯১৭ = ১৫০ এবং ১৯১৮ = ৪১০। (ষ্ট্যাটিসটিক্যাল আবস্ট্রাকট ফর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া (১৯১৭-১৮ থেকে ১৯২৬-২৭) ; উদ্ধৃতির জন্য ; জুডিথ ব্রাউন ; পৃ. ৯৪ এবং ১২৫) কংগ্রেস সভাপতি লালা লাজপত রায়ের ভাষায়—"এ সত্যকে অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই যে আমরা এক বিপ্লবাত্মক অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। "১৯১৯ সালের কুখ্যাত "রাওলাট আইন" প্রনয়ণই ব্রিটিশ কর্তৃক এই "বিপ্লবাত্মক অধ্যায়ে"র পরোক্ষ স্বীকৃতি। শুধু হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা নয় জওহরলাল নেহেরুর মতে কিছু কিছু মুসলমান তরুণও বিদ্রোহাত্মক ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। [ভারত সন্ধানে (অনুবাদ) ; জওহারলাল নেহেরু ; পৃ. ৩৯৭ ; কলকাতা ১৩৫৬]

ভারতে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের ক্ষেত্রটি পূর্বভারতে প্রস্তুত হয়েছিল বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫-১১) মধ্য দিয়ে। ১৯১৬ সালে হোমরুল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিম ভারত, উত্তরপ্রদেশ ও প্রধান প্রধান শহর ও গ্রামগুলিতে। সারাভারতে ২০০টি শাখা গঠিত হয়েছিল। স্থানীয় ভাষা ও ইংরাজীতে ২৬টির মত প্রচার-পুস্তিকা বিলি করা হয়েছিল। লীগের প্রচার ও তাৎপর্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জুডিথ ব্রাউন মন্তব্য করেছেন যে এটা দেখার মত সদস্যরা এমন এমন সব জায়গা, বর্ণ ও আর্থিকগত অবস্থান থেকে এসেছিলেন—যা' এতদিন কংগ্রেসের ধরা-ছোঁয়ার

বাইরে ছিল। যদিও লীগের নেতৃত্ব ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল তথাপি নিম্নবর্ণের লোকেরা অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল। খান্দেশ জেলায় ব্রাহ্মণদের চেয়ে অব্রাহ্মণ সদস্যের সংখ্যা বেশি ছিল। বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তামিলরা সিন্ধুতে এবং বানিয়ারা গুজরাটে শোভসাহী সমর্থক ছিল। পুনা এবং নাসিক জেলায় কৃষিজীবী এবং বণিক সম্প্রদায় সদস্যপদ নিয়ে ছিলেন। ১৯১৬ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় বোম্বাই, সেন্ট্রাল প্রোভিন্স (মধ্যপ্রদেশ) এবং মাদ্রাজে রাজনৈতিক তৎপরতা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কি বিহার যেখানে তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যা অল্প ছিল সেখানেও লীগের বহু সংস্থা তৈরী হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে কি ধরনের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তার প্রমাণ গুন্টুর জেলার তেসালি তালুকের কালেকটারের বিবরণ, যিনি তাঁর রিপোর্টে লীগের তৎপরতার কথা উল্লেখ করেছেন, (মনে রাখা প্রয়োজন এই গুন্টুর জেলা গান্ধিজীর নির্দেশকে অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কর বন্ধ করেছিল।) প্রচারের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব সংযোজিত হয়েছিল। যেমন পোষ্টার, ছবি আঁকা পোষ্টকার্ড, উপদেশ মূলক বক্তৃতা, কীর্তন, এমন কি নাটকের দল। (জুডিথ ব্রাউন; পৃ, ২৭—২৮) সাপ্তাহিক "কমনওয়েল" (Commonweal) এবং "দৈনিক নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় অ্যানি বেশান্ত দিনের পর দিন 'স্বরাজে'র অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেন। বঙ্গভঙ্গের সময়ের কথা মনে রেখে আবার স্বদেশী এবং জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদেব সদস্য রেগিন্যালড ক্র্যাডক শিক্ষিত ভারতীয়দের উপর হোমরুল লীগের প্রচার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, "নিয়মসম্মত আন্দোলনের আড়ালে, যে সমস্ত ব্যক্তি সংবাদপত্র পড়ে তাদের মন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে।" (উদ্ধৃতির জন্য, তারাচাঁদ, ৩য় খণ্ড; পৃ. ৪৫০)

সুতরাং ১৯২০ সালে গান্ধিজী যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন তখন ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের ক্ষেত্রটি পুরোপুরি প্রস্তুত এবং স্বরাজের শ্লোগানটি পরিচিত ও "বয়কট" বা বর্জন ও (আন্দোলনের প্রথম স্তরে) পরীক্ষিত (বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আমলে)। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র গান্ধিজী যা' করলেন, তাকে বলা যেতে পারে, হোমরুলের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু হোমরুল দীর্ঘজীবী হোক।

যে অ্যানি বেশান্ত লণ্ডনের "দি টাইমস" পত্রিকার মতে হোমরুল লীগ

প্রতিষ্ঠা করে প্রথম ছ'মাসে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে জোয়ার এনেছিলেন (উদ্ধৃতি ; বি, এন, পাণ্ডে ; পৃ ৯৯) এবং বোম্বাই-কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর, ১৯১৮) উৎসাহজনকভাবে সমর্থিত হয়েছিলেন তিনিই দিল্লী কংগ্রেসে (ডিসেম্বর, ১৯১৮)। সময়ের সঙ্গে তাল না রাখতে পেরে পেছনের বেঞ্চিতে স্থান গ্রহণ করলেন। ১৯১৯ সালের ১৮ই এপ্রিল রাওলাট বিলকে সমর্থন করে লিখলেন যে প্রস্তর নিক্ষেপকারী জনতাকে সেনাবাহিনীর গুলি করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। আরো এগিয়ে গিয়ে তিনি শুধু সংস্কারাবলী (১৯১৯)-কে সমর্থনই করলেন না, কংগ্রেসের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলিরও বিরোধিতা করলেন। আইন-শৃঙ্খলার প্রতি নাগরিকরা শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি অসহযোগ বা গান্ধিজীর আন্দোলনের বিরোধিতা করলেন। ১৯১৯ সালের ২৩শে এপ্রিল উইলিংডন (বোম্বাইয়ের গবর্নর) ভাইসরয় চেমস ফোর্ডকে উৎসাহের সাথে জানাচ্ছেন, মিসেস বেশান্ত "মনে হয় দুর্দান্তভাবে সরকারপক্ষীয় হয়েছেন এবং আমি তাঁকে (রূপকভাবে ?) শীগ্‌গির বুকে তুলে নেবো।" (উদ্ধৃতির জন্য, জুডিথ ব্রাউন ; পৃ, ১৮১ ; মজুমদার ; ৩য় খণ্ড ; পৃ, ৪৪-৪৫) তিলকের ভূমিকাও বিস্ময়কর। সুরাট কংগ্রেসের (১৯০৭) প্রাক্কালে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ইতিহাসের পরিহাসে কালক্রমে সেটি তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়েছিল। অথচ সুরাট কংগ্রেসে তিনি চরমপন্থীদের নেতা ছিলেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক উক্তি ছিল : "আজকের চরমপন্থীরা আগামীকাল নরমপন্থী হবে—যেমন, আজকের নরমপন্থীরা গতকাল চরমপন্থী ছিলেন...... "চরমপন্থী" শব্দটি প্রগতির অভিব্যক্তি।" ১৯১৯ সালে ভারতশাসন আইনের ক্ষেত্রে তিলকের ভূমিকা ছিল দায়িত্বশীল সহযোগিতা (responsive co-operation)। তিনি ধীরে ধীরে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন (colonial self-government) (তারাচাঁদ ; ৩য় খণ্ড ; পৃ, ১৪৪) অমৃতসর কংগ্রেসের (ডিসেম্বর, ১৯১৯) পর তিনি কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করেন। ম্যানিফেস্টোতে তিনি পার্টির উদ্দেশ্য হিসেবে জানালেন তাঁরা মণ্টেগু সংস্কারাবলীকে প্রয়োজনবোধে নিঃশর্ত সহযোগিতা জানাবেন অথবা নিয়মসংগত ভাবে বিরোধিতা করবেন। তিলক অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষে কোনো কথা বলেননি। তবে তিনি এর প্রকাশ্য বিরোধিতাও করেননি। গান্ধিজীর কাছে তিনি অসহযোগ আন্দোলন সার্থকভাবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ প্রকাশ করে-ছিলেন। তাঁর মতে দেশবাসী অসহযোগ আন্দোলনের মানসিকতা নিয়ে তখনও

পর্যন্ত তৈরী হয়নি। "আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার জন্য আমি কিছু করব না। আমি আপনার সাফল্য কামনা করি এবং জনগণের সমর্থন যদি লাভ করতে পারেন, তাহলে আমাকেও উৎসাহী সমর্থক পাবেন," (উদ্ধৃতির জন্য, মজুমদার ; ৩য় খণ্ড ; পৃ. ৭৯) ঐতিহাসিক তারাচাঁদ অসহযোগ আন্দোলনে তিলকের সমর্থন ছিল বলে সুস্পষ্টভাবে মন্তব্য করলেও স্বয়ং গান্ধিজী এব্যাপারে সুনিশ্চিত সমর্থনের কথা লিখতে পারেননি। গান্ধিজীর ধারণা লোকমান্য তিলক বেঁচে থাকলে তাঁকে আশীর্বাদ করতেন। তবে "তিনি (তিলক) যদি আন্দোলনের বিরোধিতাও করতেন তাহলেও আমি তাঁর বিরোধিতাকে শ্রদ্ধার সাথে নিতাম এবং আমার ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রদ মনে করতাম। (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী ; পৃ, ৩০৫ ; তারাচাঁদ ; ৩য় খণ্ড ; পৃ, ৪৮৯) ১৯২০ সালের ১৯শে জানুয়ারি দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমান নেতাদের সামনে যখন অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ও পরিকল্পনা গান্ধিজী পেশ করলেন সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তখন আসফ আলীর বিবরণ অনুযায়ী তিলক আলোচনা শেষ হওয়ার পূর্বেই অন্যত্র জরুরী কাজ আছে বলে স্থান ত্যাগ করেন। অবশ্য যাওয়ার পূর্বে তিনি আশ্বাস দিয়ে যান আলোচনায় গৃহীত যে কোনো সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন। (মজুমদার, ৩য় খণ্ড ; পৃ, ৭৮) অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তিলক উদাসীন ছিলেন। আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে তিনি গান্ধিজীর কাছে সন্দেহ ব্যক্ত করেন। ১৩ই জুলাই, ১৯২১, গান্ধিজী এক প্রবন্ধে লেখেন যে তাঁর সাথে তিলকের শেষ সাক্ষাতকারে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন (মহাত্মা, ২য় খণ্ড ; পৃ, ৪৮)।

বস্তুতঃ অসহযোগ আন্দোলন অ্যানি বেশান্তের কাছে বৈপ্লবিক মনে হয়েছিল আর তিলকের প্রকাশিত ম্যানিফেষ্টোর বিরোধী, অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক বৈধসম্মত আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাওয়া। বাওলাট বিল বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে তিলক নিন্দা না করলেও তাঁর অতি অনুরাগী জি, এস, খাপাড়ে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। ৬ই এপ্রিল সারা দেশব্যাপী যে হরতাল আহ্বান করা হয়েছিল তাতে "মহারাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের অবতার তিলকের অনুগত জেলাগুলি রাজনীতিকদের বাধা দিয়েছিল উঠতি গুজরাটী বেনিয়াকে সমর্থন করতে।" (জুডিথ ব্রাউন ; পৃ, ১৭২ এবং ১৬৯, ২৫৭)

অসহযোগ সুস্পষ্টভাবে জানায় সরকারী আইন, নির্দেশ এবং নিয়মের) বিরোধিতা। গান্ধিজীর মতে "এক শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহ—রাষ্ট্রের তৈরী প্রতিটি আইনের বিরোধিতা। এটি নিশ্চয় সশস্ত্র বিদ্রোহের চেয়েও বিপজ্জনক।" উদ্ধৃতির জন্য, তারাচাঁদ, ৩য় খণ্ড, পৃ, ৪৯১) বেশান্ত এবং তিলক রাষ্ট্রীয়

আইনের প্রতি এ ধরণের অশ্রদ্ধা দেখাতে রাজী ছিলেন না। সুভাষচন্দ্রের মতে, "লোকমান্য তিলক মনে করতেন দায়িত্বশীল সহযোগিতা করাই হবে যোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী…তাঁর মৃত্যুর পর লোকমান্য তিলকের ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা বলেছেন যে তিনি মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত এই মতামতই পোষণ করতেন," (দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল ; সুভাষচন্দ্র বসু ; পৃ. ৪৪ ; এশিয়া, ১৯৬৭) যে স্বরাজের দাবী হোমরুল লীগের নেতারা জানিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের দাবীপত্রের মধ্যে সেই স্বরাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং নেতাদের সক্রিয় সমর্থন না মিললেও সাধারণ সদস্যদের সমর্থন গান্ধীজী পুরোপুরি লাভ করেছিলেন! কারণ রাওলাট সত্যাগ্রহের দিনগুলি থেকেই গান্ধীজী ধীরে ধীরে হোমরুল লীগের তরুণ সমর্থকদের অন্তঃকরণ জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বস্তুতঃ সত্যাগ্রহে তাঁর প্রধান সমর্থক ছিল আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের হোহরুল সদস্যরা। জুডিথ ব্রাউনের মতে "তাঁর মুখ্য অনুচররা ছিল হোমরুল পন্থীরা।" (গান্ধীজী রাইজ টু পাওয়ার, পৃ. ১৬৬) ফলে এটা কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা নয় যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার (আগষ্ট, ১৯২০) মাত্র চার মাস পূর্বে অ্যানি বেশান্তকে সরিয়ে দিয়ে হোমরুল সদস্যরা গান্ধিজীকে সভাপতি নির্বাচিত (এপ্রিল, ১৯২০) করলেন। তিলকের মৃত্যুর পর (১লা অগাষ্ট, ১৯২০) হোমরুল আন্দোলন গান্ধিজীর আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেঁচে রইল। প্রকৃতপক্ষে তার পৃথক অস্তিত্ব ছিল অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয়। গান্ধিজী নেপোলিয়নের মতই বলতে পারতেন, "আমি হোমরুলের সন্তান এবং আমি হোমরুলকে ধ্বংস করেছি।"

হোমরুল আন্দোলনকারীরা যদি সুদূর গ্রামে এবং জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট হলেও ইংরেজ-বিরোধী প্রচার ছড়াতে না পারতেন তাহলে গান্ধিজীর আহ্বানে স্বল্প সময়ের মধ্যে এত ব্যাপক সাড়া পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ আছে। (বিহার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জুডিথ ব্রাউন মন্তব্য করছেন যে উত্তর প্রদেশের মত সেখানেও ১৯১৯ সাল থেকে হোমরুলপন্থীরা কৃষকদের অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন। (গান্ধীজ রাইজ টু পাওয়ার ; পৃ. ২৮৭)

গান্ধিজী জাতের দিক থেকে ছিলেন বৈশ্য এবং জাতিগত ধাপে ব্রাহ্মণ, কায়স্থর পর বৈশ্যদের অবস্থান তৃতীয়। বৈশ্যরা মূলতঃ ব্যবসা এবং কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিল। আধুনিক কিছু ঐতিহাসিক সাধারণ মানুষের উপর গান্ধিজীর অসাধারণ প্রভাবের ব্যাখ্যার কোনো বস্তুগত কারণ খুঁজে না পেয়ে ধারণা করেন যে তাঁর জাতিগত অবস্থানই তাঁকে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর কাছে

টেনে নিয়ে গেছল। বিপরীত দিক থেকে বলতে গেলে হিন্দু ভদ্রলোকরা যাঁরা এতদিন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাঁরা সাধারণ মানুষকে কখনোই মূল্য দেননি। জে. এইচ. ব্রুমফিল্ডের ভাষায়, হিন্দু ভদ্রলোক রাজনীতিকরা "সাধারণ মানুষ (mass)-কে বোঝেননি এবং বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক পাছে নষ্ট হয়ে যায় এই আশংকায় তাঁদের নিজেদের উপর কোনো আস্থা ছিলনা এদের (সাধারণ মানুষ) নিয়ন্ত্রণ করা বা নেতৃত্ব দেওয়ার।" ভদ্রলোকরা সাধারণ মানুষকে বোঝেননি একথাটি অতিশয়োক্তি। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ধনী বাড়ীর সন্তান গান্ধিজী নিজেও ছিলেন "ভদ্রলোক" সম্প্রদায়ভুক্ত। ভদ্রলোক কারা? বাংলাদেশে এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রেগিন্যাল্ড ক্র্যাডক তাঁর সরকারী বিবরণীতে (২৭শে এপ্রিল, ১৯১৩) লেখেন যে ভদ্রলোকরা "সমগ্র গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে আছেন এবং কোথাও কোথাও তাঁদের সংখ্যা এত বেশী যে গ্রাম সমাজে তাঁরাই হয়ে দাঁড়ান সংখ্যাগরিষ্ঠ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান জমিদার এবং রায়তদের মাঝামাঝি।" (উদ্ধৃতির জন্য, তারাচাঁদ, ৩য় খণ্ড; পৃ. ৪৪৬) সুতরাং ভদ্রলোকদের আর্থিকগত অবস্থান সাধারণ মানুষের বোঝার পক্ষে কোনো অসুবিধার কারণ ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ "ভদ্রলোক" সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও গান্ধিজীর বহুপূর্বে সমাজের নিম্নবর্গ মানুষের উন্নতির প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বামীজী বলছেন, "ধনী ব্যক্তিরা...... কেবলমাত্র দেশের অলংকার আর সাজগোজ। লক্ষ লক্ষ নিম্ন শ্রেণীর মানুষই এর জীবন।" "ভারতের একমাত্র আশা তার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। উচ্চ-শ্রেণীর ব্যক্তিরা দৈহিক এবং নৈতিক দিক থেকে মৃত।" অন্যত্র শিষ্য বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করছেন, কিভাবে ভারতের পুনর্জাগরণ ঘটতে পারে? স্বামীজী তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন 'বর্তমানে তোমার কর্তব্য হবে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়ে মানুষকে বোঝানো যে কেবল অলস হয়ে বসে থাকলে চলবে না।" (উদ্ধৃতির জন্য, সোস্যাল-পলিটিক্যাল ভিউজ অব বিবেকানন্দ; বিনয় কুমার রায়; পৃ. ৩০ এবং ৫২-৫৩; দিল্লী, ১৯৭৯) তবে বিবেকানন্দ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। কিন্তু লোকমান্য তিলক ছিলেন। ১৯১৪ সালে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তিলকের জনপ্রিয়তা অসাধারণ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে যোগ দিতে যাওয়ার সময়ে পথের দুধারে হাজার হাজার জনতা যেভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে ছিল তা' কেবল অসহযোগের দিনগুলোয় গান্ধিজীর অভ্যর্থনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে সর্বভারতীয় নেতারূপে তাঁর আবির্ভাব। গান্ধিজীর মত তিনিও সনাতন

ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার তীব্র বিরোধী ছিলেন। ১৯১৮ সালে বোম্বাইতে অনুন্নতশ্রেণীর সম্মেলনে (মার্চ মাসে) তিনি দৃপ্তভাবে ঘোষণা করেছিলেন, "যদি ঈশ্বর অস্পৃশ্যতাকে সহ্য করেন, তাহলে তাঁকে আমি ঈশ্বর বলে স্বীকার করব না।...অস্পৃশ্যতা দূর হওয়া প্রয়োজন...প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ আমলাতন্ত্রের এটা ভুল, সংশোধন করতে হবে।" (উদ্ধৃতির জন্য, তারাচাঁদ; ৩য় খণ্ড; পৃ. ১৪৮) ১৯২০ সালে গঠিত দলের ম্যানিফেষ্টোতে তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, তাঁর দল "জাতিভেদ অথবা আচারের উপর তৈরী সমস্ত ধরনের সামাজিক, নাগরিক অক্ষমতা দূর করার পক্ষে।" (ঐ; পৃ. ১৪৯) স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমান্য তিলকের মত মহাত্মা গান্ধীও "ভদ্রলোক" সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে তিনিও হিন্দুদের মত সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী এবং হিন্দুসমাজের চাতুবর্ণে আস্থাবান হয়েও ওদের মতই অস্পৃশ্যতার নিন্দা করেছিলেন। বরং গান্ধিজী প্রাচীন হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে সামাজিক সংস্কারের কথা বলেছেন। এমন কি তিনি অসবর্ণ বিবাহের বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছিলেন। গান্ধিজীর পূর্বে বা তাঁরই সময়ে তিলক রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের ভূমিকার গুরুত্ব "হিন্দু ভদ্রলোক" হিসেবেই উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে এই ক্ষেত্রে তিলক যেখানে শেষ করেছেন, গান্ধিজী সেখান থেকে শুরু করেছেন। তিলক সাধারণ মানুষকে নিয়মসংগত আন্দোলনের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু গান্ধিজী নিয়ম-বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের পথে সাধারণ মানুষকে টেনে এনেছিলেন। সাধারণ মানুষের গুরুত্ব না বুঝলে তিলকের হোমরুল লীগ কৃষকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করত না। পাঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতিকার হিসেবে গান্ধিজী যখন অসহযোগের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ করার কথা বলছেন, তখন তিলক চিন্তা করেছিলেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত শাসন বিধিতে আরো কিছু সংস্কারের সুবিধা অর্জন। লণ্ডনে অবস্থিত ভি, জে, প্যাটেলকে একপত্রে (২৬শে জুন, ১৯২০) তিনি হতাশ হয়ে জানাচ্ছেন, এ বিষয়ে তাঁর পক্ষে সক্রিয়ভাবে কিছু করা সম্ভব নয় যদি না গান্ধী তাঁকে সাহায্য করেন। "কিন্তু গান্ধী তাঁর কল্পিত অসহযোগ নিয়ে ব্যস্ত আছেন।" (উদ্ধৃতির জন্য, জুডিথ ব্রাউন; পৃ. ২৪৫-৪৬)

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গান্ধিজী কংগ্রেসকে তার নরমপন্থীদের পিটিশন বা আবেদনের রাজনীতি থেকে মুক্তি দিলেন। নরমপন্থী বা মডারেটরা পাঞ্জাব ও খিলাফতের চেয়ে ইংরেজপ্রদত্ত সংস্কারাবলীর প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিল। অসহযোগ আন্দোলন জন্ম দিল এক শক্তিশালী গণ আন্দোলনের— যা' ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের সবগুলি প্রদেশে। পক্ষান্তরে মডারেটরা শুধু যে

কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ালেন তাই নয় সরকারী উচ্চপদে আসীন হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতায় নেমে পড়লেন (মহাত্মা ; ২য় খণ্ড ; পৃ. ৩১)

জাতীয় আন্দোলনে সত্যাগ্রহের মাধ্যমে অসহযোগের নীতি গ্রহণ একটি অভিনব পদ্ধতি সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ; সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট আইন নির্যাতনেরই নামান্তর। সুতরাং একজন সত্যাগ্রহের উচিত হবে সেই আইন-শৃঙ্খলার সাথে সহযোগিতা না করা। গান্ধিজীর ভাষায়, "যখন রাষ্ট্র নিজেই আইন বর্জিত (lawless) তখন আইন অমান্য করা একটি পবিত্র কর্তব্য। যে নাগরিক এই রাষ্ট্রের সাথে অংশীদার হয়, সেও অরাজকতার দুর্নীতির অংশীদার" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ; ৫ই জানুয়ারী, ১৯২২) রাষ্ট্রীয় আইন অগ্রাহ্য করার এই ব্যাখ্যা বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্বকে "আইনবর্জিত" রূপে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা খুবই বৈপ্লবিক এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আরও বৈপ্লবিক মনে হবে যখন তিনি বারদৌলীতে করবন্ধ আন্দোলন শুরু করার পুর্বে দেশবাসীকে জানালেন (অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং, দিল্লী, নবেম্বর ৪, ১৯২১) এটি অদূর ভবিষ্যতে গণ-আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করবে। "গণ-আইন অমান্য ভূমিকম্পের মত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করে। যেখানে গণ-আইন অমান্যের শাসন শুরু হয়, সেখানে বর্তমান সরকারের শাসনের সমাপ্তি ঘটে।" আর শাসনের সমাপ্তি ঘটলে (অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ শাসন) "জনগণকে প্রস্তুত থাকতে হবে" সরকারি সমস্ত সম্পত্তি (যেমন, পুলিশ, আদালত প্রভৃতি) "গ্রহণ করার জন্য", (মহাত্মা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬) তবে তাঁর পরিকল্পিত গণ-আইন অমান্য ঘটবে একের পর এক জায়গায়। তাঁর বর্ণনা-মাফিক—"যখন স্বরাজের বিজয় পতাকা বারদৌলীতে উড়বে (অর্থাৎ সাফল্য-জনক করবন্ধ আন্দোলন প্রয়োগের পর) তখন বারদৌলীর পরবর্তী তালুক বারদৌলীর উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের মধ্যে স্বরাজের পতাকা উড্ডীন করতে চাইবে, এই ভাবে জেলার পর জেলা নিয়মমত ধারাবাহিক (in regular succession)-ভাবে সারাভারত জুড়ে স্বরাজের পতাকা উড়বে" (ঐ)।

লক্ষণীয় গান্ধিজীর গণ-আইন অমান্য আন্দালনের পরিকল্পনায় সারাভারত জুড়ে একসাথে গণ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনো প্রোগ্রাম বা কর্মসূচী ছিল না। বস্তুতঃ জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধি হিসেবে জনগণকে বিপ্লবের ভূমিকা তিনি দিতে পারেন না। তাই চৌরিচৌরার ঘটনার এগারো দিন পরে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" (১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২) পত্রিকায় এ ধরনের গণ-আইন অমান্যের

বিপদ ও সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। "যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহে বারদৌলীতে জয় হয় এবং বারদৌলীর অনুকূলে ভারত সরকার শাসন ক্ষমতা ত্যাগও করে তখন উচ্ছৃঙ্খল লোকেদের কে নিয়ন্ত্রণ করবে?" গান্ধিজীর ধারণায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম অহিংসা থেকে সামান্য কিছু পথ ভ্রষ্ট হলেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে। আন্দোলন চলবে যান্ত্রিক শৃঙ্খলাকে অক্ষরে অক্ষরে মান্য করে। হজরত মোহানী যখন তাঁকে অনুরোধ করলেন, একই সময়ে দেশের সর্বত্র কর বন্ধের আন্দোলন শুরু করা হোক, তা' না হলে সরকার একটি নির্দিষ্ট স্থানের আন্দোলন সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে ধ্বংস করে দেবে তখন গান্ধিজী তাতে সম্মতি দিলেন না। (ঐ; পৃ. ৬৬) তাঁর কাছে উপায়টি প্রধান; লক্ষ্যটি গৌণ। ১৯২২ সালে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃতি দিতে গিয়ে জওহরলাল বলছেন, "আমরা দেশ এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার জন্য লড়ছি। ...মুক্তির যুদ্ধের মধ্যে ভারতকে সেবা করা গৌরবজনক। আরো দ্বিগুণ সৌভাগ্য মহাত্মা গান্ধীর মত নেতার অধীনে ভারতকে সেবা করা।" (ঐ; পৃ. ৭৪) কিন্তু গান্ধিজী বর্ণিত স্বরাজ "যদি সম্ভব হয় ব্রিটিশ সাম্রাজের মধ্যে—প্রয়োজন হলে তার বাহিরে অর্জন করতে হবে।" (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী; পৃ. ৩০৬) রমেশ চন্দ্র মজুমদার গান্ধিজীর কলকাতা কংগ্রেসে পেশ করা প্রস্তাবের তৃতীয় ধারা বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন যে, পাঞ্জাব এবং খিলাফতের অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য স্বরাজের দাবী করা হয়েছিল। (মজুমদার ৩য় খণ্ড; পৃ. ৯৫) জওহরলাল নেহেরু তাঁর "আত্মচরিত"-এ লিখছেন "আমাদের অধিকাংশ নেতা স্বরাজ বলিতে স্বাধীনতা অপেক্ষা কম বুঝিতেন। গান্ধিজী নিরুদ্বিগ্নচিত্তে বিষয়টিকে অস্পষ্ট করিয়া রাখিতেন এবং এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেন না।" (বাংলা অনুবাদ; পৃ. ৮১) যিনি এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন বলছেন সেই গান্ধিজীকে যখন তরুণ সুভাষচন্দ্র আন্দোলনের বিস্তৃত পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন তখন তিনি তার সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হন। সুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছে আন্দোলনের পর্যায় সম্পর্কে গান্ধিজীর নিজেরই কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। (দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল; পৃ. ৫৪-৫৫) আমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯২১) হজরত মোহানী "স্বরাজের" সংজ্ঞা "বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি" বলে যে প্রস্তাব এনেছিলেন গান্ধিজীর তীব্র বাধাদানের ফলে তা' বাতিল হয়ে গেল। তিনি একে দায়িত্বজ্ঞানহীনের পরিচায়ক বলে মন্তব্য করলেন। (উদ্ধৃতির জন্য, ইণ্ডিয়া টুডে; পৃ. ৩৪৭) বস্তুতঃ "স্বরাজ"-এর অর্থ যে "পূর্ণ স্বাধীনতা"—এটি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার সাত বছর পরে ১৯২৯

সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত হয় এবং স্বয়ং গান্ধিজী সেই প্রস্তাব উত্থাপিত করেছিলেন।

কৌতুহলের বিষয় স্বরাজের দাবীটি প্রথমে গান্ধিজীর চিন্তায় ছিল না। এটি গ্রহণ করেছিলেন বিজয় রাঘবাচারীর (মোতিলাল নেহেরুর সম্মতি) সংশোধনী প্রস্তাব (কলকাতা কংগ্রেস, ১৯২০) আকারে। গান্ধিজী বলেছেন, এই সংশোধনী তিনি তৎক্ষণাৎ মেনে নেন। কিন্তু চৌধুরী খালিকুজ্জমান যিনি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর মতে অনিচ্ছুক গান্ধিজী শেষ পর্যন্ত মৌলানা সৌকত আলীর একান্ত আবেদনে প্রস্তাবটি মেনে নিতে রাজী হন। (মজুমদার ৩য় খণ্ড; পৃ. ৮২৬; ১১ নং পাদটীকা)

গান্ধিজী নিজেও স্বীকার করেছেন তিনি অসহযোগ আন্দোলনের কথা ভেবেছিলেন কেবল পাঞ্জাব এবং খিলাফতের অন্যায় প্রতিকারের জন্য। "আত্মচরিতে" গান্ধিজী লিখেছেন বিজয় রাঘবাচারী বললেন, যদি অসহযোগ ঘোষণা করতে হয় তাহলে কেন বিশেষ কতগুলি অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য? স্বরাজ না থাকাটাই তো দেশের উপর সবচেয়ে বড় অন্যায়! মোতিলাল নেহেরু-ও আবেদন জানালেন প্রস্তাবের মধ্যে স্বরাজের দাবী অন্তর্ভূক্ত করতে। (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী; এম. কে. গান্ধী, পৃ. ৩০৫)।

বস্তুতঃ গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনে নেমেছিলেন পাঞ্জাব ও খিলাফতের জন্য। স্বরাজ তাঁর উপর চাপানো হয়েছিল। এই কারণেই আন্দোলনে নেমেও তিনি স্বরাজের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও দেননি বা কোনো বক্তৃতা বা লেখাতেও স্বরাজের কোনো রাজনৈতিক সংজ্ঞা দেননি। স্বরাজ অর্জন করতে গেলে কি কি গুণ বা যোগ্যতা প্রয়োজন (যেমন, খাদি, অহিংসা, বয়কট প্রভৃতি) সে ব্যাপারে কিন্তু তিনি লেখা বা বক্তৃতায় কোনো পার্থক্য রাখেননি। ১৯২২ সালের মার্চে বিচারক ব্রুমফিল্ড (**Broomfield**)-এর কাছে বিচারের সময়ে গান্ধিজী তাঁর দেওয়া বয়ানে অসহযোগ আন্দোলনে নামার কারণ হিসেবে রাওলাট আইন তথা পাঞ্জাবের অত্যাচার এবং খিলাফত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা উল্লেখ করেছিলেন। দীর্ঘ বিবৃতিটির কোথাও তিনি লেখেননি যে স্বরাজ না পাওয়াটাই সবচেয়ে বড় অন্যায় এবং সেই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আন্দোলনে নেমেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিবৃতির কোথাও "স্বরাজ" শব্দটির উল্লেখমাত্রও নেই (গান্ধিজীর বিবৃতি; মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃ. ৯৭—১০০)।

যে পাঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতিকারের কথা গান্ধিজী বলেছেন সেটিকেও তিনি প্রথমে অসহযোগের অন্তর্ভূক্ত করেননি। মিসেস অ্যানি বেশান্ত লিখেছেন,

"এটা স্মরণ করা যেতে পারে মিঃ গান্ধী ১৯২০ সালের মার্চে খিলাফতের জন্য অসহযোগ আন্দোলনকে অন্য কোনো প্রশ্নের সাথে জড়াতে বারণ করেছিলেন।" (উদ্ধৃতির জন্য মজুমদার, ৩য় খণ্ড; পৃঃ ৮২৭) খিলাফত প্রশ্নকে কেন পাঞ্জাবের সাথে জড়ানো উচিত হবে না তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের উচিত খিলাফত প্রশ্নটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অবশ্য যদি আমরা চাই এর পূর্ণ মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করতে।" (মহাত্মা, ১ম খণ্ড; পৃ. ২৭৩) গান্ধিজী নিজেও বলেছেন যে তাঁর কতিপয় বন্ধু তাঁকে পাঞ্জাবের প্রশ্নটিকে খিলাফতের সাথে জড়াতে বলেছিলেন কিন্তু তিনি সে পরামর্শে রাজী হননি।

লক্ষণীয় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবের উপর অত্যাচার ঘটল ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট বেরিয়েছিল তারও বহুপূর্বে ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে। অমৃতসরে কংগ্রেস বসল ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। জোর বিতর্ক চললেও পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর উপর কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১৯, "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখে সংস্কারাবলী বা মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট গ্রহণ করতে সুপারিশ জানালেন। তিনি নিশ্চিত এর দ্বারা ভারতের প্রতি ব্রিটিশ জনগণের সুবিচারের সদিচ্ছার প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই প্রবন্ধ লেখার পাঁচ মাসের মধ্যে দেখা গেল গান্ধিজী ব্রিটিশ সুবিচারের উপর আস্থা হারিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। পাঞ্জাবের অত্যাচারকে আন্দোলনের অন্যতম প্রশ্ন করেছেন। হাণ্টার কমিশনের সংখ্যাধিক্য রিপোর্ট—যা এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল—তা নিশ্চয় গান্ধিজী বা কংগ্রেসের কাছে কোনো বিস্ময়ের সংবাদ বহে আনেনি। একমাত্র সরল ব্যক্তি ছাড়া কে আশা করতে পারে যে অনিচ্ছুক সরকার নিযুক্ত তদন্ত কমিটি পাঞ্জাবে তাদেরই সংগঠিত অত্যাচারের আত্ম-স্বীকৃতি দেবে?

তবে হঠাৎ খিলাফতের সাথে পাঞ্জাবের অত্যাচারকে তিনি শেষ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করলেন কেন?

অ্যানি বেশান্ত এর একটি উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মতে গান্ধিজী উপলব্ধি করেছিলেন কেবলমাত্র খিলাফতকে কেন্দ্র করে এক বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাঁর কথায় গান্ধিজী দেখলেন "খিলাফত 'হিন্দু'-দের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হচ্ছে না। তখন বেনারসে ৩০শে ও ৩১শে 'মে' অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি পাঞ্জাবের অত্যাচার এবং সংস্কারবিধির দোষ-ত্রুটিকে আন্দোলনের

কারণগুলির তালিকায় যুক্ত করল।" (উদ্ধৃতির জন্য, মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৮২৭)।

প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিতে সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে উঠেছিল। যে ঐক্যের শুরু হয়েছিল গান্ধিজীর পূর্বে লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬)-এর আমলে। সেই ঐক্য ক্রমশঃ নিম্নস্তরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। জানা যাচ্ছে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরে একে অপরের হাতে প্রকাশ্যে জলপান করছে। ১৯১৯ সালের সরকারি রিপোর্টে বলা হচ্ছে—"হিন্দু-মুসলমানের অভূতপূর্ব সৌভ্রাতৃত্ব…সৌভ্রাতৃত্বের অসাধারণ সব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।" (রিপোর্টের উদ্ধৃতি; ইণ্ডিয়া টুডে; পৃ. ৪০৬) সমসাময়িক সাংবাদিক দুর্গাদাসের অভিজ্ঞতাও একই। জেলান্তরেও এই ঐক্য ছড়িয়ে পড়েছিল। (ইণ্ডিয়া ফ্রম কার্জন টু নেহেরু এণ্ড আফটার; দুর্গাদাস; পৃ. ৮১; লণ্ডন, ১৯৬৯) সেই সাথে আরো একটি বিষয় জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা'হল জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি। এ ছাড়া লুই ফিশারের মতে তরুণ ও যুবশ্রেণী ক্রমশঃ অধীর হয়ে পড়ছিল আন্দোলনের জন্য। (গান্ধী; পৃ. ২৪১) বোঝাই যায়, মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারাবলী তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

এমন পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বুর্জোয়া নেতাদের সামনে দু'টি পথ উন্মুক্ত ছিল। এক জনগণের মৌল আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন, যা' হবে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পূর্ণ স্বাধীনতার লড়াইয়েরই নামান্তর। নতুবা কেবল নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য আশু কোনো রাজনৈতিক ও ধর্মভিত্তিক সমস্যাকে টেনে এনে তার মধ্য দিয়ে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আক্রোশকে নিঃশেষিত করার সুযোগ দেওয়া এবং সেই সাথে কিছু শাসনতান্ত্রিক সুবিধাও নিজেদের শ্রেণীর জন্য আদায় করা। বলা বাহুল্য গান্ধিজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও খিলাফতপন্থীরা এই শেষোক্ত বা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছিলেন।

সে যাইহোক, তৎকালীন দেশের অর্থনৈতিক বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াদের ঐক্য নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন কৃষিনির্ভর ভারতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ কৃষকদের গলায় ক্রমশঃ ফাঁস হয়ে চেপে বসেছিল আর সদ্য প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানার সংঘবদ্ধহীন শ্রমিকদের অবস্থাও খুবই দুঃসহজনক হয়ে উঠেছিল, যা' নেহেরুর ভাষায় "যাদের কথা কেউ ভাবত না, না রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ, না সরকার বাহাদুর।" উল্লেখ্য, দু' বছরব্যাপী

এই আন্দোলনে গান্ধিজী থেকে আলী ভ্রাতৃদ্বয় পর্যন্ত কারুর কণ্ঠে কৃষক বা শ্রমিকের সমস্যা প্রধানরূপে দেখা দেয়নি। আন্দোলনের কেবল সর্বশেষ পর্যায়ে কর-বন্ধের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। তা'ও শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় না হয়ে "বারদোলী"-র প্রতীকে পরিণত হল।

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই ইংরেজ বিরোধিতার সাথে সাথে গান্ধিজীর যেন অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়াল যেখানে যেখানে সরকার বা ভূস্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছে, হিংসার আশ্রয় নিয়েছে তাকে প্রকাশ্য জনসভায় নিন্দা করা। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর বক্তৃতায়। এ সময়ে সারা ভারতের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে সামন্ত ও সরকার-বিরোধী কৃষক আন্দোলন সর্বাধিক সংঘটিত হয়েছিল। শহীদ আমিন লিখছেন, ফয়জাবাদ এবং গোরখপুরে কৃষকদের বিশাল জমায়েতগুলির সামনে গান্ধিজী যে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন তার মূল বক্তব্যটাই ছিল দক্ষিণ অযোধ্যায় কৃষকদের হিংসাত্মক বিক্ষোভগুলিকে নিন্দা করা। গান্ধিজীর ভ্রমণকারী সংগী এবং সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই তাঁর ডায়েরী বা দিনলিপিতে এ সম্পর্কে লিখেছেন, "তাদের প্রতি (কৃষকদের) গান্ধিজীর উপদেশ একটাই ছিল—তা' হল কাউকে যেন আঘাত বা হত্যা করার জন্য লাঠি ব্যবহার না করা হয়। একই কথা ফয়জাবাদেও বলা হয়েছিল। গান্ধিজীর বক্তব্যের সমস্তটাই কেবল জুড়ে ছিল উত্তরপ্রদেশে যে সমস্ত ডাকাতি, শয়তানি এবং মারপিট হয়েছে সে সম্পর্কে।" (উদ্ধৃতি ও মন্তব্যের জন্য, শহীদ আমিনের প্রবন্ধ; সাবঅলটার্ণ স্টাডিজ; ৩য় খণ্ড; পৃ. ২১; সংস্করণ, ১৯৮৪)

মহাদেব দেশাইয়ের অভিমত আরো সুস্পষ্ট হবে যদি এ সময়ে গোরখপুরের বিশাল জনসভায় গান্ধিজীর প্রদত্ত বক্তৃতার একটি বিবরণ আমরা পাঠ করি। প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি এই জনসভার অধিকাংশ স্থান জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল অগণিত কৃষক এবং সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ। গান্ধিজীর ভাষণটি ছাপা হয়েছিল স্থানীয় হিন্দী সংবাদপত্র "স্বদেশ"-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ সালের সংখ্যায়। পত্রিকাটির সম্পাদক দশরথ দ্বিবেদী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেসসেবী। শহিদ আমিন এটি হিন্দী থেকে তাঁর প্রবন্ধে ইংরাজী তর্জমা করে উদাহরণ দিয়েছেন।

গান্ধিজী তাঁর বক্তৃতার শুরুতে প্রথামাফিক হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেয়ার পরেই সোজা চলে গেলেন অযোধ্যায় সহিংস

কৃষক আন্দোলনের প্রসংগ তুলে তাকে তীব্রভাবে নিন্দা করতে। "কী ঘটেছে ফয়জাবাদে? কী ঘটেছে রায়বেরিলীতে? আমাদের এগুলো জানা দরকার। আমরা নিজেরা হাত দিয়ে যা' করেছি তা' ভুল, দারুণ ভুল। লাঠি উঁচিয়ে আমরা খারাপ কাজ করেছি। হাট, দোকান লুঠ করে ভুল করেছি। লাঠি ব্যবহার করে আমরা স্বরাজ পাব না। শয়তান সরকারের মোকাবোলা শয়তানি (হিন্দীতে "শয়তানিয়াত") দিয়ে করে আমরা স্বরাজ পেতে পারি না। আমাদের তিরিশ কোটি লাঠি ওদের (ইংরাজদের) উড়োজাহাজ এবং বন্দুকের কাছে কিছু নয়—তথাপি যদি কিছু হয়ও তাহলেও আমরা আমাদের লাঠি উঁচাবে না।" (উদ্ধৃতির জন্য, সাবঅলটার্ণ স্টাডিজ; ৩য় খণ্ড; শহিদ আমিনের প্রবন্ধ; পৃ. ২১-২২)

শহীদ আমিন গান্ধিজীর উপরোক্ত বক্তৃতাকে বিশ্লেষণ করে ছ'টি পয়েন্ট বা মূল বিষয় খুঁজে পেয়েছেন। যথা, হিন্দু-মুস্লিম ঐক্য; হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকা; জুয়া, মদ, গাঁজা প্রভৃতি বর্জন, ওকালতি ত্যাগ; সরকারি বিদ্যালয় বয়কট এবং খেতাব পরিত্যাগ; চরখায় সুতা কাটা স্বরাজ অচিরে আসবে যদি মানুষ তার আত্মশুদ্ধি, আত্মত্যাগ এবং আত্মশক্তি বৃদ্ধির শর্তগুলি পালন করে। (ঐ; পৃ. ২২-২৩)

কিন্তু সাবঅলটার্ণ স্টাডিজের (Subaltern Studies) লেখকদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতা দেখা যায় শহিদ আমিনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতয় নেই। তাঁরা নিচু তলার ইতিহাস লেখেন শহরে বাস করা পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর মানসিকতা নিয়ে। সুতরাং গান্ধিজী যে সারা বক্তৃতায় জমিদারী শোষণ বা সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার সম্পর্কে একটি শব্দও ব্যয় করেননি তা' শহিদ আমিনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এবং তাঁর বিশ্লেষিত প্রধান ছ'টি পয়েন্টের মধ্যে স্বভাবতঃই স্থানও পায়নি।

যাই হোক, আন্দোলনের কেবল সর্বশেষ পর্যায়ে গান্ধিজী বাধ্য হয়েছিলেন কর বন্ধের প্রস্তাব রাখতে। তা'ও শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় না হয়ে "বারদোলী"র এক প্রতীক লড়াইতে পরিণত হয়েছিল।

এই প্রসংগে অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাবের প্রথমের দিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রকৃত ভূমিকাটি কী ছিল তা' পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ জাতীয় বুর্জোয়াদের তিনিও ছিলেন একজন অন্যতম প্রতিনিধি ও গান্ধিজীর আস্থাভাজন সহায়ক। অথচ কলকাতা কংগ্রেসে (৪-৯ই সেপ্টেম্বর) তিনি গান্ধিজী উত্থাপিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবকে বিরোধিতা জানালেন এবং মাত্র তিন মাসের

মধ্যে নাগপুর কংগ্রেসে (ডিসেম্বর) সেই প্রস্তাবকে শুধু স্বাগত জানালেন না, প্রকৃতপক্ষে উত্থাপনও করলেন। ঐতিহাসিকের ভাষায় নাগপুর কংগ্রেসে সি. আর. দাশ "যাঁকে উপহাস করতে এসেছিলেন, তাঁকেই শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা জানালেন" ("Who came to scoff, remained to pray")—অর্থাৎ গান্ধিজীকে। রিচার্ড গর্ডন এবং জুডিথ ব্রাউনের মতে কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধিজী উত্থাপিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীকে চিত্তরঞ্জন বিরোধিতা করেছিলেন, কেননা এর মধ্যে কাউনসিল নির্বাচন (যা' মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারাবলী অনুযায়ী অতি শীঘ্র অনুষ্ঠিত হতে চলেছে) বয়কটের কথা বলা হয়েছিল। অথচ বাংলাদেশে তখন নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল ছিল। এ ছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে জুডিথ ব্রাউনের ধারণা বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জনের কংগ্রেসে তাঁর প্রতিপক্ষদের দাবিয়ে রেখে নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখা প্রধান জরুরী কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং সেই রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদেই তিনি আবার নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধিজীর সাথে মিত্রতা করলেন।

উপরোক্ত মতামতগুলি পড়লে মনে হবে যেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে কাউনসিলে নিজের দলের কিছু আসন বাড়ানো এবং পরবর্তী সময়ে নিজের তথাকথিত সংকটজনক রাজনৈতিক অস্তিত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই প্রথমে যেমন গান্ধিজীর প্রস্তাবকে বিরোধিতা করেছেন তেমনি পরে সেই বিরোধিতাকে তুলেও নিয়েছিলেন। সমস্ত বিষয় থেকে দেশবন্ধুর এক নিছক সুবিধাবাদী সংকীর্ণ ছবি আমাদের সামনে ভেসে উঠে। গান্ধিজীকে নাগপুরে সমর্থনের কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে সুমিত সরকার বলেছেন সি. আর. দাশের ক্ষেত্রে এটি ছিল, "নাটকীয় দিক পরিবর্তন" ("drammatic switch-over of C. R. Das")।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল সি. আর. দাসের কাছে কাউনসিল নির্বাচনটা কখনোই প্রধান লক্ষ্য ছিল না। কারণ তা' যদি হত তাহলে যে মণ্টেগু সংস্কারাবলীতে (Reforms) ওই নির্বাচনের কথা বলা হয়েছিল সেই সংস্কারাবলীকে তিনি পুরোপুরি বর্জনের কথা ১৯১৯ সালের অমৃতসর কংগ্রেসে বলতেন না। (মজুমদার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১) সি. আর. দাশের বিরোধিতার কথা সুভাষচন্দ্রও তাঁর "ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল" বইতে উল্লেখ করেছেন। কেবল লোকমান্য তিলকের কথায় শেষ পর্যন্ত "প্রতিদানমূলক সহযোগিতা"য় রাজী হয়েছিলেন। বরং গান্ধিজীর ভূমিকা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি সংস্কারাবলীকে সম্পূর্ণ

গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কংগ্রেসে এই গ্রহণ-বর্জনের বিবাদ পরস্পরের মধ্যে এক সময়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে মনে হচ্ছিল বুঝি বা অমৃতসরে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়বে। তিলকের চেষ্টায় একটা আপোষমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। যদিও সি. আর. দাশ সহযোগিতায় রাজী হয়েছিলেন কিন্তু তিনি উপস্থিত কংগ্রেস সদস্যদের কাছে তাঁর প্রকৃত মনোভাবটি কখনোই গোপন করেন নি—সেটি হল সংস্কারাবলীগুলি ছিল "হতাশ ব্যঞ্জক"। (মজুমদার, ৩য় খণ্ড ; পৃ. ৫২) প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সমালোচক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যিনি অমৃতসর কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন তিনি লিখেছেন, "রিফর্মস আইনের অকিঞ্চিৎকর সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে মহাত্মা ছিলেন সহযোগিতার স্বপক্ষে আর দেশবন্ধু ছিলেন সম্পূর্ণ প্রতিরোধমূলক (total obstruction) নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী।" (দেশবন্ধু-স্মৃতি ; পৃ. ২৩৩ ; কলকাতা, ১৩৩৩)

সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আক্ষরিকভাবে গান্ধিজী আনীত অসহযোগ সংক্রান্ত প্রস্তাবকে দেশবন্ধু বিরোধিতা করলেও তার মর্মবস্তুর বিরোধিতা তিনি কখনও করেননি। ৮ই সেপ্টেম্বর তাঁর নেতৃত্বে প্রকাশ্য অধিবেশনে শীতকালীন অধিবেশন পর্যন্ত কংগ্রেসকে মুলতুবী রাখার জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়। তাতে বলা হয়েছিল মধ্যবর্তী সময়ে দেশবাসী আন্দোলন-সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা করার আরো সুযোগ পাবে। এতে কোথাও অসহযোগ আন্দোলন নাকচ বা বর্জন করার কথা বলা হয়নি। সংশোধনটি অবশ্য ভোটে বাতিল হয়ে গেছল। ৭ই সেপ্টেম্বর "সাবজেকট কমিটি"র বৈঠকে দেশবন্ধুর তৎকালীন সহযোগী বিপিনচন্দ্র পাল যে সংশোধনী প্রস্তাবটি আনেন তাতে নীতিগতভাবে অসহযোগকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। (জুডিথ ব্রাউন, পৃ. ২৬৫) দেশবন্ধুর নিজের ভাষায় "আমাদের সংশোধন প্রস্তাব ছিল যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবার ডিপুটেশন প্রেরিত হউক এবং যদি তাহা ফলদায়ক না হয় তবে অসহযোগ গ্রহণ করবো। আর ইতিমধ্যে মহাত্মার অসহযোগের কোনো কোনো বিষয়ে চেষ্টা করা যেত পারে। কলেজ বয়কট ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনটাই আমার কাছে প্রথম প্রথম বেশ ভাল মনে হয়েছিল। যাহোক আমাদের প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি।" (দেশবন্ধু-স্মৃতি ; পৃঃ ২৩৫) সুতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন দেশবন্ধুর সব সময়েই মনঃপূত ছিল—কেবল সময়ের উপযুক্ততা সম্পর্কেই তাঁর প্রশ্ন ছিল। তা' ছাড়া অসহযোগ কর্মসূচীর কাউনসিল নির্বাচন বয়কট প্রোগ্রামটি ছাড়া আর সমস্ত কর্মসূচীর প্রতি ছিল তাঁর সমর্থন। এক্ষেত্রে দেশবন্ধুকে গান্ধিজীর চেয়ে বরং অনেক বেশি সংগতিপূর্ণ বলে মনে হয়।

দেশবন্ধুই প্রথম সংস্কারাবলীকে (Reforms) বর্জন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু গান্ধিজীর অনুরোধে অমৃতসরে যখন তাকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করতে রাজী হলেন তখন এটাই স্বাভাবিক তিনি এটির সাফল্য অথবা ব্যর্থতা দেখার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করবেন। অন্ততঃপক্ষে নবেম্বর মাসে কাউনসিল নির্বাচন পর্যন্ত। মনে রাখা দরকার "ইয়ং ইণ্ডিয়া"র (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১৯) প্রবন্ধে গান্ধিজী এই সংস্কারাবলীর সাফল্যজনক প্রয়োগ কামনা করেছিলেন। (to settle down quietly to work so as to make them a success") তবে কাউনসিলে যাওয়াটাই যে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে প্রধান লক্ষ্য বা কামনা ছিল না তার সবচে বড় প্রমাণ তিনি স্বয়ং নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াননি অথবা অন্যান্য প্রধান সারির বাংলার নেতাদের যেমন, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, জীতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী প্রভৃতিদেরও দাঁড়াবার পক্ষে মত দেননি। (দেশবন্ধু-স্মৃতি ; পৃ. ২৩৭) কলকাতা কংগ্রেসে সি. আর. দাশের বিরোধিতায় গান্ধিজীকে অনেক বেশি সক্রিয় ইংরেজ-বিরোধী বলে মনে হলেও জেনে রাখা ভাল অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবে "স্বরাজের" অন্তর্ভুক্তিতে চিত্তরঞ্জনেরও একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। গান্ধিজী যদিও তাঁর আত্মজীবনীতে এবিষয়ে বিজয় রাঘবাচারিয়ার এবং মোতিলালের উল্লেখ করেছেন কিন্তু জুডিথ ব্রাউন থেকে জানা যায় যে স্বরাজের দাবীটি মূল প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সি. আর. দাশ মোতিলাল নেহেরুকে সমর্থন করেছিলেন। গান্ধিজী প্রস্তাবিত অসহযোগের মধ্যে প্রথমে এ দাবীটি ছিল না—যা' আমরা পূর্বে অন্য প্রসংগে উল্লেখ করেছি। (জুডিথ ব্রাউন, পৃ. ২৬৪) অসহযোগ সংক্রান্ত গান্ধিজীর প্রস্তাব সম্পর্কে দেশবন্ধুর দৃষ্টিভংগীর উল্লেখ করে জওহরলালের মনে হয়েছে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। তাঁর ভাষায় "মিঃ সি. আর. দাশ প্রস্তাবের পেছনে যে সারমর্ম ছিল তাকে অগ্রাহ্য করার জন্য বিরোধিতায় নেতৃত্ব দেননি, কারণ তিনি এর সংগে অথবা আরো বেশি এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান অসম্মতি ছিল নতুন আইনসভা বয়কট সম্পর্কে।" (অ্যান অটোবায়োগ্রাফি ; পৃ. ৬৪ ; সংস্করণ, ১৯৫৫) সর্বোপরি চিত্তরঞ্জন ভোটের ক্ষেত্রে অসহযোগের প্রস্তাবকে বিরোধিতা করলেও কার্যক্ষেত্রে একমাত্র কাউনসিল বয়কটের কর্মসূচী ব্যতীত আর সমস্ত কর্মসূচীকে সফল করার জন্য সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে নেমে ছিলেন। নেহেরু লিখছেন, কলকাতা অধিবেশনে মিঃ সি. আর. দাশ এবং অন্যান্যরা আইনসভা বয়কটের বিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও "তাঁরা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।" ("they stood by

the congress decision") সুতরাং নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধিজীকে সমর্থনের পেছনে দেশবন্ধুর ক্ষেত্রে সত্যই কোনো "নাটকীয় দিক পরিবর্তন ছিল না" এবং এটাও ঠিক নয় "উপহাস করতে এসে শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা" করে বসলেন। প্রকৃতপক্ষে নাগপুর কংগ্রেসে (ডিসেম্বর) সুভাষচন্দ্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দেশবন্ধু এবং গান্ধিজীর মধ্যে "বোঝাপড়া" হয়েছিল। আইনসভা বয়কটের প্রশ্ন নিয়ে যে মতভেদ উভয়ের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, তার আর অস্তিত্ব ছিল না—কেন না ইতিমধ্যে নবেম্বরে নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেছল। (দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, পৃ. ৪৪) ২৯শে ডিসেম্বর সারাদিন ও পরের দিন বেলা ১টা পর্যন্ত অসহযোগের কর্মসূচী নিয়ে গান্ধিজীর সাথে দাশের আলোচনা চলে এবং শেষ পর্যন্ত একটি আপোষ রক্ষা হয়, যাকে বলা হয় "দাশ-গান্ধী প্যাক্ট"। আর যার ফলশ্রুতি স্বরূপ অযহযোগের মূল প্রস্তাব দেশবন্ধু উত্থপান করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে গান্ধিজী দেশবন্ধুকে জিতে নিলেন এ কথা যেমন অর্থহীন তেমনি বাংলায় নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য দেশবন্ধুর আত্মসমর্পণ—এ মন্তব্যও ইতিহাস-সম্মত নয়। কলকাতা ও নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব পাঠ করলে দেখা যাবে দেশবন্ধু অসহযোগ সম্বন্ধীয় অন্যান্য ব্যাপারে মহাত্মার সম্পূর্ণ মতাবলম্বী হলেও কাউনসিলে প্রবেশ করে বাধা দেয়ার নীতি থেকে তিনি বিন্দুমাত্র সরে আসেন নি। মনে রাখা দরকার কাউনসিল বর্জনের প্রস্তাব নাগপুরে ছিল না। তা' ছাড়া নাগপুরের প্রস্তাবগুলি কলকাতার প্রস্তাবগুলির চেয়ে অনেক বেশি আন্দোলনের দিক থেকে অগ্রগামী ছিল। যেমন, নাগপুরেই সরাসরি বলা হল বর্তমান সরকার সারাদেশের আস্থা হারিয়েছে এবং জনগণ স্বরাজলাভে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অথচ কলকাতায় শুধু বলা হয়েছিল ভবিষ্যতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। আবার কলকাতার প্রস্তাবে যৎ সামান্য ক্ষতি বা ত্যাগের (minimum risk and to call for the least sacrifice) উল্লেখ ছিল কিন্তু নাগপুরে বলা হল অসহযোগ থেকে শুরু করে রাজস্ব প্রদানে অসম্মতি পর্যন্ত সমস্ত পন্থাই দেশবাসীর পক্ষে গ্রহণীয়। কলকাতার প্রস্তাবে ছাত্রদের ধীরে ধীরে বিদ্যালয় পরিত্যাগের কথা বলা হয়েছিল কিন্তু নাগপুরে তা' পরিবর্তন করে সোজাসুজি আহ্বান জানানো হল, যেন ১৬ বৎসর বা ততোধিক বয়স্ক ছাত্ররা পরিণাম চিন্তা না করেই সরকার সংশ্লিষ্ট বিদ্যায়তন ত্যাগ করে ("irrespective of conseqnences") হয় ন্যাশানাল সার্বিসে (জাতীয় সেবাব্রতে) জীবন যাপন করে অথবা জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠ করে।

চিত্তরঞ্জন সঠিকভাবেই নাগপুর প্রস্তাবকে কলকাতার প্রস্তাব অপেক্ষা

"অধিকতার ফলপ্রসু, দ্বিধাশূন্য ও তেজোগর্ভ" (more straight, bold and effective) বলে তাঁর অনুগামীদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন। যদিও তেণ্ডুলকার নাগপুর প্রস্তাবে দাশ কিছু সংশোধনী এনেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন (যা' গান্ধিজী গ্রহণও করেছিলেন) কিন্তু দেশবন্ধুর একান্ত অনুগামী হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে তিনিই (সি. আর. দাশ) নাগপুর প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। (দুইটি প্রস্তাবের তুলনামূলক ব্যাখ্যা ও দেশবন্ধুর মতামতের জন্য, দ্রষ্টব্য, দেশবন্ধু-স্মৃতি ; পৃ. ২৪০-২৪২)

নাগপুরে দাশ-গান্ধী বিতর্ককে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের গবর্নর রোনাল্ডসে (Ronaldshay) ভাইসরয় চেমসফোর্ডকে তাঁর এক গোপন মতামত জানান। তাতে তিনি লেখেন, গান্ধী দাশকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে তিনি লড়াইতে বস্তুতঃ জিতে গেছেন এবং এখন সময় থাকতে তিনি (দাশ) যেন তাঁরই (গান্ধী) সংগে ভাগ্য মেলান। জুডিথ ব্রাউন উপরোক্ত মতামতকে স্বীকার করে নিয়ে লিখেছেন, গান্ধী, দাশ, পাল, লাজপত রায় এবং কস্তুরীরংগ আয়েংগারকে স্বপক্ষে টানার জন্য নীতির ক্ষেত্রে কোনো সুবিধা বা অসহযোগ প্রয়োগের (in the practice of non-cooperation) ক্ষেত্রে বড় রকমের কোনো সংশোধন করেননি।" মন্তব্যটি সম্পুর্ণ অবান্তর এবং অযাচিত। কারণ এধরনের কোনো দাবী অন্ততঃ সি. আর. দাশ করেননি। (জুডিথ ব্রাউন ; পৃ. ২৯৬-২৯৭) আর রোনাল্ডসের কথা অনুযায়ী যদি কোনো লড়াই হয়েও থাকে তবে সে লড়াইতে গান্ধিজীর এক তরফা জিতে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ নাগপুর প্রস্তাবের মূল খসড়া রচনায় দেশবন্ধুর সক্রিয় ভূমিকা একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। জুডিথ ব্রাউনের মতে কলকাতার বিরোধীরা নাগপুরে এসে মত পরিবর্তন করলেন এই কারণে যে "ভীরুদের আশ্বস্ত করার জন্য অসহযোগ পরিকল্পনায় যথেষ্ট রক্ষা কবচ রাখা হয়েছিল।" (ঐ, পৃ. ২৯৬) আমরা ইতিপূর্বেই কলকাতা ও 'নাগপুর প্রস্তাবের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখেছি যে শেষোক্ত প্রস্তাবেই অধিকতর ইংরেজ-বিরোধী বাস্তব কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছিল এবং সর্বোপরি লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল যে ইংরেজরা জনগণের পুরোপুরি আস্থা হারিয়েছে। সুতরাং এটা আশ্চর্যের ব্যাপার ব্রাউন কথিত "ভীরুরা" কলকাতার প্রস্তাবের পরিবর্তে নাগপুর প্রস্তাবে আশ্বস্ত হল কি ভাবে ? আর নাগপুর প্রস্তাবের কোন কর্মসূচীই বা কলকাতার চেয়ে আরো নরম হয়ে ভীরুদের ভয়কে ঠাণ্ডা করল (to soothe the fears of timid") ? এটি আর কিছুই নয় গান্ধিজীর তুলনায় দেশবন্ধুকে অযথা খাটো করে দেখার প্রচেষ্টা মাত্র।

অসহযোগ আন্দোলনে নামার ক্ষেত্রে দেশবন্ধু চেয়েছিলেন আরও একটু সময়। প্রচারের মাধ্যমে দেশবাসীকে আরো ভালভাবে শিক্ষিত করে তুলতে। গান্ধিজী তাতে রাজী হননি। তাঁর মনে হয়েছিল আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটিই প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনার পর তিনিই জানালেন দেশবাসী এখনও অহিংস আন্দোলনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়নি।

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঘটেছিল পাঞ্জাব, খিলাফত স্বরাজের ত্রিবেণীসংগম। যাতে অবগাহন করেছিলেন জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সমগ্র জনগণ। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর তার গভীরতা পরিমাপের জন্য জাতীয় কংগ্রেস এক অনুসন্ধান কমিটি বসায়। সদস্যরা সমালোচকদের দৃষ্টিতেও ছিলেন যথেষ্ট নিরপেক্ষ। কমিটির মতে আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য জনগণের নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা। (মজুমদার ; ৩য় খণ্ড ; পৃ. ১৮৯) ইংরেজের সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯২১ সালের দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ গোলমাল—মায় শিল্প ও রেল ধর্মঘট সবই ঘটেছে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে। আর এর জন্য দায়ী গান্ধিজী, আলীভ্রাতৃদ্বয় এবং তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাগুলি। স্বেচ্ছাসেবকরা, ইংরেজ রিপোর্ট অনুযায়ী, সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার জন্য উত্তেজিত করত। (রিপোর্টের জন্য, মজুমদার ; ৩য় খণ্ড ; পৃ. ১৮৩) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে (১৯২২) কম্যুনিষ্ট ইনটারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেস যে বাণী পাঠিয়েছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল, "গত দু' বৎসর ছিল ভারতবর্ষে শক্তিশালী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময়কাল। কৃষক ও সর্বহারার জাগরণ ব্রিটিশের অন্তরে কাঁপুনি ধরিয়ে ছিল।" (উদ্ধৃতির জন্য ; আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ; মুজফ্ ফর আহমদ ; পৃ. ৩৫৩)

বাংলাদেশ ও আসামের চা বাগানে, বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলে, যুক্তপ্রদেশের কৃষিক্ষেত্রে, অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের রেলে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের শিল্পাঞ্চলে যে শ্রমিক, কৃষকের বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তা' স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে আন্দোলন ক্রমশঃ তার সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতঃই সমাজেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল! হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্ব এক নতুন দৃশ্যের অবতারণা করল। প্রকাশ্যে একে অপরের হাতে শুধু জলপান করল তাই নয়, পুরানো সংস্কারপন্থী হিন্দুরা মুসলমান বন্ধুদের গৃহেতে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করতে লাগলেন। পর্দানশীন মুসলমান মহিলারা জনসভাগুলিতে দলে দলে যোগ দিলেন। কেউ কেউ আবার তাঁদের স্বয়োম্বা

মজলিসে গান্ধিজীকে বক্তব্য রাখার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। যেখানে মনে রাখা দরকার মুসলমান পুরুষদেরও প্রবেশ করতে হলে চোখে ঠুলি বাঁধতে হত। গান্ধিজীর ক্ষেত্রে সেখানে ছিল অবারিত দ্বার। ভাবপ্রবণতার চূড়ান্ত বিকাশ দেখা গেল যখন সংখ্যাগুরুর নিষিদ্ধ খাদ্য পর্যন্ত স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেন মুসলমানেরা এমন কি ধর্মীয় উৎসবেও। (মহাত্মা, ২য় খণ্ড ; পৃঃ ৩৪)

মানসিক জগতেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। ভয়, নির্যাতন, হতাশা মন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। দূর প্রত্যন্ত গ্রামেও লোক নির্ভীকভাবে আলোচনা করতে লাগল কংগ্রেস, স্বরাজ, পাঞ্জাব ও খিলাফতকে নিয়ে, বস্তুতঃ সাধারণ মানুষের কাছে খিলাফত আর খিলাফত ছিল না। ছিল "খিলাফ", উর্দুতে যার অর্থ "বিরুদ্ধে"। লোকে খিলাফতকে খিলাফ মনে করে সরকার বিরোধিতায় সক্রিয়ভাবে নেমে পড়েছিল। (মহাত্মা ; ২য় খণ্ড ; পৃ. ৩৪) ফলে সম্ভাবনা দেখা দিল গণতান্ত্রিক ঐক্যের এক মজবুত ভিত্তির। যা' সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এক দুঃশ্চিন্তার কারণ হত। নেহেরুর মতে খিলাফত সংক্রান্ত গণ-আন্দোলন সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বকে অনেক দুর্বল করে দিয়েছিল। (ভারত সন্ধানে, পৃ, ৩৯২) রুশ ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন, খিলাফত আন্দোলন ও আইন অমান্য প্রচার পাশাপাশি চলার ফলে দু'টি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে সুবিধা হয়েছিল, যৌথভাবে মুক্তিসংগ্রাম গড়ে তোলার অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করতে। (অ্যানটোনোভা. লোভিন, কোটোভস্কি ; ২য় খণ্ড ; পৃঃ ১৬৫)

কিন্তু দু'বছরেরও কিছু কম সময় লড়াই চলার পর, লক্ষ্য থেকে তখনো বহুদূরে—গান্ধিজী চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার জন্য ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করে দিলেন। কারণ হিসেবে জানালেন, "সমস্ত হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকরা এখনো পর্যন্ত নিজেদের অস্পৃশ্যতার পাপ থেকে মুক্ত করতে পারেনি। সবাই হিংসার ছোঁয়া থেকে মুক্ত নয়। তাদের কারাবাসের দ্বারা আমরা "স্বরাজ জয় অথবা খিলাফতের পবিত্র স্বার্থ রক্ষা করতে পারব না।" (মহাত্মা ; ২য় খণ্ড ; পৃ, ৮৫) জওহরলাল নেহেরু যিনি আন্দোলনের একজন প্রথম সারির তরুণ সৈনিক হিসেবে এসময়ে জেলে বন্দী ছিলেন, তিনি লিখছেন, "যখন আমাদের মনে হচ্ছিল যে আমাদের অবস্থা দৃঢ় হচ্ছে এবং আমরা সব ফ্রন্টেই এগুচ্ছি ঠিক সেই সময়ে আমাদের সংগ্রাম বন্ধ করে দেওয়া শুনে খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম।" আর ওই একই লেখায় হিংসা সম্পর্কে গান্ধিজীর বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে প্রশ্ন রাখলেন, তাহলে কি ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে তত্ত্ব ও কাজের দিক দিয়ে পুরো অহিংসায় ট্রেনিং না দেওয়া পর্যন্ত কোনো আন্দোলন

করা যাবে না? (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী; জওহরলাল নেহেরু; পৃ, ৮১ এবং ৮২; লণ্ডন, ১৯৫৫) আন্দোলন যে সাফল্যের সাথে এসেছিল এ ব্যাপারে শুধু নেহেরু নন, প্রবীণ নেতা মোতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি সবাই একমত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন, দেশবন্ধু ক্রুদ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "সারাজীবনের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল।" সুভাষচন্দ্রের মতে রাজনৈতিক বন্দী ও কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের মনে হয়েছিল মহাত্মা এক প্রচণ্ড ভুল করেছিলেন আন্দোলন প্রত্যাহৃত করে নিয়ে। "কেবলমাত্র তাঁর উপর যাঁদের অন্ধ আস্থা ছিল, সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ কোনো রকম রায় দিতে অসম্মত ছিল।" (দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল; পৃ ৬৮) এত বড় আন্দোলনে যে কোথাও ছোটখাটো হিংসার ঘটনা ঘটবে না এমন অসম্ভব চিন্তা গান্ধিজী ব্যতীত আর কেউ করেননি। গান্ধিজীর বিচারের সময়ে মিঃ ব্রুমফিল্ড তাঁর রায়ের মধ্যে হিংসার প্রশ্নটি তুলে গান্ধিজীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, "আপনার রাজনৈতিক শিক্ষার প্রকৃতি এবং যাদের লক্ষ্য করে প্রচারে নেমেছেন তাদের প্রকৃতির কথা মনে রাখলে আমি বুঝতে পারিনা আপনি কি করে এ বিশ্বাস অব্যাহত রেখেছেন যে ফলাফল হিংসা ও অশান্তিজনক হবে না?" (মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃ, ১০১) যা ব্রুমফিল্ড এবং নেহেরু বুঝতে পারেন তা' গান্ধিজীর মত বাস্তব বুদ্ধি রাজনীতিকের চিন্তার এবং কল্পনার বাইরে ছিল একথা মনে হয় না। অথচ গান্ধিজীর বক্তব্য থেকে মনে হয় হঠাৎ যেন তিনি "হিংসার ছোঁয়া"কে আবিষ্কার করে শিউরে উঠেছেন। সত্যই কী তাই? গান্ধিজীর নিজের বক্তব্য আন্দোলন শুরু করার সময়ে কিন্তু অন্য কথা বলে। ২২শে জুন, ১৯২০, ভাইসরয়কে লেখা পত্রে অসহযোগ আন্দোলনের কারণ ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের যে অংশ হিংসার পথে চলতে আগ্রহী তাঁদের গান্ধিজী কিভাবে বুঝিয়ে অহিংস আন্দোলনের পথে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন সে কথা লেখেন। তবে সেই সাথে তিনি একথাও লেখেন, "একই সাথে আমি স্বীকার করি যে, যেখানে এক বিরাট জনতা আন্দোলনে নেমেছে সেখানে একটা ভয়ংকর ঝুঁকি থেকে গেছে। কিন্তু যে সংকট ভারতে মুসলমানদের ঘিরে ফেলেছে সেখানে ঝুঁকি ছাড়া কোনো পদক্ষেপ কাম্য পরিবর্তন আনতে পারে না। কিন্তু ঝুঁকি না নেওয়ার অর্থ হবে আরো বড় ঝুঁকি নেওয়া—সেটি হয়ত সম্পূর্ণ আইন-শৃঙ্খলাকেও ধ্বংস করতে পারে।" ("ঐ; ১ম খণ্ড; পৃ. ২৯৭) সুতরাং দেখা যাচ্ছে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে গান্ধিজী একেবারে অজ্ঞাত ঘটনা তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল না। কেননা তাঁরই কথায় এ ধরনের ঝুঁকি

না নেওয়ার অর্থ হবে আরো বড় ঝুঁকি নেওয়া। অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সাথে সাথে দেশবাসীর সামনে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য গান্ধিজী নতুন রায়ের দিশা জানাতে ভুললেন না। এর জন্য একটি লোককেও আইন অমান্য করতে হবে না। তাঁর বক্তব্য—"আত্মিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে সত্যবাদী ও অহিংস হয়ে এবং স্বদেশী অর্থাৎ খদ্দরের কর্মসূচী সম্পন্ন করে আমরা পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং খিলাফতের প্রতিবিধান ও পাঞ্জাবের অন্যায় দূর করতে পারি।" (মহাত্মা ; ২য় খণ্ড ; পৃ. ৮৭)

খদ্দেরের কর্মসূচী ব্যবহারিক। হয়ত একটা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। কিন্তু "সত্যবাদী ও অহিংস" হওয়া—যা একটি মানসিক প্রক্রিয়া ও সচেতন প্রয়াসের উপর নির্ভরশীল তা' ত্রিশকোটি লোকের ক্ষেত্রে কতদিনে ঘটবে সহজেই অনুমেয়। আর সেই অনির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত গান্ধিজীর নির্দেশিত পথ গ্রহণ করে পাঞ্জাব, খিলাফতের অন্যায়ের প্রতিকারকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

কিন্তু গান্ধিজী বিস্মৃত হয়েছিলেন যে আন্দোলনের শুরুতে তিনি মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যদি অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয় তাহলে তাঁদের শাস্ত্রানুযায়ী নিজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার থাকবে। খিলাফতের ঐতিহাসিক প্রস্তাবকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯শে মার্চ, ১৯২০ সালে বোম্বায়ের মিটিং-এ গান্ধিজী বলেছিলেন, "ঘটনাক্রমে যদি অহিংস অসহযোগ ব্যর্থ হয় তাহলে তাঁদের সুবিচার পাওয়ার জন্য অধিকার আছে সেইসব পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করার—যেগুলি ইসলামীয় শাস্ত্রের দ্বারা আদিষ্ট হবে।" (ঐ ; ১ম খণ্ড ; পৃ. ২৮৫) তিনি বলেন শান্তিপূর্ণ অহিংস উপায় ব্যর্থ হলে শেষ স্তরটি রক্তাক্ত বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাবে। তাঁর কথায়…"the last stage being a bloody revolution" (ঐ ; পৃ. ২৮৭) এখন দেখা গেল অহিংস শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ বলে স্বীকার করেও গান্ধীজী প্রস্তাবের শেষ স্তরটি বলবৎ করার কোনো চেষ্টা করলেন না। তার পরিবর্তে তিনি তাঁদের হাতে খদ্দরের কর্মসূচী তুলে দিলেন।

জওহরলাল নেহেরু অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখাকে সমালোচনা করলেও গান্ধিজীর সিদ্ধান্তকে শেষ পর্যন্ত সঠিক ও যথোচিত বলেছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি মনে করেছিলেন, "দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাইবার মত পর্যাপ্ত শক্তি জনসাধারণের নেই আর "কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি এবং বিদেশী শাসনের প্রতি অসন্তোষ যতই ব্যাপক হউক না কেন আমাদের উপযুক্ত মেরুদণ্ড ও সংঘশক্তি ছিল না। 'এক্ষেত্রে' আন্দোলন চলিলে যে নানাস্থানে বল প্রয়োগ ও উৎখাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত ইহা নিঃসন্দেহ ও তাহার ফলে গভর্নমেণ্ট

রক্তাক্ত উপায়ে তাহা দমন করিয়া ফেলিয়া এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিত যাহার প্রতিক্রিয়ায় জনসাধারণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত!" (আত্মচরিত ; পৃ. ৯১)

জওহারলালের ব্যাখ্যাত কারণগুলির মধ্যে প্রকৃত ঘটনা যত না ব্যক্ত হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে গান্ধিজীর প্রতি তাঁর তন্নিষ্ঠ মনোভাব যা ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ব্রেচারেরও বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। তাঁর ভাষায় "কিন্তু এর মধ্যেই (১৯২০-২২) গান্ধীর বিজ্ঞতার উপর জওহরলালের এত বিশ্বাস জন্মেছিল যে সাংঘাতিক ভিন্নমত পোষণ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিচারের উপর আস্থা রাখতে প্রস্তুত ছিলেন।" (নেহেরু এ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফী ; মাইকেল ব্রেচার ; পৃ. ৭৮) প্রথমতঃ দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাবার মত পর্যাপ্ত শক্তি নেই, এমন কোনো প্রমাণ অন্ততঃ ১৯২১ সালে পাওয়া যায় না। তেণ্ডুলকার লিখছেন, "অসন্তোষ সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রমিকরা পরিবহণ ব্যবস্থাকে অচল করে দিয়েছে। ১৯২১ সালে ৪০০টি স্ট্রাইক হয়েছে, যার সাথে অন্ততঃ ৫ লক্ষ শ্রমিক জড়িত।" এপ্রিল (১৯২১) মাসে মহারাষ্ট্রের মুলসি তালুকের কৃষকরা তাদের উপর অত্যাচার বন্ধ না হলে সত্যাগ্রহের হুমকী দিয়েছে। (মহাত্মা ; ২য় খণ্ড ; পৃ. ৪১) জওহরলালের "আত্ম-চরিত" থেকেও জানা যাচ্ছেঃ "বহু ব্রিটিশের মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমবর্ধিত বিরোধিতা ও অবাধ্যতা যেন বর্ষার কালো মেঘের মত সরকারী চিত্ত গগন ছাইয়া ফেলিল। শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলনকে বলপূর্বক দাবাইয়া দিবার পথ খুঁজিয়া পাইলেন না।" নেহেরুর ভাষায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাব সে সময়ে ছিল এই রকম :—"ভারতীয় সৈন্যদলকে কি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়? পুলিশ কি আমাদের আদেশ পালন করিবে? ভাইসরয় লর্ড রিডিং ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়।" (আত্ম-চরিত, পৃ. ৭৫) আর এর মাত্র দু' মাস পরে ১২ই ফেব্রুয়ারী আন্দোলন স্থগিত করে দেওয়া হল। ব্রিটিশদের নিকট পরিস্থিতি যখন এত জটিল, ভারতীয় সৈন্য ও পুলিশের আনুগত্য নিয়ে যখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে তখন তাদের পক্ষে সারা দেশকে রক্তস্নানে ডুবিয়ে দেওয়া সহজ হত কিনা যথেষ্ট চিন্তার বিষয় ছিল।

আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার মাত্র তিন দিন পূর্বে ভাইসরয় (৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২) ভারত সচিবকে এক গোপন টেলিগ্রামে তাঁর বিরাট দুঃশ্চিন্তার কথা ব্যক্ত করেছেন, ("...the fact that great anxiety is caused by the situation.")। তাঁর ভাষায় "এটা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে অসহযোগ

আন্দোলনের অনেকাংশই জাতীয় আকাঙ্ক্ষার দ্বারা উদ্ভূত এবং সঞ্জীবিত।' সেই টেলিগ্রামে তিনি আরো জানাচ্ছেন, শহরের নিম্নশ্রেণীগুলি প্রভাবিত তো হয়েছে উপরন্তু আসাম উপত্যকা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলের কৃষকরা এগিয়ে আসছে। আকালী আন্দোলন পাঞ্জাবের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সরকারকে প্রস্তুত থাকতে হবে আরো কোনো প্রচণ্ড গোলমালের জন্য। (টেলিগ্রামের উদ্ধৃতির জন্য, মাইকেল ব্রেচার, পৃ. ৭৮-৭৯)। মাদ্রাজের নাম টেলিগ্রামে না থাকলেও ১৯২২ সালের ১৫ই জানুয়ারী প্রিন্স অব ওয়েলস যখন রাজ সফরে সেখানে গেলেন তখন সমস্ত মাদ্রাজবাসী কংগ্রেসের আহ্বানে তাঁকে পূর্ণ হরতাল পালন করে "সম্বর্ধনা" জানালেন। জুডিথ ব্রাউন অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া কিভাবে দেশবাসীর মধ্যে পড়েছিল তার জেলাওয়ারি, প্রদেশওয়ারি বিবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ রিপোর্ট এবং গান্ধিজী-বিরোধী মডারেট বা লিবারেলদের প্রদত্ত বর্ণনার উপর নির্ভর করে লিখেও অস্বীকার করতে পারেননি যে আন্দোলন জনগণের অংশগ্রহণে কোনো ক্রমেই স্তিমিত হয়নি। জনগণের জোরদার অংশগ্রহণকে যখন তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না তখন তাঁকে মন্তব্য করতে হয়েছে আন্দোলনের তাৎপর্যকে লঘু করে দেখানোর জন্য, লোকে যোগ দিয়েছিলেন কিছুটা ধর্মীয় বোধে আর কিছুটা গান্ধিজীকে অবতার মনে করে। (জুডিথ ব্রাউন, পৃ. ৩৪৫) ব্রাউনের মন্তব্য স্পষ্টতঃই সমসাময়িক ভাইসরয়ের মূল্যায়নের বিরোধী। কারণ ভাইসরয় তাঁর টেলিগ্রামে আন্দোলনকে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দেখেছিলেন —যা জুডিথ ব্রাউন ১৯৭২ সালে তাঁর বিশ্লেষণে খুঁজে পাননি। অথচ তাঁরই গ্রন্থে বাংলাদেশের গবর্নর রোনাল্ডসে ভাইসরয় রিডিংকে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার মাত্র ন' দিন পূর্বে (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২২) যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন, তাতে তিনি লিখছেন, "জনসাধারণ এখনো পর্যন্ত খাদ্য, পাট এবং বস্ত্রের দাম নিয়ে চিন্তিত। তারা গান্ধীর নামের সাথে জড়িত রাজনীতিতে কেবলমাত্র আকৃষ্ট এবং অনেকেই মনে করে স্বরাজের অর্থ সস্তায় খাদ্য এবং বস্ত্র।" (উদ্ধৃতির জন্য জুডিথ ব্রাউন, পৃ. ৩৪৫) এবং সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে লোকে গান্ধীরাজ (যা' তাদের কাছে স্বরাজের নামান্তর) এসে গেছে মনে করে সরকারী খাজনা, কর এবং ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করছে। দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত বাংলাদেশের গবর্নর এই রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন ভারত সচিব মন্টেগুকে ভাইসরয়ের পাঠানো টেলিগ্রামের তারিখেই অর্থাৎ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২। গান্ধীজীকে সাধারণ মানুষ অবতার বা মুক্তিদাতা বা অসাধারণ মনে করত কিনা

এ বিতর্কের মধ্যে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারুণ রুশ বিপ্লবের পর অনেক দরিদ্র চাষী লেনিনকে শুধু দেখতে এসেছিল তিনি মানুষ কিনা দেখতে। (বাংলার গভর্নরের পাঠানো রিপোর্টের উদ্ধৃতির জন্য; ঐ, পৃ. ৩৪৫—৩৪৬) জোয়ান অব আর্ককে ফ্রান্সের অনেকে মনে করত ঈশ্বর পুত্রী!

এই ছিল যখন দেশের পরিস্থিতি তখন আন্দোলনের আরেক শরিক নেহেরুর মত তরুণ সুভাষচন্দ্র বসু কিন্তু মনে করেন না যে আন্দোলন টেনে নিয়ে যাওয়ার মত সংগঠন শক্তি কংগ্রেসের ছিল না। জুডিথ ব্রাউন মনে করেন অসহযোগ আন্দোলনে উদ্ভুত গণ-আন্দোলন নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেছল এবং স্থানীয় বহু ক্ষেত্রে কর্মসূচী অমান্য করা হয়েছে। (পৃ. ৩৪৭)

একটি বিপ্লবী আন্দোলনে পশ্চাতে যে সংগঠন শক্তি সক্রিয় থাকে বিপ্লবের সাফল্যের ধাপে ধাপে সেই সংগঠন শক্তি ক্রমশঃ দৃঢ় রূপ নিতে থাকে তার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সেই ঘটনাই ঘটেছিল। স্থানীয়ভাবে কোথাও কোথাও অতি উৎসাহের কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। কর্মসূচী কোথাও বাস্তব কোনো কারণে উল্লঙ্ঘন করা হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জাতীয় স্তরে যে সব কর্মসূচী রূপায়ন করতে আহ্বান জানানো হয়েছিল (যথা, বয়কট, হরতাল, খদ্দর প্রভৃতি) সেগুলি সক্রিয় বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল বা গান্ধিজীকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা হয়েছিল।

দু'চারটি অসংগঠিত হিংসাত্মক ঘটনা কখনোই প্রমাণ করে না যে নেতৃত্ব ক্রমশঃ গান্ধিজীর হাত থেকে চলে যাচ্ছিল বা তিনি নিয়ন্ত্রণ শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। বরং উল্টোটাই দেখি। গান্ধিজীর নেতৃত্ব আরো দৃঢ় এবং সংহত হচ্ছিল। এর প্রমাণ গুন্টুর জেলার লোকেরা ট্যাকস দেওয়া বন্ধ রাখলে গান্ধিজী তাঁদের ট্যাকস মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করলে তারা সে অনুরোধ পালন করে। বারদৌলীতে তিনি যখন প্রতীক ট্যাকস বন্ধের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন বললেন, তখন অন্যত্র তাঁর অনুরোধে ট্যাকস বন্ধের আন্দোলন স্থগিত রইল। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বের তখনো পর্যন্ত গান্ধীবাদ-বিরোধী চিন্তা এবং সংগঠন এমন কিছু জোরদার ছিল না যা তাঁর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। বরং দেখা যায় তৎকালীন লিবারেল দলের নেতা স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউনসিলের হোম মেম্বারকে এক গোপন চিঠিতে জানাচ্ছেন, "শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির মধ্যে তিনি (গান্ধী) এবং তাঁর দল নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড প্রভাব রাখেন, যা' অগ্রাহ্য করা যায় না (৯ই অক্টোবর, ১৯২১)। মনে রাখা দরকার আন্দোলন স্থগিতের মাত্র তিন মাস আগে এই চিঠি লেখা হয়েছিল।

(উদ্ধৃতির জন্য ; মাইকেল ব্রেচার ; পৃ. ৭৪) ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব তাঁরই অনুগামীদের হাতে ছিল। ১৯২০ সালে বোম্বাইতে আহুত প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতি বির্বাচিত হলেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা লাল লাজপত রায়। এই কারণে সুভাষচন্দ্র বসু একজন প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিসেবে দুঃখ করেছেন যে, আন্দোলন এমন এক সময়ে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল যখন সামগ্রিকভাবে দেশের অবস্থা আইন অমান্য সফল করার পক্ষে অনুকূল ছিল। তাঁর ধারণায় "যখন জনসাধারণের উৎসাহ ফেটে পড়ার স্তরে পৌচেছিল ঠিক সেই সময়ে পিছু হঠার আদেশ দেওয়া জাতীয় বিপর্যয় ছাড়া আর কি বলা যায়।" (দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল ; পৃ. ৭৩) জনগণের উপর গান্ধিজীর অবিসংবাদিত নিয়ন্ত্রণের শক্তির কথা মনে রেখে লুই ফিশার মন্তব্য করেছেন, "গান্ধীর একটি মাত্র কথায় ভারতবর্ষ ফেটে পড়তে পারত। সে কথাটি বলা হল না।" মাইকেল ব্রেচার লিখছেন, তাঁর অনুগামীদের কাছে গান্ধীর কাজ আরো বেশী পরিতাপের বিষয় হয়েছিল এই কারণে যে, যখন তিনি এটি ঘটালেন, তখন আশা আরো উজ্জ্বল হচ্ছিল এবং দেশময় আন্দোলন আরো অগ্রগতি লাভ করেছিল।" (মাইকেল ব্রেচার, পৃ. ৭৮ ; লুই ফিশারের উদ্ধৃতির জন্য, মজুমদার ; ৩য় খণ্ড ; পৃ. ১৫৭)।

অসত্য কথা যেমন বারবার পুনরুক্তিতে সত্যের মর্যাদা পায় তেমনি সাধারণভাবে কোনো একটি মন্তব্য অধিকাংশ ইতিহাস পুস্তকে স্থান পেলে জনমানসে একটি বিশ্বাসযোগ্য আস্থা অর্জন করে। সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের পর অধিকাংশ ইতিহাসবিদ জওহরলালের ধারণাটিকে ("দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাইবার মত পর্যাপ্ত শক্তি জনসাধারণের নেই" ; জওহরলাল নেহেরু। কিন্তু মনে রাখা দরকার সুভাষচন্দ্র প্রমুখ আরো অনেক নেতা ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন।) সত্য স্বীকার করে নিয়ে সুবিধামাফিক তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের মতামতকে—অর্থাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার যথার্থ হয়েছে—সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক বি. এন. পাণ্ডেকে এঁদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় বলা যায়। যেহেতু ১৯১৯ সালের ভারত আইন অচল হয়নি, লিবারেলপন্থীরা আইন সভার নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন, মোপলা বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমানের তিক্ততা দেখা দিয়েছিল এবং খুব কম লোক খেতাব বা সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়েছিল তাই সন্দেহ করা যায় সত্যাগ্রহ আরো টেনে নিয়ে গেলে তাৎক্ষণিক ফল লাভ করা যেত না। (দি ব্রেক আপ অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ; পৃ ১১৬) জুডিথ ব্রাউন

এই মতামতেই বিশ্বাসী। যদিও তাঁর বইতে যে সব তথ্যের সম্ভার আছে তাতে বিপরীত সিদ্ধান্তেই পৌছাতে হয়।

প্রথমতঃ কতজন খেতাব বর্জন করেছিল বা চাকুরীতে পদত্যাগপত্র দিয়েছিল, সেটা এক্ষেত্রে বড় কথা ছিল না। বড় কথা ছিল বা মূল প্রশ্ন ছিল, যারা এ কাজ করেননি তাঁদের সাধারণ মানুষ কি চোখে দেখত? গান্ধিজী, মোতিলাল নেহেরু. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা এ বিষয়ে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপনের ফলে (যুদ্ধের সময়ে সেবার জন্য যে সমস্ত পদক ইংরেজদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সেগুলি গান্ধিজী ১লা আগষ্ট, ১৯২০ সালে ভাইসরয়কে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।) সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ খেতাবধারী এবং চাকুরীজীবীদের ইংরেজের গোলাম বলে উপহাস এবং ঘৃণা করত। যা' মানসিক দিক থেকে আরো বেশি ভয়ংকর ছিল। ইংরেজের "খয়ের খাঁ" শব্দটি তখনই জনপ্রিয় হয়। সামাজিক বয়কট বা অন্যদিকে বলা যায় এ ধরনের লোকেরা সাধারণ মানুষের চোখে হেয় বা অস্পৃশ্য হয়েছিল। তদানীন্তন পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে সব সরকারী কর্মচারী পদত্যাগ করেননি তাঁদের অবস্থা সাধারণ মানুষের নিষ্ক্রিয় বিরোধিতার ফলে খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে তাঁদের সক্রিয় বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল (পুলিশ রিপোর্টের জন্য : জুডিথ ব্রাউন ; পৃ. ৩১০)।

কাউন্সিলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসংগে তারাচাঁদ লিখছেন, "কংগ্রেস ভোটদানে বিরত ছিল কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলীর উপর তার প্রভাব যে আছে সেটা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিল এবং যারা নির্বাচিত হল তাদের মিথ্যা প্রতিনিধিত্বের মুখোসটি খুলে দিল।" (তারাচাঁদ, ৩য় খণ্ড ; পৃ. ৪৯৫)। হিন্দু-মুসলমানের তিক্ততার কথা বলা হলেও মনে রাখা দরকার ১৯০০ সাল থেকে ১৯২২ সালের (যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিল) মধ্যে মাত্র ১৬টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাইশ বছরের মধ্যে ঘটেছিল। পক্ষান্তরে মাত্র তিন বছরের মধ্যে যখন আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে ৭২টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। (বি. এন. পাণ্ডে ; পৃ. ১১৭)

এখন দেখা যাক, আন্দোলনের অগ্রগতির প্রতিক্রিয়া সমাজের বিভিন্ন স্তরে অর্থাৎ রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কেমন পড়েছিল? তিলকের স্মৃতি উদ্‌যাপনের জন্য যে এক কোটি টাকার তিলক স্বরাজ ফাণ্ড গঠিত হয়েছিল তা খুব দ্রুত পূরণ হয়ে গেছল। কলেজগুলিতে ছাত্রের সংখ্যা ১৯১৯-২০তে ৫২,৪৮২ থেকে কমে ১৯২১-২২ সালে দাঁড়িয়েছিল ৪৫,৯৩৩ জন। সেকেণ্ডারী স্কুলে ১৯১৯-২০ সালে

ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১,২৮১,৮১০ জন। কমে দাঁড়াল ১৯২১-২২ সালে ১,২৩৯,৫২৪ জন। মনে রাখা দরকার যেসব ছাত্র স্কুল, কলেজ পরিত্যাগ করে জাতীয় স্কুল, কলেজে যোগ দিয়েছিল, তাদের ডিগ্রী ভবিষ্যতে চাকুরীর জন্য স্বীকৃতি না পাওয়ার আশংকায় পুনরায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গিয়ে ভর্তি হয়েছিল—ফলে ছাত্রের সংখ্যা দারুণভাবে কমতে পারেনি। (পি. সি. র‍্যামফোর্ড, হিষ্ট্রিজ অব দি নন কো-আপারেশন এণ্ড খিলাফত ম্যুভমেণ্টস; উদ্ধৃতির জন্য, তারাচাঁদ; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৪১৪) জুডিথ ব্রাউনের মতে ১৯২১ এবং ১৯২২ সালে ভারতীয় শিক্ষা প্রচণ্ডভাবে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল, বিশেষ করে কলেজ এবং সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে। এবং এর কারণ "আর্থিক নয় অসহযোগ আন্দোলন"। (জুডিথ ব্রাউন; পৃ. ৩১০) সারা ভারতে বিদেশী বস্ত্র বর্জন দারুণভাবে সফল হয়েছিল। আর্থিক দিক থেকে ইংলণ্ডের নিজের বাজার প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। কমারসিয়াল ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট ১৯২১-২২ সালে "ট্রেড অব ইণ্ডিয়া" সম্পর্কে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিল, দেশী কাপড়ের থান (piece-goods) বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছিল। (তারাচাঁদ; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৪১৫) মোট কাপড়ের আমদানীও প্রচণ্ডভাবে কমে গেছল। যার অন্যতন কাবণ জুডিথ ব্রাউনেব মতে স্বদেশী প্রচার। ১৯২০-২১ সালে যেখানে ১০২ কোটি টাকার বস্ত্র আমদানী হয়েছিল সেখানে ১৯২১-২২ সালে আমদানী কমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৫৭ কোটি। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হস্তচালিত তাঁতের জন্য যে ধরণের সূতার প্রয়োজন, সে ধরণের সূতার আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতীয় মিলগুলি এই ধরণের সূতা ব্যাপকভাবে তৈরী করতে লাগল। ১৯২০-২১ সালে হস্তচালিত তাঁতের উপযোগী সূতার আমদানী ছিল ৪৭ মিলিয়ন পাউণ্ড, পরের বছর (১৯২১-২২) বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ৫৭ মিলিয়ন পাউণ্ড। (জুডিথ ব্রাউন; পৃ. ৩১৪) মদ্যপান বর্জন অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে রূপায়িত হয়েছিল। ১৯২১-২২ সালে সরকারের আবগারী শুল্ক থেকে আয় ভাল রকম কমেছিল। পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা বোম্বাইতে আয় কমেছিল যথাক্রমে ৩৩, ১০ এবং ৬ লক্ষ টাকা। (তারাচাঁদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৫) ১৯২২ সালে মাদ্রাজের গবর্নর দুঃখের সাথে মন্তব্য করছেন, "আমাদের অবস্থা সত্যই হতাশজনক। গান্ধীর প্রচারের ফলে এ বছর আবগারী আয়ে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৬৫ লক্ষ টাকা।" (উদ্ধৃতির জন্য, জুডিথ ব্রাউন পৃ. ৩১৫—৩১৬) মূল্যসূচীও উল্লেখ-জনকভাবে হ্রাস পায়নি যা' জনসাধারণকে আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে সরকারের মুখাপেক্ষী করে তুলবে। আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছিল তখন মূল্যসূচক ছিল

১৯২১ সালে ২৬৬ আর যখন প্রত্যাহার করা হল, ১৯২২ সালে ছিল ২৩২ । (ধরা হয়েছে ১৮৭৩=১০০)।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের অভাবনীয় সাফল্যের ঘটনাকে স্বীকার করে নিয়ে পরোক্ষে সরকারকেই এর কৃতিত্ব জুডিথ ব্রাউন দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় "সরকার বলপ্রয়োগে সম্মত ছিল না" ("a government which refused to use force", পৃ. ৩৪৮) এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কেবলমাত্র একথা বললে চলবে যে আন্দোলনের যাঁরা তীব্র বিরোধী ছিলেন সেই মডারেটরা পর্যন্ত ভাইসরয়ের কাছে পত্র লিখে পুলিশের বর্বরতা বন্ধ করতে আবেদন জানিয়ে ছিলেন। অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র পর্যন্ত পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। গান্ধিজী ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এক প্রতিবাদ পত্রে বিগত এক বছরে সরকারের একের পর এক নৃশংস আক্রমণের প্রতি ভাইসরয়ের ব্যর্থ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পত্রের শেষে লেখেন, যে বিবরণগুলি দিলাম, প্রকৃত ঘটনার তা' এক-দশমাংশও নয়। (উদ্ধৃতির জন্য ; মজুমদার ; ৩য় খণ্ড ; পৃ. ১৬৭-১৭০)

কেবলমাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বরাজ অর্জন এবং খিলাফত ও পাঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতিকারের চিন্তা গান্ধিজীর কখনোই ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি। কারণ তিনি ইংরেজদের শুভবুদ্ধি এবং হৃদয় পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। আন্দোলনের প্রকৃতি ও সমাপ্তি সম্পর্কে তাঁর একটি নিজস্ব চিন্তাধারা ছিল, যা' তিনি ১৯২২ সালের ৫ই জানুয়ারী "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় এক প্রবন্ধ মারফত ব্যক্ত করেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী—"অসহযোগে যতদিন অহিংসা থাকবে ততদিন তাকে বিনা বাধায় চলতে দেওয়া উচিত। যখন সেই অবস্থা পৌছাবে, তখন প্রতিনিধিত্বমূলক কনফারেন্স ডেকে খিলাফত, পাঞ্জাব এবং স্বরাজের মীমাংসা করতে হবে কিন্তু তার পূর্বে নয়।" ("When that position is attained, it is lime for a representative conference to be summoned for the settlement of Khilafat, the Punjab and Swaraj but not till then." মহাত্মা ; ২য় খণ্ড ; পৃ. ৭৬) সুতরাং স্বরাজের মীমাংসা আলোচনা বা কনফারেন্স ডেকেই করতে হবে এবং অসহযোগ আন্দোলন অহিংসার মধ্যে থেকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে যাতে করে সরকার কনফারেন্স ডাকতে বাধ্য হন, এই ছিল গান্ধিজীর আন্দোলনের ছক। কিন্তু সমস্ত ছকটা গোলমাল হয়ে গেল শ্রেণী-সংঘর্ষের তীব্রতার ফলে। তবে জুডিথ ব্রাউন ভারতীয়দের মধ্যে যে জাত-পাত

ও সংঘর্ষের কথা বলছেন তা' তখনো পর্যন্ত একটা বিরাট আকার নিয়ে গান্ধিজীকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলেনি।

তার কারণ গ্রামাঞ্চলে যেখানে জাত-পাতের প্রশ্নটি সাধারণতঃ তীব্র হয়ে উঠে সেখানেই দেখা যাচ্ছে আন্দোলন ক্রমশঃ সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে। জুন মাসের শেষের দিকে বাংলার তৎকালীন গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে (১৯১৭-১৯২২) সংবাদ দিচ্ছেন সেক্রেটারী অব টেটস মণ্টেগুকে (৩০শে জুন, ১৯২১): "নানাধরনের নন-কোপারেশন (অসহযোগ) এজেন্টরা গ্রামগুলিতে এক ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে। ফলে এক বিরাট অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে।" মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার গ্রামাঞ্চলে যিনি কর বন্ধের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলা তথাকথিত উচ্চবর্ণজাত ছিলেন না। অথচ তাঁরই নেতৃত্বে কাঁথির ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯২১ সালে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হলে সাধারণ লোকের ধারণা হয় এই বোর্ড ক্ষতিকারক অথচ বাড়তি হারে কর দিয়ে এই বোর্ড বা প্রতিষ্ঠানকে পুষতে হবে। কারণ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রকৃত ক্ষমতা সরকারী লোকেদের হাতেই থাকবে। শাসমল এর বিরুদ্ধে যে বিশালভাবে কর-বন্ধ আন্দোলন শুরু করে দিলেন তা' প্রতিরোধ না করতে পেরে শেষ পর্যন্ত নবেম্বর মাসে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট (Bengal Government)-কে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের আইনটি প্রত্যাহার করে নিতে হয়। "দেশবন্ধু-স্মৃতি"র লেখক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ময়মনসিংহে (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভূর্ক্ত) চিত্তরঞ্জন দাসের আগমন (২রা মার্চ, ১৯২১) উপলক্ষে লিখছেন, "ভূস্বামী, প্রজা, উকিল, ছাত্র, হিন্দু, মুসলমান, মুচি, মেথর সকলেরই মুখে হাসি, মনে অসীম উৎসাহ, হৃদয়ে অদম্য আগ্রহ।" বগুড়ার বিষয়টি একটু ভিন্ন ধরনের। সেখানের সমস্ত জাতের মাতব্বর নিয়ে ইংরেজের আদালত বর্জন করে "ছত্রিশী বিচার" পদ্ধতি চালু হয়। চিত্তরঞ্জন এই ব্যবস্থায় এত তুষ্ট হন যে তিনি একে স্বরাজের প্রথম ভিত্তি বলে নির্দেশ দেন। সেই সালিসির মধ্যে একজন মেথরও ছিল। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখছেন, "এই মেথরটি নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব কাজ করিতেছিল। মদ্যপান প্রায় তাহারা বন্ধই করিয়াছিল। সভায় বক্তৃতার পরে দেশবন্ধু এই মেথরটিকে যেরূপ জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করেন ও তখন সভায় যেরূপ ভাবের আবেশ হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে অবর্ণনীয়।" (দেশবন্ধু-স্মৃতি, পৃ. ২৬৭) জলপাইগুড়িতেও একই দৃশ্য। ২৯শে মে প্রকাণ্ড সমাবেশে প্রায় ১০।১২ হাজার লোকের উপস্থিতিতে

স্থানীয় পতিতারা দেশবন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁরা আর মদ, বিলাতী বস্ত্র, লবণ ও সিগারেট স্পর্শ করবেন না। (ঐ, পৃ. ২৬৯)

শ্রীগোপাল হালদার তাঁর আত্মজীবনীতে এ সময়ে সুদূর নোয়াখালি জেলায় সাধারণ মানুষ আন্দোলনকে কি চোখে নিয়েছিল তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ "বোঝে—এবার অন্ন জুটবে, বাড়ি-জমিও ; দেনার বোঝা, খাজনার বোঝা, এমনি যত বোঝা থেকে মুক্তি মিলবে।" (রূপনারায়নের কূলে, দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃ. ৭৭-৭৮ ; সংস্করণ, ১৯৮১) বস্তুতঃ গান্ধিজীর দুঃশ্চিন্তা ছিল শ্রমিক ও কৃষকের ক্রমবর্ধমান দৃঢ় অভিব্যক্তি এবং সমাজে শ্রেণীসংঘর্ষকে ধারালো করার প্রচেষ্টায় বিশ শতকের গোড়ায় ভারী শিল্প প্রবর্তনের সাথে সাথে ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তনের ঢেউ এসেছিল। অন্যদিকে নিজেদের শাসন ও ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয়ের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রেলপথ প্রবর্তন ও যোগাযোগে ব্যবস্থা উন্নত করতে বাধ্য হল। প্রয়োজন দেখা দিল ভারতীয় কর্মচারী ও শ্রমিক সংগ্রহের। ইংরাজী শিক্ষারও প্রসার ঘটল। ফলে ব্রিটিশ শিল্পে নিয়োজিত একদল শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থানের কারণে যেমন কিছুটা সন্তুষ্টি ঘটল তেমনি কর্মসংস্থানের নানা অসুবিধা—চাকুরীর স্থায়ীত্ব, বৈষম্য, কাজের ঘণ্টা, মালিকের শ্রমিক-বিরোধী কার্যকলাপ প্রভৃতি নিয়ে ক্রমশঃ অসন্তোষ তীব্র হতে লাগল। যার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ কল-কারখানায় ধর্মঘট। এটা যে শুধু সরকারের উৎপাদন ব্যবস্থায় আঘাত করছিল তাই নয় দেশীয় পুঁজিপতিদেরও মুনাফার ক্ষতি করছিল। শুধু কারখানার শ্রমিকরা নয় পিছিয়ে পড়া চা-বাগিচার শ্রমিকরাও ক্রমশঃ সংগ্রামমুখী হয়ে পড়ছিল। ১৯২১ সালের মে' মাসে প্রায় বারো হাজার বাগিচা শ্রমিক আসামের চা-বাগিচা আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন কয়লাখনি শ্রমিকদেরও জঙ্গী করে তুলল। বাংলা-বিহারে অবস্থিত কয়লাখনির শ্রমিকদের মনোভাব সম্পর্কে খনিগুলির প্রধান পরিদর্শক এম. আর. সিম্পসন (M. R. Simpson) ১৯২০ সালে এক রিপোর্টে জানাচ্ছেন, "জীবন ধারণের মূল্যবৃদ্ধিকে আন্দোলনকারীরা খুবই কাজে লাগাচ্ছে এবং তীব্র শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বহু কোলিয়ারীতে ধর্মঘট হচ্ছে"। একই ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের আরেক ফলশ্রুতি কলকাতায় ট্রাম-শ্রমিকদের আন্দোলন, ১৯২০ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ৪ঠা অক্টোবর এই চারদিন ধরে প্রায় আড়াই হাজার ট্রাম-শ্রমিক ৭৫ পয়সা মজুরী বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবীসহ কাজ বন্ধ রাখলেন। কোম্পানী শেষ পর্যন্ত মুখ্য দাবীগুলি মেনে নিতে বাধ্য হল। এবং এই জয়ের মধ্য

দিয়ে জন্ম নিল ট্রাম শ্রমিকদের সংগঠন, "ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ এম্পলইজ ইউনিয়ন" বা Calcutta Tramways Employees' Union। এই ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট নিশীথ চন্দ্র সেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা সবাই ছিলেন কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং অসহযোগ পন্থী। অ.স্থ কোম্পানী শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল, ফলে শ্রমিকদের আবার ধর্মঘটে সামিল হতে হল ১৯২১ সালের ২৬শে জানুয়ারীতে। এবারে তাঁদের দাবী ছিল ন্যূনতম মজুরী ৩০ টাকা হারে এবং আটঘণ্টা কাজের সময়। এই ধর্মঘট চলেছিল ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এবং তাকে সমর্থনের জন্য এগিয়ে এসেছিল বাংলার জাতীয়তাবাদী প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সমূহ। (নির্বাণ বসুর প্রবন্ধ; দি কোয়া-টার্লী রিভিউ অব হিস্টোরিক্যাল ষ্টাডিজ; এপ্রিল-জুন, ১৯৮৫) একটা হিসেব নিয়ে দেখা গেছে সারা ভারতে ১৯২০ এবং ১৯২১ সালের মধ্যে ধর্মঘটের আন্দোলন ক্রমশঃ জোর থেকে জোরদার হয়ে উঠেছিল। গড়ে ৪০ থেকে ৬০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটগুলিতে অংশ নিয়েছিল। ১৯১৮-১৯১৯ সালের চেয়ে শ্রমিক আন্দোলনের এক নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা গেল—তা'হল সংঘটিত রূপ, ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। শ্রেণীবোধ শ্রমিকদের মধ্যে এক নতুন ঐক্যবোধ সঞ্চারিত করল—ফলে শুধু ধর্মঘটী শ্রমিকরা নয় তাঁদের সমর্থনে বিভিন্ন স্থানের শ্রমিকরাও সৌভ্রাতৃত্বমূলক ধর্মঘটে যোগ দিল। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে বোম্বাই, জামসেদপুর এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রগুলির সাধারণ ধর্মঘটের বিবরণগুলিতে। মনে রাখা দরকার যেখানে ১৯১৯ সালে মাত্র উনিশটি ধর্মঘট হয়েছিল সেখানে ১৯২০ সালে হয়েছিল ২০০টি এবং ১৯২১ সালে তা' বেড়ে দাঁড়ালো ৪০০। এরই মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে জন্ম নিল সর্বভারতীয় প্রথম শ্রমিক সংগঠন (এ.আই.টি ইউ.সি. বা অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস) ১৯২০ সালের মে মাসে বোম্বাইতে। যা' ছিল অসংগঠিত শ্রমিকদের বিক্ষোভের প্রকাশ তাই এখন থেকে সুশৃঙ্খল নেতৃত্বের মাধ্যমে রূপ নেবে আরো দৃঢ় প্রত্যয়ের। সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের ছত্রছায়ায় আশ্রিত ধনিক শ্রেণীর সত্যই দুঃশ্চিতার কারণ দেখা দিল।

এদিকে ভারতের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষকদের মধ্যেও জঙ্গী মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ১৯২০-র বসন্তকাল থেকেই গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল—যার স্বীকৃতি আমরা পূর্বেই বাংলার গবর্নর রোনাল্ডসে'র পাঠানো রিপোর্টে লক্ষ্য করেছি। কৃষকরা শুধু ইংরেজ-বিরোধী হয়ে পড়ছিল তাই নয়, তারা সুস্পষ্টভাবে নেতৃত্বের আবেদন অস্বীকার করে জমিদার-জোতদার-বিরোধী কর্ম তৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছিল। অসহযোগ আন্দোলন উড়িষ্যায় কৃষক ও

আদিবাসীদের মধ্যে এক সংগ্রামী জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। খুরদার এক জনসভায় (অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের মাত্র দু'দিন পূর্বে) কংগ্রেসের প্রধান সারির নেতা গোপবন্ধু দাস সমবেত কৃষক ও আদিবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হন যে তাঁদের উচিত সরকারের খাজনা ও ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেয়া—কোনো অবস্থাতেই তারা যেন কর বন্ধ না করেন।' (উড়িষ্যার "সমাজ' পত্রিকার রিপোর্ট ; ১১.২.১৯২২) মেদিনীপুর জেলায় ভাগচাষী আন্দোলন সরাসরি জোতদার-জমিদার বিরোধিতায় পরিণত হচ্ছিল। কাঁথি ও তমলুক মহকুমার বেশ কিছু স্থানে জোতদাররা ভাগচাষীদের কাছ থেকে আধা ভাগ ধান-খড় ছাড়া নানা অছিলায় উপরি আদায় করত। কিছু কিছু জায়গায় উপরি আদায়ের পরিমাণ ভাগচাষীর প্রাপ্য ফসলের পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত চড়েছে। অর্থাৎ জোতদার শক্তিশালী হলে ফসলের তিন-চতুর্থাংশ তার গোলায় উঠবে। ফলে ভাগচাষীর পক্ষে সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়ত। অপরিহার্যভাবে তাকে হাত পাততে হত জোতদার-মহাজনের কাছে। সে ধার দিত অসম্ভব চড়া হারে—শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সুদে। উপরি আদায়ের সংগে সুদ যোগ হয়ে এমন অবস্থা হত যে মূল শোধ দেয়া দূরে থাকুক বছরের সুদটাও ভাগচাষী দিয়ে উঠতে পারত না। অসহযোগ আন্দোলন ভাগচাষীদের সামনে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ প্রকাশের এক নতুন সুযোগ এনে দিল। ১৯২২ সালের ২২শে মার্চ সাপ্তাহিক "নীহার" পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যায় (কাঁথি থেকে প্রকাশিত) ভাগচাষীরা উপরি আদায়ের বিরুদ্ধে চণ্ডীভেটী গ্রামে সভা আহ্বান করে। এই সভায় প্রায় পনেরো হাজার ভাগচাষীরা উপস্থিত হয়েছিল। যদিও অসংগঠিত ভাগচাষীরা পুরোপুরি তাদের দাবী আদায় করতে পারেনি তথাপি সংঘবদ্ধ হওয়ার এই যে প্রচেষ্টা এটিও কোনোভাবে উপেক্ষনীয় নয়। হিতেশরঞ্জন স্যান্নালের মত মেদিনীপুরের "ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনের অভিজ্ঞতাই ভাগ চাষীদের প্রেরণা ও সাহসের উৎস। লোকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিল যে নিরস্ত্র মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সরকারও নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল। এর ফলে সাধারণ মানুষ সংঘশক্তির জোর কত সেটা উপলব্ধি করতে পারে। এই বোধ না জন্মালে ভাগচাষীরা জোতদার মহাজনের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারত না…"। মনে রাখা প্রয়োজন জোতারদের মীমাংসার প্রস্তাব ভাগচাষীদের মনঃপূত হয়নি। তারা প্রতিবাদ করে বলে "মহাত্মা যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পথ নিতে হবে।" "নীহার" পত্রিকা লিখছে, ভাগচাষীরা "মহাত্মা গান্ধীর জয়, জয় বীরেন্দ্রনাথের

(শাসমল) জয় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ী চলিয়া যায়।" (কাঁথির বিবরণীর জন্য, হিতেশরঞ্জন সান্যালের প্রবন্ধ, "দেশ" কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা) অসহযোগ আন্দোলনে বিহারের কৃষকরাও পিছিয়ে ছিল না। ১৯২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে পূর্ণিয়া এবং ভাগলপুর জেলায় বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। আরও পুর্বে ১৯১৯ সালের ১১ই অক্টোবর স্বামী বিদ্যানন্দের নেতৃত্বে দারভাঙ্গায় জমিদারদের বিরুদ্ধে এক বিরাট কিষাণ সভা আহুত হয়েছিল। যোগদানের সংখ্যা ন্যূনপক্ষে দশ হাজার হবে। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারীতে মধুবনীতে ছ' থেকে আট হাজারের মত কৃষকের জমায়েত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দীপ নারায়ণ সিংহ—যিনি অসহযোগে যোগ দেয়ার জন্য কৃষকদের কাছে আবেদন রাখেন। ১৯২১ সালের ভাগলপুর জেলার সুপল মহকুমার নয়াবাখরে (Nawabakhar) যে কিষাণ সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল তাতে প্রায় সাত হাজার কৃষক সম্মেলনের (১লা মে) দ্বিতীয় দিনে যোগ দিয়েছিল। এই সম্মেলনে স্বামী বিদ্যানন্দ (৩০শে এপ্রিল) পরিস্কারভাবে জমিদারদের জানালেন যে কৃষকদেরই কেবল জমির উপর স্বাভাবিক অধিকার আছে। জমিদাররা শুধু ইংরেজদের তরফে তহশীলদার মাত্র। ১৯২২ সালের ৪ঠা আগষ্ট গয়াতে তৃতীয় বিহার প্রাদেশিক কিষাণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান বাবু শিওনন্দন সিং তাঁর বক্তৃতায় কৃষকরা কি ভাবে জমিদারদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে তার এক বিবরণ পেশ করেন। ফলে জমিদাররা ভীত হয়ে বিহার টেনান্সি বিল (Bihar Tenancy Bill) সম্পর্কে কৃষকদের অভিযোগ দূর করার জন্য গয়ায় তাঁদের প্রতিনিধিদের সাথে দ্রুত এক বৈঠকে মিলিত হন। (ডঃ রামসেবক-এর প্রবন্ধ, দি কোয়াটারলি রিভিউ অব হিষ্টোরিক্যাল ষ্টাডিজ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৪)

কিন্তু ব্যাপকতা ও শক্তির দিক থেকে উত্তরপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন সরকারের সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং জমিদারদের করেছিল আতংক-গ্রস্ত। কৃষকদের আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসার ব্যাপারে যিনি সবচে বেশি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর নাম বাবা রামচন্দ্র। মহারাষ্ট্রের এই ব্রাহ্মণ তনয় মাত্র তেরো বছর বয়সে বাড়ী থেকে পালিয়ে ফিজি দ্বীপে চুক্তিপত্র শ্রমিকের কাজ নেন। তারপর ১৯০৯ সালে যুক্তপ্রদেশের ফৈজাবাদে এসে এক ভবঘুরে সাধুর বৃত্তি অবলম্বন করেন। ১৯২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কাজ ছিল মাথায় করে তুলসীদাসের রামায়ণের কপি বয়ে বেড়ানো এবং গ্রামে-গঞ্জে তা থেকে শ্রোতাদের কাছে পাঠ শোনানো। ১৯২০ সালের মাঝ থেকে কিন্তু তাঁকে দেখা গেল

অযোধ্যার কৃষকদের সংগঠিত করে নেতৃত্ব দিতে। তাঁর পরামর্শে কংগ্রেসের তৎকালীন তরুণ নেতা জওহরলাল নেহেরু জৌনপুর এবং প্রতাপগড় জেলার কৃষকদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের দুরবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

ইতিমধ্যে প্রতাপগড় জেলার ডেপুটি কমিশনার মেহতা কৃষকদের অভাব-অভিযোগ যথেষ্ট সহৃদয়তার সাথে দেখতে শুরু করেন। প্রতাপগড় জেলার কিষাণ সভা ডেপুটি কমিশনারের বিবেচনার জন্য প্রায় এক লক্ষ কৃষকের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে। এ বাবদ প্রতিটি কৃষকের কাছ থেকে এক আনা করে ফি নেয়া হয়।

কিন্তু আগষ্ট মাসে (১৯২০) মেহতা ছুটি নিলে তালুকদাররা চুরির মিথ্যা অভিযোগ এনে বাবা রামচন্দ্র এবং ৩২ জন কিষাণকে গ্রেপ্তার করালো। সংবাদ পেয়ে আশেপাশের কিষাণরা রামচন্দ্রের মুক্তির দাবীতে দলে দলে জড় হতে লাগল। দশদিনের মধ্যে এই সংখ্যা প্রায় ষাট হাজারে দাঁড়িয়ে সরকারের পক্ষে আইন-শৃঙ্খলার বিবাদের কারণ হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত মেহতাকে ছুটি বাতিল করে সরকার ডেকে পাঠালেন এই সংকটের আপোষ-মীমাংসার জন্য। মেহতা কর্মস্থলে ফিরে দ্রুত মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন এবং তালুকদারদের অন্যায় মতলবের বিরুদ্ধে সতর্ক করলেন। কিষাণদের এই বিজয় স্বভাবতঃই তাদের মধ্যে এক নতুন আত্মপ্রত্যয়ের ভাব সঞ্চার করল। অসহযোগ আন্দোলন যুক্তপ্রদেশে জন্ম দিল এক নতুন আপোষ-বিরোধী কিষাণ সভার। ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর প্রতাপগড়ে এই নতুন কিষাণ সভার নাম হল, অযোধ্যা কিষাণ সভা (Oudh Kishan Sabha)। প্রদেশের প্রায় ৩৩০টি কিষাণ সভা এই নতুন সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হল। সভা প্রথমেই কিষাণদের বেদখলী জমি চাষ করতে বারণ করল এবং কোনোভাবেই যেন তারা বেগার শ্রম না দেয় সে ব্যাপারে ভাল করে তাদের বোঝালো। যারা এই সব কথা শুনবে না তাদের বয়কট করার ভয় দেখানো হল এবং একই সাথে বলা হল পারস্পরিক সমস্যা বা বিবাদ যেন পঞ্চায়েতের মারফত মীমাংসা করে নেয়া হয়। যুক্তপ্রদেশে (ইউ. পি.) প্রথম বিরাট ভাবে কৃষকদের জমায়েত হল ফৈজাবাদের কাছে অযোধ্যায়। দু'দিনের (৩০-৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২০) অধিবেশনে প্রায় এক লক্ষ কৃষক জমায়েত হয়েছিল। এই অধিবেশনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে জমায়েতে এসেছিল।

১৯২১ সালের জানুয়ারী থেকে কৃষক আন্দোলনের ভংগী ক্রমশঃ জঙ্গী হতে

লাগল। শুরু হল জোতদারদের গোলা লুঠ, হাট থেকে জোর করে ফসল কেড়ে নেয়া এবং পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ। সব সময়ে যে কিষাণসভা এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছিল—তা' নয়, কোথাও কোথাও কৃষকরা অসংগঠিতভাবে অভাব আর শোষণের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই এগিয়ে এসেছে। বেশির ভাগ ঘটনাগুলিই ঘটেছিল রায়বেরিলি, ফৈজাবাদ এবং সুলতানপুরে, যেখানে প্রধানতঃ কৃষক আন্দোলন অধিকতর জোরদার ছিল। ইংরেজরাও চুপ করে বসে থাকেনি। সমস্ত ধরনের শক্তি প্রয়োগ করে, যেমন, জেল, গুলী, লাঠি চার্জ—সব কিছু দিয়ে এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত আন্দোলনকে দমন করতে তারা বদ্ধপরিকর ছিল। এতেও নিশ্চিন্ত না হতে পেরে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার আন্দোলন, জমায়েত, মিটিং সব কিছু বন্ধ করার জন্য কালা কানুন (সেডিশাস মিটিংস অ্যাক্ট) প্রয়োগ করল। সরকার অবশ্য এরই সাথে কৃষকদের অভাব-অভিযোগের গুরুত্বকে হ্রাস করার জন্য অযোধ্যার খাজনা আইনের কিছুটা সংশোধন করলেন। যদিও মূল সমস্যা ও অভিযোগের কোনো সমাধান এই আইনে ছিল না তথাপি আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস করতে এই সংশোধিত আইন [Oudh Rent (Amendment)] অনেকটা সাহায্য করেছিল, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু বছর (১৯২১) শেষ না হতে হতেই যুক্তপ্রদেশে আবার কৃষক বিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এবারে এর কেন্দ্রগুলি ছিল উত্তরের হরদোয়া, বাহারিচ এবং সীতাপুর। সূচনাতে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন কংগ্রেস ও খিলাফত নেতারা। এই আন্দোলেন "একা" বা ঐক্য নামে পরিচিত। অভিযোগের প্রধান কারণ ছিল প্রদেয় খাজনার চেয়ে ৫০ শতাংশ বলপূর্বক বেশি আদায়। সরকারের কাছ থেকে যারা খাজনা আদায়ের ইজারা নিয়েছিল সেই সব ঠিকেদাররা নিজেদের অত্যধিক লাভের আশায় এইভাবে জবরদস্তি করে খাজনা আদায় করত অসহায় কৃষকদের কাছ থেকে। অত্যাচার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে শেষ পর্যন্ত কৃষকরা মরিয়া হয়ে সশস্ত্র পথ বেছে নিল। ভূস্বামীদের সম্পত্তি, জমি জোর করে অনেক জায়গায় এরা দখল করে নিল। জমিদাররা পাল্টা লেঠেল পাঠালে তাদেরও এরা শক্তির সাথে মোকাবেলা করল। এইসব জঙ্গী কৃষক নেতাদের অন্যতম ছিলেন পাসী মাদারি এবং সাহরেব। এঁরা দু'জনেই তথাকথিত নিম্নবর্ণ থেকে এসেছিলেন।

যদিও যুক্তপ্রদেশের কৃষক আন্দোলনে পুরোপুরি সংগঠনের সুশৃঙ্খল ছবি

তখনও পর্যন্ত ফুটে ওঠেনি কিন্তু তৎ সত্ত্বেও মেজাজ এবং লক্ষ্য যে ক্রমশঃ সামন্ত শোষণ ও মহাজন-বিরোধী হয়ে পড়ছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু যুক্তপ্রদেশে যা' ছিল অসংগঠিত ও ইতঃস্ততঃ কৃষক আন্দোলন দক্ষিণের গোদাবরী অঞ্চলে আদিবাসীদের হাতে তাই নিল এক সশস্ত্র ইংরেজ-বিরোধী লড়াইয়ের সাহসিক উদাহরণ। গোদাবরী নদীর উত্তর দিকে উপজাতি অধ্যুষিত "রাম্পা" অঞ্চলে আললুরি সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে গেরিলা কায়দায় এই লড়াই শুরু হয়েছিল ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে। বিদ্রোহের শিখাটি নির্বাপিত হয়েছিল প্রায় দু'বছর পরে (মে, ১৯২৪)। অভিযোগের মূল কারণগুলি ছিল, মহাজনী শোষণ, অরণ্য-আইনের দ্বারা উপজাতিদের বহুদিন থেকে ভোগ-করা সুযোগ-সুবিধা হরণ এবং সর্বোপরি চাষের জমির সংকোচন। অভিযোগের শুকনো বারুদে আগুন লাগল যখন গুড়েমের অত্যাচারী তহশীলদার বাসতিয়ান জোর করে জঙ্গলের রাস্তা তৈরীর জন্য আদিবাসীদের বেগার খাটাবার চেষ্টা করল। এরই প্রতিবাদে আদিবাসীদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন সীতারাম রাজু—যিনি বাহির থেকে এসে ১৯১৫ সাল থেকে স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে মেলামেশা করছিলেন। রাজু নিজেকে একজন জ্যোতিষ এবং চিকিৎসক হিসেবে দাবী করতেন। অসহযোগ আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হয়ে উপজাতিদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। পঞ্চায়েতের ভাবধারা ও মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে তিনি তাদের বোঝাতেন। পুলিশের গুলী তাঁকে বিদ্ধ করতে পারবে না বলে রাজু দাবী করতেন। রাজুর আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য : মিটিং মিছিলে তিনি গান্ধিজীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলতেন হিংসার প্রয়োজন আছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন, ইংরেজদের হত্যা করতে পারছেন না এই কারণে যে তাদের সাথে সব সময়ে ভারতীয়রা প্রহরী হিসেবে চলাফেরা করে। প্রকৃতপক্ষে ১৯২২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর এ ধরণের একটি ঘটনাও ঘটেছিল। প্রথমে ভারতীয় প্রহরীদের পার হয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে গোপন আস্তানা থেকে পেছনের দু'জন ইংরেজ কর্মচারীকে গুলী করে হত্যা করে রাজুর-বিদ্রোহী বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছিল দামারা পল্লীতে। রাজুর বিদ্রোহী বাহিনী প্রায় আড়াই হাজার বর্গমাইল ব্যাপী অঞ্চলে যখন তখন পুলিশ ঘাঁটি আক্রমণ করে প্রতিপক্ষের মনে এক দারুণ উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজ সরকার মালাবার স্পেশাল পুলিশ এবং আসাম রাইফেলস বাহিনীর সাহায্য নিয়ে প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা খরচ করে এই বিদ্রোহ দমন করল। ১৯২৪ সালের ৬ই মে

রাজু ধৃত হন এবং পুলিশ তাঁকে গুলী করে হত্যা করে। যদিও বানানো রিপোর্টে বলা হয়েছিল "পলায়মান অবস্থায় গুলীবিদ্ধ" হন।

বিশের শতকে রাজস্থানেও ভূস্বামী-বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ভীল উপজাতীদের আন্দোলন প্রতিহত করার জন্যে মেবার পুলিশ পুরো দু'টো গ্রামকেই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। অত্যাচারের এই ঘটনাটি ঘটে ১৯২২ সালের মে মাসে। ১৯২৫ সালে আলোয়ার রাজ্যে চড়া হারে (৫০ শতাংশেরও বেশি) খাজনার প্রতিবাদে কৃষকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে সেই বিদ্রোহ পুলিশ প্রায় গণহত্যার মাধ্যমে দমন করল। অবশ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সরকারীভাবে তখনও পর্যন্ত দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরে কোনো রকম আন্দোলন গড়ে তুলতে অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাপ ওই সব রাজ্যেও বেশ ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। বিজয়সিং পাঠক, মানিকলাল ভার্মা এবং হরিভাউ উপাধ্যায় প্রমুখ কৃষক নেতারা গান্ধিজী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের অস্ত্রই ওইসব অঞ্চলে প্রয়োগ করেছিলেন।

শুধু বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ বা মাদ্রাজ নয়, করবন্ধ, খাজনা বন্ধের প্রস্তাব দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছিল। কেরালার মালাবার জেলার মোপলা কৃষকরা সমস্ত রকম শোষণের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়ালো। বিক্ষোভের জঙ্গী বহিঃপ্রকাশ দেখা দিল ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে। কিন্তু তারও পূর্বে আন্দোলনের ভিত্তি তৈরী হয়েছিল ১৯২০ সালের এপ্রিলে মঞ্জেরীতে মালাবার কংগ্রেসের জেলা কনফারেন্সের মাধ্যমে। কনফারেন্স খিলাফত আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার অনুকূলে প্রস্তাব নিল। কংগ্রেস দাবী জানাল জমিদার এবং প্রজার সম্পর্ককে সঠিক ভিত্তির উপর রেখে সরকারী উপযুক্ত আইন প্রণয়নের। মঞ্জেরী কনফারেন্সের পর কোজিগড়ে প্রথম প্রজা (tenant) সমিতি স্থাপিত হল এবং কিছুদিনের মধ্যে জেলার বিভিন্ন স্থানে এ ধরণের সমিতি গড়ে উঠল।

একই সাথে খিলাফত আন্দোলনও মালাবারে বিস্তৃত হচ্ছিল। জেলার অধিকাংশ কৃষক মুসলমান হওয়ায় খিলাফতের বক্তব্যও তাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। বস্তুতঃ প্রজাদের যে কোনো মিটিং-এ জোতদার-জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে বক্তব্যের সাথে খিলাফতের ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক দাবীগুলি এক অদ্ভুতভাবে মিশে গেছল। ফলে মোপলা কৃষকদের অর্থনৈতিক দাবীগুলির সাথে সাথে একটি ধর্মীয় সামাজিক ভিত্তি গড়ে উঠেছিল—যা ওই অঞ্চলের হিন্দুদের ছিল না। হিন্দুরা স্বভাবতঃই আন্দোলনের জোয়ার থেকে পিছিয়ে পড়েছিল এবং

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তা' ছাড়া হিন্দুরা যথেষ্ট সংখ্যালঘিষ্ঠ (প্রায় ৮০ শতাংশ ছিল মুসলমান) হলেও জমির মালিকানা ও মহাজনী কারবারের সিংহ ভাগ তাদের হাতেই ছিল।

ইতিমধ্যে খিলাফত তথা প্রজা আন্দোলনে শংকিত হয়ে সরকার ১৯২১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী খিলাফত মিটিং বন্ধ করে এক আদেশ জারী করল। ১৮ই ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার হলেন প্রধান প্রধান খিলাফতপন্থী ও কংগ্রেস নেতারা। যাঁদের মধ্যে ছিলেন ইয়াকুব হাসান, ইউ. গোপাল মেনন, পি. মৈউদ্দীন কয়া এবং কে. মাধবন নায়ার। এই সব গ্রেপ্তারের তাৎক্ষণিক ফল হল। আন্দোলন স্থানীয় চরমপন্থী নেতাদের হাতে চলে গেল। কৃষকদের ন্যায্য দাবীগুলির সাথে স্থানীয় নেতাদের বক্তব্যে ধর্মও প্রাধান্য পেতে লাগল। আলী মুসলিয়ার বললেন, অচিরেই মুস্লিম রাষ্ট্র তৈরী হবে—যেখানে খরচা সাপেক্ষ মামলা-মোকদ্দমা থাকবে না। প্রত্যেকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করবে না। মোপলা কৃষকরা এই সমস্ত চরমপন্থী নেতাদের বক্তব্যের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। এ সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের নাজেহাল হয়ে পড়ার গুজবও তাদের ইংরেজ বিরোধিতায় আরও সাহস জোগালো। একদিকে জমিদারী শোষণ ও অন্যদিকে সরকারী নানা দমনমূলক আইন মোপলাদের যখন খুবই ক্ষুব্ধ করে রেখেছিল—ঠিক তখনই এরনাড (Ernad) তালুকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি হিংসা-পরায়ণ আচরণ চাপা আক্রোশকে সরাসরি সহিংস বিক্ষোভের পথে টেনে নিয়ে গেল। ঘটনাটি ঘটল ১৯২১ সালের ২০শে আগষ্ট যখন জেলাশাসক ই. এফ. টমাস (E. F. Thomas) একদল সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তিরুরঙ্গাদি (Tiru-rangadi)-র মসজিদে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়ল খিলাফত নেতা আলী মুসালিয়ারকে গ্রেপ্তার করার জন্য। মসজিদের উপাসক বা মুল্লা এই খিলাফত নেতা ছিলেন অসম্ভব জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। যাই হোক, আলী মুসালিয়ারকে পাওয়া গেল না। মসজিদের মধ্যে যে সব স্বেচ্ছাসেবক অবস্থান করছিল তাদেরই তখন গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু এদের সংখ্যাও মাত্র তিনজনের বেশি ছিল না। তিরুরঙ্গাদিতে অবস্থিত মসজিদে পুলিশের বিনা প্ররোচনায় প্রবেশ মোপলাদের ভাবপ্রবণতায় দারুণভাবে আঘাত হানল। তারপর মুসালিয়ারকে গ্রেপ্তারের চেষ্টার খবর তাদের আরো উত্তেজিত করে তুলল। কোট্টাক্কল (Kottakkal), তান্নুর এবং পারাপ্পানাগদি (Parappanagadi) থেকে মোপলারা দলে দলে তিরুরঙ্গাদিতে এসে জড় হল। তারা স্থানীয় ইংরেজ অফিসারের সাথে দেখা করে বন্দী স্বেচ্ছাসেবকদের মুক্তির দাবী জানাল। মুক্তির

ন্যায্য দাবী মেনে নেয়ার পরিবর্তে সমবেত নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ জনতার উপর অতর্কিতে পুলিশ গুলী বর্ষণ করে বেশ কিছু লোককে হত্যা করে বসল। যারা ছিল শান্ত এবং আলোচনায় ইচ্ছুক তারাই এখন প্রতিহিংসায় উন্মাদ হয়ে উঠল। সরকারি অফিসে অগ্নি সংযোগ করা হল, ছিঁড়ে ফেলা হল যত রাজস্ববিষয়ক কাগজ-পত্র এবং খাজাঞ্চি খানার অর্থ লুণ্ঠিত হল। বস্তুতঃ মোপলারা এবার যুদ্ধের পথে নামল। এরনাদ, ওয়াল্লুওয়ানাদ (Walluvanad) এবং পোন্নানি তালুক গুলো—মোপলাদের সমস্ত শক্ত ঘাঁটিগুলোয় সরকার-বিরোধী বিদ্রোহের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

বিদ্রোহের প্রথম চোটটা এসে পড়ল সরকারী কর্তৃত্বের প্রতীক কাছারী বাড়ী, খাজাঞ্চিখানা, পুলিশ ঘাঁটি এবং সর্বোপরি প্রজাশোষক জমিদারদের উপর—যাদের অধিকাংশই ছিল ঘটনাক্রমে হিন্দু। এদের হাত থেকে ইউরোপীয়ান বাগিচার মালিকরাও অব্যাহতি পেল না। তবে একটা কথা স্বীকার করা উচিত এরই মধ্যে যে সব জমিদার ছিলেন কিছুটা ভাল এবং যে সব হিন্দুরা ছিল খুবই দরিদ্র তাদের উপর অত্যাচার প্রায় হয়নি বলা চলে। তবুও যে কিছু সংখ্যালঘু নিগৃহীত হয়নি বা মারা যায়নি একথা বলা যাবে না—তবে তাদের সংখ্যা প্রতিক্রিয়ার তুলনায় যথেষ্টই কম বলতে হবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বিদ্রোহী মোপলারা চার লক্ষ হিন্দু অধ্যুষিত এক বিরাট অঞ্চলকে প্রায় তিন মাস নিজেদের কব্জায় রেখেছিল। সে সময়ে আর্যসমাজের ভাষ্য অনুযায়ী (যা' যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রাখে) ৬০০ হিন্দু মারা গেছল এবং আড়াই হাজার ধর্মান্তরিত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে এদের মধ্যে আবার অনেকে পুলিশের গুপ্তচর এবং ঘৃণিত মহাজনও ছিল। বিদ্রোহের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে প্রথম বলপূর্বক ধর্মান্তরিত-করণের ঘটনাটি ঘটে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষকের লেখা (কে. এন. পানিক্কর) থেকে জানা যায় এক মোপলা বাহিনী ২৩ মাইল ব্যাপী হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল অতিক্রম করে কেবল এক অত্যাচারী হিন্দু জমিদারের রাজস্ব-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র ধ্বংস করার জন্য। বিস্ময়ের ব্যাপার ওই দীর্ঘ এলাকা অতিক্রম করার সময়ে কোনো হিন্দু পরিবারের গায়ে হাত তো পড়েইনি—এমন কি ওই অত্যাচারী হিন্দু জমিদার পরিবারেরও নয়। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার মোপলাদের প্রথম দলটিকে ইংরেজরা গ্রেপ্তার করে যাদের মধ্যে একজন নাম্বুদ্রী এবং চারজন নায়ার ছিলেন। (কোয়েম্বাটুরের জেলা জজের পত্র; ভাইসরয়কে সেক্রেটারী অব ষ্টেটের পত্র, ৩রা নবেম্বর, ১৯২১)

মোপলা বিদ্রোহকে ইংরেজরা যুদ্ধ হিসেবেই দেখেছিল। ২৬শে সেপ্টেম্বর

এক ব্রিটিশ সামরিক অফিসার তাঁর রিপোর্টে লেখেন, "পরিস্থিতি এখন সুস্পষ্ট-ভাবে যুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।" তাঁর মতে মোপলা সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজারে দাঁড়িয়েছে এবং যেহেতু এরা গেরিলা কায়দায় লড়াই চালাচ্ছে তাই আরও গোলন্দাজ সৈন্যের সাহায্য প্রয়োজন এবং এই অতিরিক্ত সাহায্য আসতেও এতটুকু বিলম্ব হয়নি।

নিছক বন্দুকের জোরে মোপলা বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা থামিয়ে দিয়েছিল। এক অকল্পনীয় সাম্রাজ্যবাদী নৃশংসতা এই বিদ্রোহের অবসান ঘটালো ১৯২২ সালের জানুয়ারী নাগাদ। মোপলাদের মৃতের সংখ্যা সরকারী ভাবে ২,৩৩৭ জন হলেও বেসরকারীভাবে এই সংখ্যা ১০,০০০ হাজার ছাড়িয়ে গেছল। ৪৫,৪০৪ জন বিদ্রোহী ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়েছিল অথবা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। বন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছিল। গরু-ছাগলের মত রেলের ওয়াগনে ভর্তি করে দমবন্ধ অবস্থায় বন্দীদের স্থানান্তরিত করা হল—এই রকম পরিস্থিতিতে এক ওয়াগন ভর্তি বন্দী সত্য সত্যই নিঃশ্বাস না নিতে পেরে পোডানুর রেল স্টেশনের কাছে মারা গেল।

আর সবচে দুঃখের বিষয় যে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন মোপলাদের উদ্দীপ্ত করেছিল সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে অসীম নির্যাতনকে বরণ করে নিতে। সেই আন্দোলনের নেতারা অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মোপলাদের বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানকে কঠিনভাবে সমালোচনা করলেন। এর যে কি ভয়ানক প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে হয়েছিল—তা' বোধহয় সেদিনের জাতীয় নেতারা উপলব্ধি করতে পারেননি। নেতাদের দ্বারা পরিত্যক্ত অত্যাচারিত মোপলারা স্বাভাবিকভাবেই হতাশ হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে রইল। মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরা এর পূর্ণ সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস তথা হিন্দুবিরোধী প্রচারে নামল। ফল হল মারাত্মক। ত্রিশের দশকে তৎকালীন কংগ্রেস কর্মী ও পরবর্তীকালে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা কমঃ এ. কে. গোপালন (A. K. Gopalan) যখন গান্ধিজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মালাবারে সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আসেন তখন তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে মুসলমানরা দেশী মদের দোকানে পিকেটিং করার সম্মতি দিলেও কংগ্রেস দল হিসেবে শক্তিশালী হয়ে উঠুক এটা তাঁরা চাইতেন না! "এর অর্থ তাঁদের কাছে বিদেশীদের বহিষ্কারের পর হিন্দু আধিপত্য। যেমন, ইরিক্কুরে (Irikkoor) তাঁরা কোনো মিটিং করতে দেননি। অন্যান্য মুসলমানকেন্দ্রগুলি থেকেও অনুরূপ বাধা এসেছিল। তাঁদের স্মরণে ছিল ১৯২১

সালের অত্যাচার এবং দুঃখকষ্ট। তাঁদের কাজ ছিল জনসভার জন্ত স্থান না দেয়া। একটা কথা চালু করে দেয়া হয়েছিল যে কংগ্রেস হিন্দুদের সংস্থা যাঁরা মুসলমানদের তাঁবে রাখতে চায়। বিশেষ করে তাঁরা কংগ্রেসী মুসলমানদের ঘৃণা করতেন। এরনাদ (Ernad) উপ-জেলায় কোনো মিটিং বা পিকেটিং করাই সম্ভব হয়নি।" (ইন দি কজ অব দি পিপল ; এ. কে. গোপালন, পৃ. ২৬ ; সংস্করণ, ১৯৭৬) মনে রাখা প্রয়োজন এই এরনাদ ছিল অসহযোগের সময়ে মোপলা বিদ্রোহের অন্যতম ঝটিকা কেন্দ্র।

নির্যাতিত মোপলাদের পাশে দাঁড়াতে না পারার সেদিনের কংগ্রেসী ব্যর্থতার অভিশাপ স্বাধীন ভারতে সিন্ধবাদের বোঝার মত ওখানের গণতান্ত্রিক মানুষকে বহে বেড়াতে হচ্ছে আজও। কেরালার মধ্যে মুসলিমলীগের মত সাম্প্রদায়িক দলের মালাবার অঞ্চলে কেন এত শক্ত ঘাঁটী তারও ব্যাখ্যার একটা হদিশ হয়ত এই ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। [মোপলা বিদ্রোহসহ অন্যান্য কৃষক আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ-তালিকা, মডার্ণ ইণ্ডিয়া ; সুমিত সরকার ; পৃ. ৪৭০ ; দি টেলিগ্রাফ, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ (মৃদুলা মুখার্জীর প্রবন্ধ) ; এ হিস্ট্রী অব ইণ্ডিয়া ; ২য় খণ্ড ; সোবিয়েত প্রকাশনা]

যাই হোক, অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে ভারতের গ্রামগুলিতে একটা ধারণাই জন্মে গেছল, "গান্ধী-রাজ" এসে গেছে। সুতরাং জমিদারের খাজনা বা মহাজনের পাওনা দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। হীতেশরঞ্জন সান্যাল মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলের গান্ধী আন্দোলনে যোগদানকারী বহু মানুষের (বর্তমানে যাঁরা বৃদ্ধ বা অতি-বৃদ্ধ) সাথে দেখা করে জানতে চেয়ে ছিলেন, কেন তাঁরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন? এ বিষয়ে বাঁকুড়া জেলার মসিনাপুর গ্রামের খেতমজুর হরিপদ যা' উত্তর দেন সেটিই ছিল সেদিনের সাধারণ মানুষের মনের কথা। মণ্ডল ম'শায় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এই কথা ভেবে যে দেশ স্বাধীন হলে "খাজনা ট্যাকস বন্ধ হবে, নুন ঝাল যাবতীয় কিছু সস্তা হবে।" (হরিপদ মণ্ডলের সংগে সাক্ষাতকার ; "জনগণ, কংগ্রেস ও গান্ধিজী" "দেশ" কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা) হরিপদ মণ্ডলের মত খেত মজুররাই নন তাঁদের যাঁরা নেতৃত্ব দিতেন গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় নেতারাও মানসিক দিক থেকে বিপ্লবাত্মক মনোভাবের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। আরামবাগের জরুর গ্রামের বাদল মাঝি ছিলেন গরীব গৃহস্থ ঘরের ছেলে। তিনিও বুঝেছিলেন স্বাধীনতা পেলে স্বচ্ছন্দে খাওয়া-পরার একটা সুব্যবস্থা হবে। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা কালীপদ সিংহ রায় মাঝি মশায়কে বুঝিয়ে বললেন, "দেশের লোকে খেতে পায়

না, বাদল তোরা লাগবি না র‍্যা। কোনো কথা নাই, বৃটিশকে তাড়াতে হবে। বিদেশী, লোককে খেতে দেয় না। এদেরকে তাড়ালে দেশের লোক খেতে পাবে, ধান-চাল হবে, জল হবে, বহু উপকার হবে।" (বাদল মাঝির সাথে সাক্ষাতকার; ঐ) গান্ধিজীর আন্দোলন যদি বাংলার দরিদ্র চাষীর কাছে খাজনা থেকে রেহাই এবং মোটা ভাত-কাপড়ের আন্দোলন বলে মনে হয়ে থাকে তবে মহারাষ্ট্রের নিরক্ষর কলে-কারখানায় খেটে-খাওয়া মজুরের কাছেও আন্দোলনের ছবি ওই একই অভিজ্ঞতা বহন করে এনেছিল। পার্লমিলের শ্রমিক অর্জুন আত্মারাম আলাউই (Arjun Atmaram Alwe) বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। "সে সময়ে আমরা শ্রমিকেরা স্বরাজের দাবি বলতে বুঝতাম: আমাদের ঋণগ্রস্ত অবস্থার অবসান, মহাজনী অত্যাচারের বিলুপ্তি, মজুরী বৃদ্ধি এবং আইন করে বন্ধ হবে শ্রমিকের উপর মালিকের অত্যাচার—ফলে শ্রমিকদের উপরও নির্যাতন শেষ হবে।" (উদ্ধৃতির জন্য, রবীন্দর কুমার, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ; পৃ. ২৫৪)

জুডিথ ব্রাউন তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থতে ("গান্ধিজ রাইজ টু পাওয়ার") গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও গোত্রের পরস্পর-বিরোধী ভূমিকা এবং নিম্ন পর্যায়ের সদস্যদের নেতা যাদের তিনি "সাব-কণ্ট্রাকটার" বলে অভিহিত করেছেন, তাদের দল-বিরোধী ভূমিকা (?) প্রচুর পরিশ্রম সহযোগে বর্ণনা করেছেন। এরকম বর্ণনা ইদানীং আরো কিছু ভারতীয়-অভারতীয় ইতিহাসবিদ করছেন। উদ্দেশ্য, প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা করে গান্ধিজীর উপর বিভিন্ন শ্রেণীর প্রভাব এবং পাল্টা প্রভাব কি ধরনের কাজ করেছিল, তা' দেখানো। (কৌতূহলী পাঠক নিম্নোক্ত ইতিহাসবিদদের লেখা পড়তে পারেন; রবীন্দর কুমার, শহীদ আমিন, জ্ঞান পাণ্ডে, রনজিত গুহ, জুডিথ ব্রাউন, ডেভিড হার্ডিম্যান, ডেভিড পেজ) কিন্তু উপরোক্ত ইতিহাসবিদরা গান্ধিজীর আন্দোলনে এ ধরনের পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর অবস্থান সঠিক ছিল কিনা অর্থাৎ গান্ধিজী এদের একই আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনে ভুল করেছিলেন না ঠিক করেছিলেন এ সম্পর্কে তাঁরা তাৎপর্যপূর্ণভাবে নীরব। চীন, ভিয়েতনামের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের সাথে পরিচিত ইহিতাসের ছাত্র মাত্রই জানেন কি ভাবে ১৯৩৬ সালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনে মাও-সে-তুঙ কমপ্রাডোর, ব্যুরোক্রাট ও যুদ্ধবাজ সামন্ত প্রভুদের নেতৃত্বে গঠিত কুয়োমিনতাঙ পার্টির সাথে হাত মিলিয়ে এক বিরাট জাতীয় শক্তিজোট গড়ে তুলেছিলেন। হো-চিমিন

ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে দেশপ্রেমিক জমিদারদের পর্যন্ত সামিল করেছিলেন।

চীনে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলেও মাও-সেতু-ঙ এইসব প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর সম্ভাব্য অস্বস্তি সম্পর্কে পুরো ওয়াকিবহাল ছিলেন। মাও-সে তুঙ (Mao-zedong) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন তাঁর লেখায় যে, জাতীয় বুর্জোয়া এক দোদুল্যমান শ্রেণী। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে এই শ্রেণী। এর দক্ষিণ পক্ষ হয়ত বিপ্লবের শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আবার বামপক্ষ হয়ত বিপ্লবের বন্ধুতেও পরিণত হতে পারে। তাঁর পরামর্শ ছিল এ সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা। (১৯২৬ সালের মার্চ মাসে লেখা প্রবন্ধ : মাও-সে-তুঙ ; অ্যান ফ্রেমানটাল ; পৃ. ৫১-৫৯ ; আমেরিকা, ১৯৬২)

প্রশ্নটা তাই পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর অবস্থান নয়—এ সম্পর্কে দীর্ঘ তথ্য আহরণ অথবা সংখ্যাতত্ত্ব নতুন কোনো অভিনব সংবাদ আমাদের কাছে সংযোজন করে না। প্রশ্নটা হল আন্দোলনে কোন্ শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল ? একথা সুবিদিত জাতীয় বুর্জোয়ার বামপক্ষ তার উচিত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং এ কারণেই শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ পক্ষের চাপে আন্দোলনে এসেছিল পশ্চাদপসারণ। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও আন্দোলনের মধ্যে মাওয়ের উক্তি ধার করে যাকে বলা যায় "বিপ্লবী অভ্যুত্থান"—ফুটে উঠেছিল সুস্পষ্টভাবে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও মহাজন-বিরোধী এক শ্রেণী-সংঘর্ষের ছবি। আর সে কারণেই বোধ হয় এলিট বা উচ্চ বর্গ শ্রেণীর তথা-কথিত গৌরবজনক ভূমিকার প্রবক্তা জুডিথ ব্রাউন তাঁর লেখায় শ্রেণী সংঘর্ষের বর্ণনার বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নীরব থেকেছেন। তাঁর কাছে জাত-পাতের সংঘর্ষই প্রধান হয়ে উঠেছে। এমন কি বিস্ময়ের ব্যাপার গান্ধিজী সম্পর্কে যে বিশাল জীবনী গ্রন্থ ডি. জি. তেণ্ডুলকারের "মহাত্মা" (৮ম খণ্ড), যার দ্বিতীয় খণ্ডে অসহযোগ আন্দোলনের বছরগুলির বর্ণনা আছে (১৯১৯-১৯২৯) এবং যার সংগৃহীত মাল-মশলা গান্ধিজী স্বয়ং অনুমোদন করেন, সেই গ্রন্থটি তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি, হয়ত দৃষ্টির বাইরেই পড়ে থাকবে কারণ তাঁর প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী অথবা নির্দেশিকায় কোথাও এই দ্বিতীয় খণ্ডে ('মহাত্মা")-র উল্লেখ নেই।

অথচ তেণ্ডুলকার ১৯২১ সালের বর্ণনা শুরু করছেন—"গান্ধিজী উদ্ভাবিত নতুন প্রোগ্রাম এবং নীতি কংগ্রেসের পক্ষে বিরাট অগ্রগতির সূচনা করল। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার পক্ষে একটি শক্তি-শালী রাজনৈতিক দল হয়ে দাঁড়াল। শুধু যে অসহযোগ আন্দোলনের দ্রুত

প্রসারের মাধ্যমে প্রোগ্রামের বা কর্মস্থচীর সাফল্য সূচনা করল তাই নয় একই সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের সংগ্রামের মধ্যে দিয়েও তা প্রমাণ করল। পাঞ্জাবে সরকার আশ্রিত মোহান্তদের বিরুদ্ধে আকালী কৃষকরা বিদ্রোহ করল। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে গুরুদ্বারের জমায়েতে শান্তিপূর্ণ শিখ তীর্থযাত্রীদের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করা হল এবং অনেককে গুলী করে হত্যা করা হল। আকালী আন্দোলন দেশের নব জাগরণের ফলশ্রুতি। এপ্রিলে মহারাষ্ট্রের মুলসির কৃষকরা হুমকী দিল যদি তাদের অভিযোগ শোনা না হয় তাহলে তারা সত্যাগ্রহ করবে। গান্ধী টাটাদের বিরুদ্ধে গরীবদের পক্ষে লিখলেন: "আমার হৃদয় গরীবদের দিকে। আমি আশা করব মহান টাটারা আইনের অধিকারের উপর না দাঁড়িয়ে কর্মচারীদের বোঝার চেষ্টা করবেন।" শ্রমিকদের মধ্যে জঙ্গী মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। অসন্তোষ সারা ভারতে বিস্তৃত হচ্ছিল।... অহিংসার নীতি সত্ত্বেও দেশের বেশ কিছু স্থানে হিংসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল।" (মহাত্মা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১) শুধু শ্রমিক, কৃষক নয়, যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা যত সংকুচিত হতে লাগল তত ইংরাজী শিক্ষায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব তীব্র হতে লাগল।

এই রকম এক বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে খিলাফত আন্দোলকে কেবল এক সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় ভাবধারার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না পাঞ্জাবের অন্যায়ের সমাধান কেবলমাত্র পাঞ্জাবের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে খুঁজে বার করা। সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনে পাঞ্জাব শুধু এক প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

যে স্বরাজ গান্ধিজী এক বছরের মধ্যে এনে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—সে স্বরাজ হয়ত তিনি কনফারেন্স বা আলোচনার টেবিলে বসে আদায় করবেন বলে ভেবে থাকবেন কিন্তু সাধারণ মানুষ মনে করছে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে স্বরাজ আসবে (তার কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকলেও) তা' হল গান্ধীরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা। যখন কোনো পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থাকবে না। এর অর্থ জাতীয় পুঁজিপতি, জমিদার এবং রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা হারানো যা' কংগ্রেস এবং গান্ধিজীর পরিকল্পিত কর্মসূচী ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।

মনে রাখা প্রয়োজন রাওলাট আইন বিরোধী সত্যাগ্রহের সময়ে আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গান্ধিজীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজস্ব বন্ধ করে

দেয়ার। গান্ধিজী সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তাঁর স্বভাব সুলভ ভাষায় বলেছিলেন, "ভাইসাব, আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন আমি সত্যাগ্রহের ব্যাপারে একজন একসপার্ট বা পারদর্শী"। '১২১ সালের ফেব্রুয়ারীতে যখন যুক্তপ্রদেশে গান্ধিজী গেলেন তখন তিনি বিবেচনার সাথে কিষাণ সভাগুলির সংগে কোনো যোগাযোগ করলেন না। ৯ই মার্চ ১৯২১ সালে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" (Young India) পত্রিকা মারফত যুক্তপ্রদেশের (ইউ. পি.) বিক্ষুদ্ধ কৃষকদের কাছে আবেদন রাখলেন তাঁরা যেন সরকারী ট্যাকস বা জমিদারের খাজনা বন্ধ না করেন। কারণ একথা গান্ধিজীর পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না যে কলকাতা এবং নাগপুর কংগ্রেসে তাঁর পক্ষে বিশেষ করে কলকাতায় মেজরিটি বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ক্ষেত্রে ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আর্থিক সাহায্যের এক বিরাট অবদান ছিল। "দি বেঙ্গলী" (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২০) লিখেছিল বাংলার ভোট নির্ধারিত হয়েছিল মাড়োয়ারী এবং হিন্দুস্তানী ব্যবসায়ীদের দ্বারা, যারা এখানে ব্যবসার জন্য এসেছিল। "বোম্বে ক্রনিকল" (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২০) একই কথার পুনরুক্তি করেছিল। বোম্বাইয়ের ভোটও বাংলার মত এনে দিয়েছিল কাপড়ের ব্যবসায়ীরা। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন বাংলার গবর্নর (১৯২১ সাল, ৬ই জানুয়ারী) ভারত সচিব মণ্টেগুকে মাড়োয়ারীদের গান্ধিজীকে সমর্থনের কি কারণ ছিল তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখছেন, "মাড়োয়ারীরা গান্ধীর বিরাট সমর্থক এবং এই জন্যে তাঁর অসহযোগ নীতিকে সমর্থন করেন। এঁরা খুব রক্ষণশীল ও ভাবপ্রবণ এবং অতি সহজে গান্ধীর মত মানুষের দ্বারা পরিচালিত হন—যিনি তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পাশ্চাত্য সভ্যতা বিলোপের এবং দেশে হিন্দু আধিপত্যের সোনার দিনগুলো ফিরিয়ে আনার।" (উদ্ধৃতির জন্য, জুডিথ ব্রাউন, পৃ. ২৬৮) মাড়োয়ারীদের সমর্থনের আরও একটি কারণ হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে তা' হল অ-হিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দী ভাষা প্রচারে কংগ্রেসের সাহায্য। ১৯২০ সালের ১৬ই জুন "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকা থেকে জানা যায় কলকাতা এবং বোম্বাইয়ের মাড়োয়ারীরা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে হিন্দী প্রচারের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা কংগ্রেস ফাণ্ডে দিতে রাজী হয়েছেন। (উদ্ধৃতির জন্য, ঐ) সুমিত সরকার লিখছেন কলকাতা এবং নাগপুরে গান্ধীর গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এসেছিল সারা দেশময় ছড়িয়ে থাকা মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী এবং বণিকদের কাছ থেকে। ("Ciucial support for Gandhi came from the country-wide network of Marwarli businessmen and traders"; মডার্ণ ইণ্ডিয়া, পৃ. ১৯৮) তিনি অবশ্য এর সাথে খিলাফতপন্থী মুসলমান ও অন্যান্যদের কথাও বলেছেন।

যদিও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা একটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন গান্ধিজীকে অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য প্রদেশের ধনী ব্যবসায়ীরা গান্ধিজীকে কোনোরূপ অর্থ সাহায্য করেননি। আমেদনগরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিখছেন (৩০শে সেপ্টেম্বর—৭ অক্টোবর, পনেরো দিনের রিপোর্ট; ১৯২০) মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের মত ধনী গুজরাটী ব্যবসায়ীদেরও দেখা যাচ্ছে অসহযোগ করতে। শুধু মাড়োয়ারী, গুজরাটী কেন বোম্বাইয়ের খিলাফতপন্থী মুসলমান ব্যবসায়ীরাও গান্ধিজীর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সুতরাং বিশেষ কোনো অঞ্চলের বা ভাষাগোষ্ঠীর ধনীকে শ্রেণীকে দায়ী না করে এটা বলাই উচিত হবে গান্ধিজীর আন্দোলনে ভারতীয় ধনী ব্যবসায়ীদের একটি অংশ আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন অনেকাংশে পূরণ করেছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসের পর বাংলা "নায়ক" পত্রিকা (১২ই অক্টোবর, ১৯২০) মন্তব্য করেছিল কংগ্রেস ব্যবসায়ীদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য সে সম্পত্তির মালিকানায় অংশীদার হিসেবে পত্রিকাটি যুক্ত করেছিল দোকানদার এবং কৃষির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের। (উদ্ধৃতির জন্য, জুডিথ ব্রাউন; পৃ. ২৮০-২৮১) একই সংগে আরো একটি জিনিষ লক্ষণীয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গান্ধিজী সর্বভারতীয় একমাত্র শ্রমিক সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংগে কোনোরকম প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখেননি। এমন কি এর প্রথম অধিবেশনের (৩১শে অক্টোবর, ১৯২০, সভাপতি লালা লাজপত রায়) উদ্বোধন দিবসে যখন মোতিলাল নেহেরু, ভিটলভাই প্যাটেল, অ্যানি বেশান্ত এমন কি মহম্মদ আলি জিন্নাও উপস্থিত ছিলেন, তখন গান্ধিজী একটা শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণেরও প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁর সংগঠিত আমেদাবাদের শ্রমিক সংগঠন "মজুর মহাজন" (Majoor Mahajon)-কেও তিনি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংস্থা এ. আই. টি. ইউ. সি. (A. I. T. U. C.)-র সাথে যুক্ত করেন নি। (সুমিত সরকার, পৃ. ২০০)

যাই হোক, গান্ধিজীকে অর্থ সাহায্যের পেছনে জাতীয় পুঁজির একটি অংশের স্বার্থ সুস্পষ্টভাবে নিহিত ছিল। উচ্চাভিলাষী এই অংশটি ব্রিটিশ পুঁজির সাথে সরাসরি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে না চাইলেও তাদের উপর চাপ সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিল। অসহযোগ আন্দোলনে বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও স্বদেশী প্রচার কাপড়ের মিল-মালিকদের সামনে লাভের স্বর্ণ দিগন্ত খুলে দিয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। কলকাতার ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের মুখপত্র "ক্যাপিট্যাল" (১৩ই জুলাই, ১৯২২) লিখেছিল, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ভারতীয় মিল-

মালিকদের প্রভাব ও পণ্য বৃদ্ধির সুবিধা করে দিয়েছে। (সব্যসাচী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ; উদ্ধৃতির জন্য, ঐ; পৃ. ২০৮)

কিন্তু দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট যখন রাজনৈতিক সংকটকে আরো গভীর ও বিপজ্জনক করে তুলছে; যখন দেশের শ্রমিক ও কৃষকরা তাদের দাবীগুলিকে আরো তীব্র করে তুলছে; যখন আন্দোলনের স্রোত সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ-বিরোধিতার দিকে বাঁক নিতে চলেছে তখন গান্ধিজীকে ঘোষণা করতেই হবে, "স্থগিত রাখ"। কারণ সর্বাত্মক বিপ্লব গান্ধিজীর আদর্শ ও পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বাইরে। তিনি ইংরেজের চাপানো করের বিলুপ্তি চান না, তিনি চান কেবল তার বোঝা হ্রাস করতে। তিনি কোনো রক্তাক্ত বিপ্লব চান না, তিনি চান জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেবল বিপ্লব ঘটাতে। (গান্ধিজীর উক্তি লিবারেলদের প্রতি; তেণ্ডুলকার, মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃ. ৪৭) সুতরাং গান্ধিজীকে আলোচনার মধ্যেই যেতেই হবে—আর এ কারণেই তিনি আপোষের জন্য এত অধীর এবং অস্থির।

যে ১৯২১ সালকে গান্ধীজির অনুমোদিত জীবনীকার তেণ্ডুলকার গণ জাগরণ ও প্রাণ চাঞ্চল্যের বছর বলে চিহ্নিত করেছেন সেই ১৯২১ সালেই মে (May) মাসের ১৩ তারিখ থেকে ১৮ তারিখের মধ্যে তিনি ছ'বার ভাইসরয় লর্ড রিডিং-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন এর সবগুলি সাক্ষাতকারই ঘটেছিল গান্ধীজীর অনুরোধে, ভাইসরয়ের তরফে নয়। (মজুমদার; ২য় খণ্ড; পৃ. ১১৬) আগামী দিনের আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেও গান্ধিজীর প্রায় একই ধরনের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করব। কারণ গান্ধিজী তাঁর পরিকল্পিত ছক থেকে এতটুকু সরবেন না—পরিস্থিতির পরিবর্তন যাই হোক না কেন। জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সাথে তিনি কিছুতেই সংঘর্ষে নামতে প্রস্তুত নন।

একটা বিষয় লক্ষণীয়। গান্ধিজীর যে ছ'বছরের জন্য সাজা হল—তা' অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য নয়। ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় চারটি সরকার-বিরোধী প্রবন্ধ লেখার জন্য। (মহাত্মা, ২য় খণ্ড; পৃ. ৯৫) এত বড় সর্ব-ভারতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের মর্যাদার স্বীকৃতিটুকুও তারা গান্ধিজীর প্রতি প্রদর্শন করতে রাজী ছিল না। সুস্পষ্টভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখন থেকে আক্রমণমুখী। আরও মরীয়া এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ।

সবশেষে, চৌরিচৌরার তথাকথিত অহিংসতার জন্য গান্ধিজী আন্দোলন

প্রত্যাহার করে নিলেন। কিন্তু মোতিলাল নেহেরু প্রশ্ন তুলেছিলেন—চৌরি-চৌরার অপরাধের জন্য বারদৌলিকে শাস্তি পেতে হবে কেন? অর্থাৎ বারদৌলির জনগণ যখন স্বেচ্ছায় আন্দোলনে অহিংস সত্যাগ্রহী হিসেবে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল এবং সরকারের রাজস্ব বন্ধে যখন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল তখন কোন্ অপরাধে তাঁদের আন্দোলন বন্ধ করতে বলা হল? মোতিলাল নেহেরু গান্ধিজীর অপ্রত্যাশিতভাবে আন্দোলন প্রত্যাহারকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর কাছে বিস্ময় লেগেছে—"যদি কেপকোমোরিনের একটি গ্রাম অহিংসার নীতি পালন করতে ব্যর্থ হয় তো তার জন্যে হিমালয়ের নীচে অবস্থিত একটি শহর কেন শাস্তি পাবে?" (ঐ; পৃ. ৮৭) মোতিলাল বিস্মিত হতে পারেন; তবে জওহরলালকে লেখা গান্ধিজীর চিঠির মধ্যে (১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২) কোনো বিস্ময়ের অবকাশ ছিল না। তিনি সুস্পষ্টভাবে লিখছেন, "আমি তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আন্দোলন যদি প্রত্যাহার না করা হত, তাহলে আমি অহিংসার বদলে সহিংস আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতাম।"

আইন অমান্য আন্দোলন

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯২২। গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামে পুলিশের অত্যাচারে উত্তেজিত জনতা পুলিশ চৌকি আক্রমণ করে বাইশ জন পুলিশকে নিহত করল; ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে শত শত নিরীহ অহিংস সত্যাগ্রহীর নির্যাতন এমন কি হত্যার কথা বিস্মৃত হয়ে গান্ধিজী ইংরেজের বেতনভুখ পুলিশের মৃত্যুকে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা বলে স্বীকার করে নিলেন, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠক বসল, "চৌরিচৌরায় জনতার অমানুষিক কার্যাবলীর" তীব্র নিন্দা করে অসহযোগ আন্দোলনের উপর যবনিকা টেনে দেওয়া হল। গান্ধিজীর মতে দেশবাসী এখনও অহিংস সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়। জনগণ হিংসার ছোঁয়া থেকে মুক্ত নয়। তাদের কারাবাসের দ্বারা আমরা স্বরাজ জয় করতে পারব না। (মহাত্মা; ডি. জি. তেণ্ডুলকার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৮৫) অসহযোগ ও খিলাফতের দিনগুলিতে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি মৈত্রী বন্ধন গড়ে উঠেছিল। আন্দোলন আকস্মিক প্রত্যাহৃত হওয়ায় সেই মৈত্রী দুই সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থসন্ধানীদের প্ররোচনায় অচিরেই বিদ্বেষে পরিণত হল। স্মরণ করা যেতে পারে ১৯০০ সাল থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে যেখানে মাত্র ১৬টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে অর্থাৎ মাত্র ছ'বছরেই ৭২টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটল।

১৯২২ সালের মার্চ মাসে গান্ধিজী গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে ছ'বছরের কারাদণ্ড হল। নেতৃত্বহীন কংগ্রেস ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। চিত্তরঞ্জন দাস, মোতিলাল নেহেরু এবং এন. সি. কেলকার-এর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যেই একদল "স্বরাজ্যপার্টি" গঠন করলেন। উদ্দেশ্য ১৯১৯ সালের আইন অনুসারে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে আইন সভার অভ্যন্তরে বাধাদান। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে তাঁরা অংশ গ্রহণ করে জয়ীও হলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁরা তাঁদের নীতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করতে পারলেন, শেষ পর্যন্ত ১৯২৬ সালে স্বরাজ্যপার্টির স্বাভাবিক অবলুপ্তি ঘটল।

লর্ড আরউন ভারতে ১৯২৬ সালে ভাইসরয় মনোনীত হয়ে এলেন। তখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা "দিশাহারা"। জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতার পূর্ণ

সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ তার প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ নতুন উৎসাহে শুরু করে দিল। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজদের এই চণ্ডনীতি কোনো রকম প্রতিরোধের সম্মুখীন হল না। বিগত বছরগুলিতে সামান্য যেটুকু আর্থিক সুবিধা ভারতীয় বুর্জোয়াদের দেওয়া হয়েছিল, ব্রিটিশ সরকার এখন সেটুকুও কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করল। প্রথমতঃ ১৯২৭ সালের কারেন্সি বিল বা মুদ্রা আইনের দ্বারা ভারতীয় টাকার বিনিময় হার ব্রিটিশ মুদ্রায় এক শিলিং ছ'পেন্স করা হয়—যা প্রচলিত হারের চেয়ে দু'পেন্স বেশী ছিল;

দ্বিতীয়তঃ ১৯২৭ সালের ইস্পাত সংরক্ষণ বিধির বা ষ্টিল প্রোটেকশন বিলের দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ ইস্পাতের জন্য সুবিধাজনক মূল্য ধার্য করা হল, যা প্রকৃত পক্ষে ১৯২৪ সালের সংরক্ষণ বিধিকে বাতিল করে দিল। স্বভাবতঃই ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এর বিরুদ্ধে সমস্বরে প্রতিবাদ জানালেন।

কিন্তু ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি অন্ধকারের প্রহর শেষ হয়ে এল। সুভাষ চন্দ্র বসুর ভাষায় "দিগন্ত আলোয় উদ্ভাসিত হতে শুরু করল।" (দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল; পৃ. ১৪৩; এশিয়া, ১৯৬৭, নতুন সংস্করণ) সুভাষচন্দ্রের এই প্রত্যাশার কারণ ইংলণ্ডের রক্ষণশীল (কনজারভেটিভ) সরকার কর্তৃক স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে গঠিত ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটুটারী কমিশন সম্পর্কে ভারতীয় জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। ১৯২৭ সালের নভেম্বরে গঠিত এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল ১৯১৯ সালের ভারতীয় শাসন বিধি (কমিশন গঠিত হয়েছিল উক্ত বিধির ৮৪ "ক" ধারা অনুযায়ী) কতটা কার্যকরী হয়েছে তা পরীক্ষা করে ভবিষ্যতের জন্য আরো কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব রচনা করা। এই কমিশনের মোট সাতজন সদস্যের সবাই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ নিয়ে গঠিত কমিশন ভারতীয়দের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে এ ধারণাকে জাতি, ধর্ম, দল-মত নির্বিশেষে কোনো ভারতীয়ই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। কিছু নরমপন্থী ও বিরোধীভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দল সাইমন কমিশন ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯২৮) ভারতে এলে তাকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিল। স্মরণ করা যেতে পারে মুসলীমলীগের এক সংখ্যালঘু অংশ কমিশনের প্রতি সহযোগিতার কথা বললেও সংখ্যাগুরু অংশ জিন্নার নেতৃত্বে বর্জনের সপক্ষে হাত মেলাল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বর্জনের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনটি সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করেন। এক, কংগ্রেস মনে করে ভারতীয় জনগণের গোলটেবিল বৈঠক বা কনভেনশন পার্লামেণ্ট সংবিধান রচনা করতে সক্ষম। দুই, আমাদের দাবী স্বরাজ। ব্রিটিশ সরকার

ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে আলোচনা ও বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে তা অর্জিত হবে। তিন, কমিশনের সদস্যপদ থেকে ভারতীয়দের বর্জন নিশ্চিতভাবে ভারতীয়দের আত্মমর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ করেছে।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে সরকারের সদিচ্ছার উপর আস্থাশীল লিবারেল বা উদারপন্থীরাও বোম্বাইয়ের দশম অধিবেশনে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। সাইমন কমিশন বয়কট দেশে এক অভূতপূর্ব ঐক্যের সাড়া জাগাল। কমিশনের আগমনের দিনটিকে (৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৮) কেন্দ্র করে বোম্বাই শহরে সম্পূর্ণ হরতাল পালিত হল। সর্বত্র আওয়াজ উঠল, "গো ব্যাক সাইমন," সাইমন ফিরে যাও! চৌষট্টিতে ৫০ হাজার লোকের এক জমায়েত তাদের প্রিয় নেতাদের প্রতিবাদ শুনল। বয়কটকে উপলক্ষ করে ছাত্রদের আন্দোলন আরো তীব্র করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন।

সাইমন কমিশন বয়কটের প্রতিক্রিয়ায় অসন্তুষ্ট হয়ে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড স্বরাজ্যপার্টি তথা ভারতীয় নেতাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বল্লেন, তারা যেন সমস্ত দলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করেন—যা' তাঁর (বার্কেন হেড) ধারণায় ভারতীয়দের যোগ্যতায় সম্ভব ছিল না। ১৯২৭ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। কার্যনির্বাহী সমিতিকে দায়িত্ব দেওয়া হল নিখিল ভারত সর্বদলীয় রাজনৈতিক সভা আহ্বান করে একটি সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য সংবিধান রচনা করার। যার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯২৮ সালের মে' মাসে গঠিত হল মোতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিটি, সংক্ষেপে যা' "নেহেরু কমিটি" নামে পরিচিত। মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার সপক্ষে জওহারলাল নেহেরু কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাবকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করল। ১৯২৪ সালে গান্ধিজী জেল থেকে পুরো মেয়াদের পূর্বে মুক্তি পেয়ে তেণ্ডুলকারের তথ্য অনুযায়ী এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই প্রস্তাবের কোনো বিরোধিতা করেননি—তবে সমর্থনেও কিছু বলেননি। মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেস নিজেকে যুক্ত করল সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আদর্শে গঠিত "ইণ্টারন্যাশানাল লীগ অব অপ্রেসড পিপলস অ্যাগেনষ্ট ইম্পিরিয়্যালিজম"-এর সাথে। লীগের প্রতিষ্ঠা দিবসে অংশ নেওয়ার জন্য ব্রাশেলসে জওহারলালকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হল।

১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে লক্ষ্ণৌ শহরে একটি সর্বদলীয় সম্মেলনের সামনে

নেহেরু কমিটি রচিত খসড়া সংবিধানের রিপোর্ট পেশ করা হল। এই রিপোর্ট দায়িত্বশীল সরকার গঠনের পক্ষে রায় দিল। খসড়া প্রস্তাবে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ, সার্বভৌম পার্লামেণ্ট যার স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা (autonomous power) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্যানাডা অথবা অষ্ট্রেলিয়ার ডোমিনিয়ান পার্লামেণ্টগুলির অনুরূপ হবে বলে মতামত দিল। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি সিনেটের সদস্য (২০০ জন) নির্বাচিত করবে। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধিসভার সদস্য (৫০০ জন) নির্বাচিত হবে। পার্লামেণ্টে বংলাদেশের মুসলমানদের এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অ-মুসলমানদের ছাড়া আর কোন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। লোকসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিতে সংখ্যালঘিষ্ট-দের আসন সংরক্ষিত থাকবে। ব্যতিক্রমের মধ্যে থাকবে কেবল পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ। যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই দু'টি স্থানে কোনোরকম আসন সংরক্ষণ হবে না—প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন। সংক্ষেপে বলা যায়, নেহেরু রিপোর্ট ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বয়ংশাসিত ডোমিনিয়ান মর্যাদাকে মেনে নিল। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ দু'টি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মেনে নিয়ে পার্লামেণ্টে আসন সংরক্ষণের নীতি অস্বীকৃত হল আর তৃতীয়তঃ যৌথ নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে পার্লামেণ্ট এবং প্রাদেশিক আইন-সভার নির্বাচনকে স্বীকার করে নিয়ে সাম্প্রদায়িক নির্বাচক মণ্ডলীর বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করা হল।

চারদিন সম্মেলন (২৮—৩১শে আগষ্ট) চলার পর খসড়া প্রস্তাব আরো আলোচনা সাপেক্ষে গ্রহণ করা হল এবং এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় ডিসেম্বরে (১৯২৮) সমস্ত রাজনৈতিক দলের আবার একটি কনভেনশনের আয়োজনও নেওয়া হল। যেখানে খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের চূড়ান্ত মতামত দেবে।

২২শে ডিসেম্বর কলকাতায় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি একটি সর্বভারতীয় কনভেনশনে মিলিত হল। এবং একই সংগে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ পৃথক পৃথক ভাবে নেহেরু রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার জন্য তাদের দলের স্বতন্ত্র বৈঠকেরও আয়োজন করল। এই বৈঠকগুলিও কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল। মহম্মদ আলী জিন্না যিনি ১৯২১ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের তরফে বক্তব্য রাখতেন তিনি এবার কলকাতায় পুরোপুরি মুসলিমলীগের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। নেহেরু রিপোর্টকে সরাসরি আক্রমণ করে তিনি সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর সপক্ষে

বক্তব্য রাখলেন। সংশোধনী আকারে তিনি কতকগুলি প্রস্তাব রাখেন যার মধ্যে প্রধান তিনটি হল—(১) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্বের দাবী; (২) যদি প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার না করা হয় তাহলে অন্ততঃ দশবছরের জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশের আইনসভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে; (৩) বাড়তি ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রের পরিবর্তে প্রদেশগুলির হাতে তুলে দিতে হবে।

দীর্ঘ উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কের পর জিন্নার সংশোধনগুলি বাতিল বলে গণ্য হলে তিনি প্রতিবাদে কনভেশন পরিত্যাগ করেন, পাঞ্জাবে ধর্মীয় ও ভাষার সংখ্যালঘু অংশ হিসেবে শিখদের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের দাবীও কনভেনশন বাতিল করে দেয়। ফলে শিখরাও মুসলিমলীগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। অব্রাহ্মণ এবং অনুন্নত শ্রেণীর এক অংশও রিপোর্টের প্রতি তাদের অসহযোগিতা জানালো। আর খ্রীষ্টানরা আক্ষরিক অর্থে সমর্থন জানালেও তারা যে মোটেই খুশী হয়নি সে কথা জানাতে ভুললো না। একদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলি যখন নেহেরু রিপোর্টকে পর্যাপ্ত স্বার্থরক্ষণ না হওয়ার অপরাধে দোষী সাবাস্ত করছিল তখন খোদ কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা বামপন্থী তরুণ নেতৃবৃন্দ যথা, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল এই রিপোর্টকে স্বাধীনতার দাবীর ক্ষেত্রে মোটেই যথেষ্ট নয় বলে তীব্র সমালোচনা করলেন। জওহবলাল লক্ষ্ণৌতে "নেহেরু রিপোর্টে" ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে নিশ্চয়তা প্রদান এবং জমিদার ও তালুকদারদের সম্পত্তির উপর অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করায় তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি তিনি সে সময়ে কংগ্রেস সেক্রেটারীর পদ থেকে ইস্তাফা দেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। (ফ্রাংক মোরেস; জওহরলাল নেহেরু; পৃ. ১৩৩-১৩৪) কলকাতায় তিনি ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি কোনো ভাবেই আপোষ করতে রাজী নন। সুভাষচন্দ্র বসু "দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল" গ্রন্থে লিখেছেন, "কংগ্রেসের মধ্যে দুটি গ্রুপ ছিল। বয়স্কদের গ্রুপ, যাঁরা ডোমিনিয়ান ধরনের সরকার পেলেই খুশী হতেন, তাঁরা পুরোপুরি নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। আর বামপক্ষ (যাঁর মধ্যে সুভাষচন্দ্রও একজন) যাঁরা মাদ্রাজে গৃহীত স্বাধীনতার প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা চাইতেন পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতেই কেবল নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণ করতে।" (পৃ. ১৫৭) সুভাষচন্দ্র "বামপক্ষ", (Left wing) বলতে খুব সম্ভবতঃ বুঝিয়েছেন নভেম্বর

মাসে গঠিত ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের সমর্থনকারীদের। লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ণ-স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে নেতৃবর্গের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য। যার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং দুই সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসু এবং জওহরলাল নেহেরু। যাই হোক, গান্ধিজী দু'টি পরস্পর-বিরোধী মতামতের মধ্যে একটি আপোষ রফা করার চেষ্টা করলেন। তাঁর প্রস্তাব —ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে এক বছর সময় দেওয়া হোক নেহেরু রচিত সংবিধান অনুযায়ী ভারতের ডোমিনিয়ান মর্যাদা মেনে নিতে। ৩১শে ডিসেম্বরের (১৯২৯) মধ্যে অথবা তার পূর্বে যদি তাঁরা তা' স্বীকার না করেন তাহলে "কংগ্রেস অহিংস অ-সহযোগিতার জন্য প্রচারে নামবে।" দেশবাসী কর বন্ধ রাখবে এবং অবস্থা অনুযায়ী অন্যান্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই প্রস্তাব অবশ্যই "কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রচারে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।"

গান্ধিজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন সুভাষচন্দ্র এবং তাঁকে সমর্থন করলেন জওহরলাল। ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল স্বাধীনতার চেয়ে ন্যূনতম কিছুতে কংগ্রেস সন্তুষ্ট হবে না। ("that the congress would be content with nothing short of independence)" সংশোধনী প্রস্তাবের বিপক্ষে ১৩৫০টি ভোট এবং সপক্ষে ৯৭৩টি ভোট পড়ায় প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে গেল। গান্ধিজীর আপোষমূলক প্রস্তাবটিকে সুভাষচন্দ্র সমালোচনা করে বলেছিলেন, "অনুকূল সময় সাপেক্ষে কালহরণ বা গড়িমসি" (temporising)।

মোতিলাল নেহেরু সভাপতির ভাষণে গান্ধিজীকে সমর্থন করে আহ্বান জানালেন, বিদেশী ভাষায় লেখা "ইণ্ডিপেনডেন্স" এবং "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস" শব্দ দু'টি মন থেকে মুছে ফেলে "স্বরাজ" এবং "আজাদী" শব্দ দুটি গ্রহণ করতে। "যে নামেই বলা হোক, আসুন আমরা স্বরাজের জন্য কাজ করি।...একটি জাতির ইতিহাসে এক বছর এমন কিছুই নয়। গান্ধিজী আগামী এক বছরের জন্য দেশবাসীকে একটি সক্রিয় কার্যক্রম পালন করতে আহ্বান জানালেন। বিদেশী বস্ত্র বর্জন, খদ্দর প্রস্তুত ও পরিধান এবং সুরাপান বর্জন। এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূরীকরণ, গ্রাম পুনর্গঠন এবং শহরের শ্রমিকদের সংগঠিত করা। গান্ধিজীর ভাষায়, "যদি নেহেরু রিপোর্টকে ফলপ্রসূ করতে চাও তাহলে ন্যূনতম পক্ষে এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য কাজ কর।" (মহাত্মা ; ২য় খণ্ড ; পৃ. ৩৩৫)

ইতিমধ্যে ১৯২৯ সালের জুন মাসে গ্রেট ব্রিটেনে লেবার পার্টি বা শ্রমিকদল

ক্ষমতায় এল। সাইমন কমিশন যেহেতু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়েও রিপোর্ট পেশ করতে পারেনি তাই তার সময়-সীমা লেবার পার্টি বাড়িয়ে দিল। যদিও সাইমন কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল রক্ষণশীল দলের আমলে। সাইমন প্রস্তাব দিলেন কমিশন রিপোর্ট পেশ করলে তার উপর আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি এবং ব্রিটিশ ভারতের ও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে যেন একটি গোলটেবিল বৈঠক বসে। একটি সাধারণ ঐক্যমতে পৌছানোর জন্য এ ধরণের আলোচনার প্রয়োজন। এই আলোচনা শেষ হওয়ার পর যেন মন্ত্রীসভা তাঁদের চূড়ান্ত প্রস্তাব পার্লামেন্টের কাছে রাখে। ব্রিটিশ সরকার স্যার জন সাইমনের বক্তব্য মেনে নিলেন।

ভারতের ভাইসরয় আরউইন ইতিমধ্যে লণ্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের (**Ramsay Macdonald**) সাথে ভারতের শাসনতান্ত্রিক ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনার জন্য গেলেন। ৩১শে অক্টোবর (১৯২৯) ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি একটি বক্তব্য সাধারণ্যে প্রচার করলেন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সাইমনের বক্তব্য অনুযায়ী যে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করলেন তাতে তিনি তাঁর সম্মতি জানালেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা যা' করলেন তা'হল—"আমি মহামান্য রাজার (সরকারের) তরফে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই ১৯১৭ সালের ঘোষণাপত্রে তাঁদের যা' চিন্তা করা হয়েছে তা' হচ্ছে ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির স্বাভাবিক বিকাশ হল ডোমিনিয়ান মর্যাদা লাভ।"

এই ঘোষণা ভারতীয় নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট আশার উদ্রেক করল। ৩১শে ডিকেম্বর সময়সীমা বেঁধে দিয়ে যে চূড়ান্ত সতর্কবাণী ব্রিটিশ সরকারকে শোনানো হয়েছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে লেবার পার্টি ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের সপক্ষে ঘোষণা কংগ্রেস তথা অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে উৎসাহ জোগালো। ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে একটি সর্বদলীয় সভায় নেতৃবৃন্দের তরফে একটি ঘোষণা জারী করা হল। একে সংক্ষেপে "দিল্লীর ঘোষণাপত্র" বলা হয়। ঘোষণাপত্রে ভাইসরয়ের বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে একটি ডোমিনিয়ান সংবিধান রচনায় সর্বাধিক সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হল। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন গান্ধিজী, মোতিলাল নেহেরু, মদনমোহন মালব্য, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতারা। জওহরলাল প্রথমে স্বাক্ষর দিতে রাজী হননি—এমন কি সুভাষচন্দ্রের সাথে একজোট হয়ে একটি পাল্টা ঘোষণাপত্র জারী করবেন বলে ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে স্বাক্ষর প্রদান

করেন। পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্র, ডাঃ এস. কিচলু (লাহোর) এবং আবদুর বারি (পাটনা) একটি স্বতন্ত্র ঘোষণাপত্র জারী করে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস এবং গোল-টেবিল বৈঠকের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। কৌতূহলের বিষয়, জিন্না ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আহ্বানকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন।

যাই হোক, ২৩শে ডিসেম্বর (১৯২৯) ভাইসরয়ের সাথে দেখা করে গান্ধিজী যখন তাঁর কাছ থেকে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসকে কার্যকরী করার সুস্পষ্ট আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি চাইলেন তখন আরউইন সেই প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন।

এর প্রকৃত কারণ হল, আরউইনের ৩১শে অক্টোবরের ঘোষণা খোদ ব্রিটেনে দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। বৃটিশ সংবাদপত্র, রক্ষণশীল এবং লিবারেল পার্টি সবাই আরউইনের ঘোষণাকে অসময়োচিত, অবিজ্ঞজনোচিত এবং বিপজ্জনক বলে সমালোচনা করল। ফলে ব্রিটেনেব শ্রমিকদলের সরকাব সম্মিলিত বিরোধিতার সামনে পেছু হঠলো।

গান্ধিজী এবং মোতিলাল ভাইসরয়ের দরবারে থেকে কোনো সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পেয়ে প্রকৃতপক্ষে শূন্য হাতে ফিরে এলেন। গান্ধিজী পূর্ণ স্বাধীনতার সপক্ষে এবার পুরোপুরি দাঁড়ালেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "আমরা নৌকো পুড়িয়ে দিয়েছি।" নিজেকে জাহির করলেন একজন "ইণ্ডিপেনডেন্ট-ওয়ালা" হিসেবে।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশন বসল। সভাপতির আসন অলংকৃত করলেন চল্লিশ বছরের যৌবনদৃপ্ত জওহরলাল নেহেরু। ইতিপূর্বে লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্বের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধিজীকে অনুরোধ করেছিল কিন্তু তিনি সে অনুরোধ গ্রহণ করেননি। সুভাষচন্দ্রের বিবরণ অনুযায়ী বিকল্প হিসেবে সাধারণভাবে সবাই বল্লভভাই প্যাটেলের পক্ষে রাজী ছিলেন কিন্তু গান্ধিজী জওহরলালকে মনোনীত করলে তিনিই সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। (ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল ; পৃ. ১৬৯)

লাহোর অধিবেশনে এক বিরাট উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে কংগ্রেস সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ("Complete Independence") বা পূর্ণ স্বরাজের অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ করল। সভাপতির ভাষণে জওহরলাল বললেন, "আমাদের নিকট স্বাধীনতার অর্থ ব্রিটিশ আধিপত্য এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি।" আইনসভার সদস্যদের পদত্যাগ করার আহ্বান জানানো হল।

গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস কোনো ক্রমেই যোগ দেবে না। আমন্ত্রণলিপি ফেরত পাঠানো হবে। সত্যাগ্রহ সম্পর্কে প্রচার ও যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সর্বময় ক্ষমতা গান্ধিজীর স্কন্ধে অর্পিত হল।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ সাল। মধ্যরাত্রে রাভি নদীর তীরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নর-নারীর হর্ষবর্ধন ও নাচ, গান, আনন্দের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত করলেন কংগ্রেসের সভাপতি যুব-শক্তির প্রতীক জওহরলাল নেহেরু।

গান্ধিজীর নির্দেশে ২৬শে জানুয়ারী (১৯৩০) কংগ্রেস সর্বত্র "স্বাধীনতা দিবস" পালন করল এবং আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ ঘটল ডাণ্ডীতে "লবণ সত্যাগ্রহের" মধ্য দিয়ে। সমুদ্রতীরে অবস্থিত ডাণ্ডীতে ৬ই এপ্রিল পদযাত্রা করে আইন অমান্য করলেন গান্ধিজী। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্রেপ্তার করা গেল না। তিনি গ্রেপ্তার হলেন মে মাসে। তবে আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তারের সংখ্যা অংকের হিসাবে ছাড়িয়ে গেল। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ষাট হাজারেরও অধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার বরণ করলেন। আইন অমান্য আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়িয়ে দিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—দিল্লী প্রসাদ কুটে/ওথা বারবার বাদশা জাদা'র তন্দ্রা যেতেছে টুটে।

(২)

অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে গান্ধিজীর ছ'বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল, ১৯২২ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য ভারত সরকার তাঁকে দু'বছর পরেই মুক্তি দেয়। জেল থেকে মুক্তি পেলেও গান্ধিজী বলেন তিনি নিজেকে আইনত বন্দী হিসেবে দেখেন এবং ১৯২৮ সাল পর্যন্ত এর পুরো মেয়াদ স্বইচ্ছায় পালন করবেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি. এন. পাণ্ডের মতে গান্ধিজী রাজনীতি থেকে সাত বছর দূরে সরে যাবার পর "১৯২৮ সালের জন্য নির্বাচিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, মতিলাল নেহেরুর দ্বারা আমন্ত্রিত হলেন কলকাতা অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য।" (দি ব্রেক আপ অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া; পৃ. ১২৭; দিল্লী, ১৯৬৯) রজনী পাম দত্ত "ইণ্ডিয়া টুডে" বইতে (পৃ. ৩৫৮) মন্তব্য করেছেন, "১৯২৮ সালের শেষে গান্ধী কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেসের সক্রিয় নেতৃত্বে ফিরে এলেন।"

কিন্তু গান্ধিজীর জীবন-বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পুরোপুরি রাজনীতিতে ফিরে আসেন। কংগ্রেসের মাধ্যমে

নিজেকে দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সাথে যুক্ত করেন। গান্ধিজী যে দু'বছর জেলে ছিলেন সে সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে আইনসভায় যোগদানের প্রশ্নে মত-পার্থক্য দেখা যায়। হাকিম আজমল খাঁ, মতিলাল নেহেরু, বিধানসভায় প্যাটেল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখেরা মনে করেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেসের উচিত হবে কাউন্সিলগুলির অভ্যন্তরে বাধাদানের ভেতর দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে বিস্তৃত করা। ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেস যদিও এই বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করল তথাপি দাশ ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে স্বরাজ্য-পার্টি গঠিত হলো, অপরপক্ষে ডাঃ আনসারী, মহম্মদ আলী, রাজা গোপালচারী প্রমুখেরা অসহযোগ আন্দোলনে অবিচল থেকে আইন সভা বর্জনের নীতিতে অটল থাকবেন। ১৯২৩ সালের কংগ্রেস অধিবেশন বয়কটের সম্বন্ধে রায় দিল। কিন্তু ইতিমধ্যে স্বরাজ্য পার্টি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে বিপুলভাবে জয়লাভ করেন।

গান্ধিজীর একনিষ্ঠ শিষ্য জে. বি. কৃপালনী লিখেছেন, "মুক্তি পাওয়ার পর গান্ধিজী এক কঠোর রাজনৈতিক অবস্থার সম্মুখীন হলেন, স্বরাজ্যপার্টির নেতাদের সাথে আলোচনার পূর্বে কোনো মতামত প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকাতে তিনি কেবল পুরানো কর্মসূচীতে তাঁর অবস্থার কথা ঘোষণা করেন।" (গান্ধী; পৃ. ৯৯) অর্থাৎ আইনসভা বর্জন এবং সার্বিক আইন অমান্যের পরিবর্তে সীমিত অথবা ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন অব্যাহত রাখা। ১৯২১ সালের ৫ই নভেম্বর অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এ. আই. সি. সি.) উপরোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল এবং ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের "সিবিল ডিসিওবিডিয়েন্স এনকোয়ারি কমিটি" ও তার রিপোর্টে উক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে সুপারিশ করে। (হিষ্ট্রি অব ফ্রিডম ম্যুভমেণ্ট; আর. সি. মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ২০৮-২০৯; কলকাতা, ১৯৬৯)

কাউন্সিলে অংশগ্রহণ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন এবং মোতিলাল জুহুতে এপ্রিল মাসে (১৯২৪) গান্ধিজীর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মতামত জ্ঞাপন করেন! অবশ্য তিনি এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করবেন না বলে জানা গেল। ২২শে মে তিনি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে জানালেন, যেহেতু দিল্লী (সেপ্টেম্বর, ১৯২৩) এবং কোকোনাদ কংগ্রেস (ডিসেম্বর, ১৯২৩) স্বরাজপন্থী কংগ্রেসীদের (Swarajists) কাউন্সিলে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে তাই তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো প্রচারে নামবেন না। কাউন্সিলে অংশগ্রহণের বিরোধী হয়েও তিনি স্বরাজপন্থীদের উপদেশ দিতে ভুললেন না কাউন্সিলে তাঁদের কি ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত হবে।

"আমি যদি কাউন্সিলে যাই তাহলে সাধারণভাবে বাধাদানের নীতি গ্রহণ না করে গঠনমূলক কর্মসূচীগুলিকে জোরদার করব।" কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার-গুলির সামনে প্রস্তাব রাখা হবে, হাতে তৈরী জুতোয় এবং হাতে বোনা খদ্দর সরকারিভাবে ক্রয় করতে; বিদেশী বস্ত্রের উপর সংস্করণ শুল্ক চাপাতে; সুরাপান নিষিদ্ধ করতে; ওষুধের উপর কর বাতিল করতে এবং সামরিক খাতে অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণ ব্যয় সংকোচ করতে। যদি সরকার উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি স্বীকার না করেন তাহলে "আমি আমার আসন থেকে পদত্যাগ করব এবং আইন অমান্যের জন্য দেশকে প্রস্তুত করব।" (মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃ. ১২৯) ১৯২৪ সালের ২৭শে জুন আমেদাবাদে এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশনকালে গান্ধিজী সদস্যদের বিবেচনার জন্য "পাঁচটি বয়কট"-এর আহ্বান জানালেন। এগুলি হল—মিলে প্রস্তুত কাপড়; আইন-আদালত; স্কুল-কলেজ খেতাব এবং আইনসভা। তাঁর মতে এগুলি জনগণের স্বরাজ লাভের জন্যও প্রয়োজনীয়। "They are vital for swaraj for the masses." অবশ্য অধিবেশনের অনতিকাল পরেই গান্ধিজী স্বয়ং মোতিলাল নেহেরুকে অনুরোধ করেন যেন তিনি এবং তাঁর স্বরাজপন্থী বন্ধুরা এক্ষুণি আইনসভা পরিত্যাগ না করেন। তাঁর মতে "কোনো সন্দেহ নেই স্বরাজপন্থীরা সরকারের অভ্যন্তরে নাড়া দিতে সমর্থন হয়েছে।" (ঐ পৃ. ১৪৫) ১৯২২ সালের ২৫শে অক্টোবর ব্রিটিশ সরকার অর্ডিন্যান্স জারী করে বাংলায় স্বরাজপন্থীদের উপর চণ্ডমূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুভাষচন্দ্র বসু সহ বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গ্রেপ্তার হলেন। গান্ধিজী ৩১শে অক্টোবর "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় "হিংসার অর্ডিন্যান্স" বর্ণনা করে তীব্র ভাষায় সরকারকে সমালোচনা করলেন। শুধু তাই নয় কলকাতায় ছুটে গিয়ে তিনি বিভিন্ন জনসভায় অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের সামনে তাঁর দৃঢ় প্রতিবাদ তুলে ধরেন। "সব ধরণের হিংসাই আমার কাছে ঘৃণার বস্তু কিন্তু সবচে' বেশী হল সরকারী অরাজকতা এবং পুলিশী জুলুম।" (ঐ পৃ. ১৬৪) সরকারের অত্যাচার ও চণ্ডশাসনের মোকাবেলার জন্য গান্ধিজী স্বরাজপন্থীদের সাথে আপোষ করলেন। তাঁর লক্ষ্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। ৬ই নভেম্বর কলকাতা থেকে চিত্তরঞ্জন এবং মোতিলাল নেহেরুর সাথে তিনিও এক যুক্ত বিবৃতিতে বললেন, স্বরাজ্য পার্টি কংগ্রেসের তরফে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে কাজ করবে।" ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন গান্ধিজী। সভাপতির ভাষণে বললেন, "আমি আইন অমান্যের পক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু যতদিন না বিদেশী বস্ত্র

বর্জন করার ক্ষমতা আমরা অর্জন করছি ততদিন পর্যন্ত আইন অমান্যের দ্বারা স্বরাজ অর্জনের চেষ্টা অসম্ভব।" ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য তাঁর মতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নয়—তিনি চান স্বাধীন রাজ্যগুলির বন্ধুত্বপূর্ণ ফেডারেশন বা সংযুক্তি। "ব্রিটিশ সরকার যা বলে তা সত্যি যদি সে চায় এবং আমাদের মধ্যে সমতা আনায় সমভাবে সাহায্য করে তাহলে ব্রিটিশ যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন করার চেয়েও তা হবে অনেক বড় বিজয়। সে কারণেই আমি সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বরাজের জন্য চেষ্টা করব।" অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার যুক্তি হিসেবে তিনি বললেন, এখন দেশের জন্য প্রয়োজন সত্যিকারের সত্যাগ্রহীর। কারণ সত্যাগ্রহের মারফত দেশ তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। স্বরাজ তার কাছে সত্যের মত আর সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে সেই সত্যে পৌছানো যায়। গান্ধিজীর মতে "সত্যাগ্রহ কখনো ব্যর্থ হয় না এবং একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহী যথেষ্ট সত্যে পৌছানোর জন্য" ("...one perfect Satyagrahi is enough to vindicate truth.") জনগণের সামনে তিনি কয়েকটি কর্মসূচী রাখলেন। খদ্দর প্রস্তুত ও পরিধানের উপদেশ পৌছে দিতে হবে; পৌছে দিতে হবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বাণী আর তার সাথে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জোরদার প্রচারে নামতে হবে। দেশের তরুণদের আহ্বান জানিয়ে তৈরী করতে হবে স্বরাজের জন্য প্রকৃত সৈনিক হিসেবে। তাঁর মতে যদি এই কর্মসূচীগুলি সফল হয় তাহলে "অসহযোগ আন্দোলন আর কখনো পুনরায় শুরু করতে হবে না।' (ঐ; পৃ. ১৭১-১৭৩)

১৯২৫ সালেও গান্ধিজীকে নানা রাজনৈতিক কর্মে তৎপর দেখা গেল। কংগ্রেসের দু'পক্ষের মধ্যে ঐক্য আনার জন্য দাশ, মোতিলালের সাথে গান্ধিজীকেও অনুরোধ করা হল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মনোনীত করতে। বেলগাঁও অধিবেশনের পর গান্ধিজী কংগ্রেসের কর্মসূচী রূপায়নের জন্য রাজ্যগুলিতে সফরে বেরোলেন। কাথিয়াওয়াড, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া (মধ্য ভারত), বাংলা, মালাবার এবং ত্রিবাংকোরের গ্রামগুলি তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়ালেন। "আমার সফরের কারণ সাধারণ মানুষ আমার সাথে দেখা করতে চায়।...আমি অল্প কথায় সরল বক্তব্য তুলে ধরি এবং তারা ও আমি উভয়েই সন্তুষ্ট বোধ করি।" ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাসের আমন্ত্রণে গান্ধিজী উপস্থিত ছিলেন। ২রা মে' (১৯২৫) সভাপতির ভাষণে দু'টি প্রধান দাবী উপস্থিত হল। এক, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর রেহাই এবং দ্বিতীয়, নিকট ভবিষ্যতে কমনওয়েলথের অন্তর্ভূক্ত থেকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ।

জে. বি. কৃপালনী ওই সম্মেলনে ছিলেন। তিনি লিখেছেন, গান্ধিজী চিত্তরঞ্জন দাশের উত্থাপিত দাবীগুলিকে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। ১৬ই জুন দেশবন্ধু মারা গেলেন। "ইয়ং ইণ্ডিয়া"তে গান্ধিজী লিখলেন, "ভারত এক জহরত হারালো কিন্তু স্বরাজ লাভের মধ্য দিয়েই আমরা তা' ফিরে পাব।" ২৬শে ডিসেম্বর কানপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গান্ধিজী কেবল পাঁচ মিনিটের জন্য ভাষণ দেন। তিনি দুঃখের সাথে বললেন, "যদি তাঁর দেশবাসীর মধ্যে (দেশপ্রেমের) উত্তাপ আর আগুন দেখতেন তাহলে আজই তিনি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে দিতেন। কিন্তু হায়, তা' হওয়ার নয়।"

১৯২৬ সালে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" মারফত গান্ধিজী জানালেন তিনি আগামী ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সবরমতী আশ্রমে থাকবেন, অন্ততপক্ষে আমেদাবাদের বাইরে যাবেন না। ব্যতিক্রম ঘটতে পারে কেবল স্বাস্থ্য এবং অভাবনীয় কোনো ঘটনা ঘটলে। কারণ হিসেবে জানালেন তিনি চান ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্রাম, আশ্রমের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিতে এবং অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে। তেণ্ডুলকার লিখছেন, রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেওয়া থেকে গান্ধিজী বিরত থাকলেন। (মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃঃ ২২৩)

কিন্তু ২০শে এপ্রিল গান্ধিজীকে দেখা গেল সবরমতী আশ্রমে সরকারী দপ্তর গ্রহণ সম্পর্কে স্বরাজপন্থীদের মধ্যে যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল তা' দূর করতে। তাঁর উদ্যোগে "সবরমতী প্যাক্ট" বলা হল যেহেতু সরকার স্বরাজ-পন্থীদের দাবী (ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪) সম্পর্কে সন্তোষজনক মনোভাব দেখিয়েছে তাই প্রয়োজনে দপ্তর নেওয়াও চলতে পারে। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই স্বরাজ-পন্থীদের মধ্যে সবরমতী প্যাক্ট নিয়ে তুমুল মতপার্থক্য দেখা দিল। মোতিলাল নেহেরু বললেন, ফরিদপুর বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জন যে দাবীগুলি তুলেছিলেন সেগুলি যদি সরকার মেনে নেয় তবেই দপ্তর গ্রহণ চলবে। অপর দিকে লালা লাজপত রায় কোনো রকম শর্ত ব্যতিরেকেই সরকারের সাথে সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। দু'পক্ষের প্রচণ্ড মত-পার্থক্য যখন দেশের মধ্যে এক রাজনৈতিক ঝড় তুলল তখন গান্ধিজীর বক্তব্য—"ঝড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত···আমার উচিত হবে নিজেকে রিজার্ভ রাখা।" এ সময়ে নিজের কাজ সম্পর্কে লিখছেন, "আমি চেষ্টা করছি নীচু থেকে উপরে কাজ করতে। বাইরের লোকের এটা মনে হবে বিরক্তিজনক মন্থর কাজ।" (ঐ পৃ. ২৩৪)

যাই হোক, ২০শে ডিসেম্বর গান্ধিজী তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করে সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে এলেন। ওয়ার্ধাতে তিনি প্রথম যে বক্তৃতা দিলেন তাতে

জানালেন এ যাবত তিনি ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়েই ভাবনা চিন্তা করেছেন। তাঁর ভাষায় "নিস্তব্ধতার বছরে আমি এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছি এবং সিদ্ধান্তে এসেছি যে আমরা স্বরাজ পেতে পারি এমন কি রাম রাজ্য—যদি তিনটি কর্মসূচী সফল করতে পারি।" সে তিনটি হল, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং মধ্যবিত্তদের স্বদেশীয় বাণী সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি। তিনি এ সময়ে পুনরায় বললেন, দেশের মুক্তির জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। একমাত্র সত্য ও অহিংসা ছাড়া। "আমি পার্থিব জগতের জন্য এই দু'টি উৎসর্গ করতে পারব না। আমি সত্য অথবা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে ভারতের সেবা করতে চাই না।" বছরের শেষে কংগ্রেসের গৌহাটী অধিবেশনে কৃপালনীর মতে "গান্ধিজী একজন নিষ্ক্রিয় দর্শক ছিলেন না। তিনি আলোচনায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন।" অধিবেশনের "স্বাধীনতা" বিষয়ক প্রস্তাবকে কংগ্রেসের আসন থেকে এবং পরে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা করলেন। তাঁর মতে এ ধরনের প্রচারের যাঁরা উত্থাপক তাঁরা ধৈর্যশীল নন এবং ব্রিটিশদের সদিচ্ছায় তাঁদের আস্থা নেই। তাঁরা এ-কথা কেন ভাবেন যে যাঁরা ব্রিটিশ জনগণকে পরিচালনা করছেন তাঁদের কখনো হৃদয় পরিবর্তন হবে না।" বলা বাহুল্য, কংগ্রেস স্বরাজের অর্থ যে পূর্ণ স্বাধীনতা তা' বাতিল করে দিল, গান্ধিজী আনন্দিত হয়ে লিখলেন, "প্রস্তাবটি বাতিল করে দিয়ে কংগ্রেস সুস্থতার প্রমাণ দিল।" ("is proof of the samity of the Congress") গান্ধিজী জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর কাছে স্বরাজের অর্থ ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ডোমিনিয়ানের মর্যাদা লাভ অথবা ব্রিটিশ কমনওয়েলথ। ("Swaraj within the British Empire or call it the British Commonwealth") তাঁর মতে ভারতের বর্তমান অবস্থায় স্বরাজের অর্থকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলে গ্রহণ করা উচিত হবে না। "স্বরাজ একটি সংজ্ঞাহীন শব্দ" ("indefinable term")। তাই এর সংজ্ঞা নিরূপণে "আমাদের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত না রেখে আমাদের উচিত হবে পথ এবং পদ্ধতির সন্ধান করা।" ("discovering the ways and means")

১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস অধিবেশন মাদ্রাজে বসল। গান্ধিজী তাতে যোগ দিলেন কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হয়েও আলোচনার বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলেন এবং কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণে কোনো অংশ নিলেন না। (ঐ; পৃ. ৩০৪) স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাব এবং ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট তাঁর মনঃপূত ছিল

না। প্রস্তাবগুলিকে তিনি পরে দায়িত্বহীন এবং "দ্রুত কল্পিত ও চিন্তাহীন-ভাবে গৃহীত" বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে "এ ধরণের প্রস্তাবগুলি পাশ করে কংগ্রেস নিজেকে সমালোচকদের কাছে হাস্যাস্পদ করে তুলছে। যখন সে ভাল করেই জানে প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।" (ঐ) সাইমন কমিশন বর্জন সম্পর্কে গান্ধিজী অবশ্য ভাল-মন্দ কিছুই বললেন না। তবে জওহরলালকে লেখা এক চিঠিতে উপদেশ দিলেন কংগ্রেসের উচিত হবে প্রধানতঃ ঐক্য বিষয়ক প্রস্তাবের উপর গুরুত্ব দিতে। সাইমন কমিশন বয়কট গুরুত্বপূর্ণ হলেও ওটি তাঁর কাছে ছিল অ-প্রধান বা "Secondary" (গান্ধিজীর পত্র ; ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯২৮)

সমগ্র ১৯২৭ সাল গান্ধিজী সারা ভারত পরিভ্রমণ করে বেড়ালেন। উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষের কাছে চরখা তথা খদ্দরের গুরুত্ব প্রচার। তাঁর ভাষায় "খদ্দরের মধ্যে বিরাট সাংগঠনিক শক্তি আছে।" কমরেড সাকলাত ওয়ালার (ব্রিটিশ এম. পি.) এক প্রশ্নের উত্তরে "ইয়ং ইণ্ডিয়া"তে লিখলেন, "আমার আদর্শ সমবণ্টন কিন্তু যা' দেখছি রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে আমি ন্যায় বিচার পূর্ণ বণ্টনের জন্য কাজ করছি। আমি এই লক্ষ্যে পৌছাতে চাই খদ্দরের মধ্য দিয়ে আর এতে পৌছালেই ব্রিটিশ শোষণের কেন্দ্রস্থল অকার্যকর হবে। ব্রিটিশ যোগাযোগও পরিশুদ্ধ হবে। এদিক থেকে বলা যায় খদ্দর স্বরাজের পথে নিয়ে যাবে।" (ঐ ; পৃ. ২৫৭)

মাদ্রাজ অধিবেশনের পর বিশ্রামের জন্য গান্ধিজী ফিরে এলেন সবরমতী আশ্রমে (জানুয়ারী, ১৯২৮)। এ কারণে ফেব্রুয়ারী এবং মার্চের সফরসূচীও বাতিল হল। তবে লেখালেখি বন্ধ হল না। অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের সাথে অহিংসার গুরুত্ব এবং কিভাবে তা' পালনীয় তার উপরও তিনি বিশদ ব্যাখ্যা লিখিতভাবে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরলেন।

তেণ্ডুলকারের মতে রাজনৈতিক দিক থেকে ১৯২৮ সালটি ছিল একটি পুরো কর্মবহুল বছর। কিন্তু গান্ধিজী আশ্রমের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন। তবে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" (১২ই জানুয়ারী, ১৯২৮) পত্রিকায় তিনি "ইণ্ডিপেনডেন্স" ("স্বাধীনতা") প্রস্তাবটি তীব্র সমালোচনা করে লিখলেন, এর চেয়ে অনেক কার্যকরী প্রস্তাব কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের ষ্ট্যাটুটরী কমিশনের (১৯২৭ সালের নভেম্বর) বিরুদ্ধে নিতে পারত। যেমন, বিদেশী বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ, সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট—যার মধ্যে পিওন, জজ থেকে সেনাবাহিনীও অন্তর্ভুক্ত। গান্ধিজীর বক্তব্য, কংগ্রেস যদি এধরণের প্রস্তাব নিত তাহলে তার কিছু অর্থ

বোঝা যেত—তবে "ইনডিপেনডেন্স" এ ক্ষেত্রে নেহাতই নিরর্থক। "ব্যক্তিগত-ভাবে আমি 'ইনডিপেনডন্স' আকুলভাবে প্রার্থনা করি না। কেন না, আমি এর অর্থ বুঝি না। তবে আমি ইংরেজ জোয়াল থেকে মুক্তি কামনা করি।" তিনি আরও বললেন, ইনডিপেনডেন্সের অর্থ যদি ভারতীয় স্বাধীনতা বোঝায় তাহলে একই সংজ্ঞা দেবে এমন দু ব্যক্তিকে একই সাথে পাওয়া যাবে না। এর কারণ "আমরা জানি না আমাদের সুদূরের লক্ষ্য। এটা নির্দিষ্ট হবে আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কাজের দ্বারা সংজ্ঞা দিয়ে নয়। যদি আমরা জ্ঞানী হই তাহলে বর্তমানের কথা চিন্তা করব, ভবিষ্যত তার নিজের ভাবনা ভাববে। ঈশ্বর আমাদের সীমিত দৃষ্টি দিয়ে সীমিত গোত্রের মধ্যে কাজ করতে দিয়েছেন। আজকের কাজটুকুই যথেষ্ট ভাল কাজ।" এদিক থেকে তাঁর মতে "স্বরাজ" শব্দটি যথেষ্ট সন্তোষজনক। এ শব্দটি বহু সহস্র ব্যক্তির আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে সুদূর গ্রামাঞ্চলে পৌচেছে। হিন্দুস্থানী এই শব্দটি যদি কংগ্রেস গ্রহণ করত তাহলে "ইনডিপেনডেন্স" প্রস্তাব নেওয়ার মত ট্রাজেডি বা দুঃখজনক ঘটনা ঘটত না।" (**"No tragedy like that of the Independent resolution would then have been possible"**) গান্ধিজী চান "ভারত তার স্বকীয়-তায় চলবে এবং সেই অবস্থাকে "স্বরাজ"-এর মত ছোট শব্দ ছাড়া আর কিছু সুন্দরভাবে সংজ্ঞা দিতে পারবে না। একটি জাতি বিশেষ মুহূর্তে যে কাজ করতে পারবে তার দ্বারাই স্বরাজের বিষয়বস্তুর পার্থক্য ঘটবে। আর এই জন্যেই "স্বাধীনতা আমার লক্ষ্য—এর বিরোধিতা করি।" (**"I oppose independence as my goal"**)

"ইয়ং ইণ্ডিয়া" উপরোক্ত প্রবন্ধের এক মাসের মধ্যে গুজরাটের বারদৌলীতে সরকার ভূমি রাজস্বের হার শতকরা পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধি করলে গান্ধিজীর নির্দেশে "নো-ট্যাকস" বা করবন্ধের আন্দোলন শুরু হলো। ২রা আগষ্ট গান্ধিজী নিজে বারদৌলী গেলেন সত্যাগ্রহের জন্য। অবশ্য চার দিনের মধ্যে সরকার মীমাংসায় আসার প্রতিশ্রুতি দিলে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধিজী দু'বছরের মেয়াদ দিয়ে ইংরেজ সরকারকে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস মঞ্জুর করার আহ্বান জানালেন। অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারা মাদ্রাজে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব থেকে যখন এতটুকু সরে আসবেন না জানালেন তখন তিনি ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের সময় সীমাকে কমিয়ে এক বছর করে দিলেন। অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। তথাপি জওহরলাল

ও সুভাষচন্দ্র গান্ধিজীর বিরোধিতা করে এক সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন। বলা বাহুল্য গান্ধিজীর উদ্যোগে এই সংশোধনী বাতিল হয়ে গেল। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "স্বাধীনতা অনেক শক্ত পদার্থ দিয়ে তৈরী। এটা কতগুলো কথার যাদু মাত্র নয়।" (ঐ ; পৃ, ৩৩৫) গান্ধিজীর কথামত মোতিলাল নেহেরু কলকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতার পরিবর্তে "স্বরাজ" শব্দটি গ্রহণ করলেন।

১৯২৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধিজীর উপদেশ মত বিদেশী বস্ত্র বয়কটের আহ্বান জানালো। মে' মাসে বোম্বাইতে আগামী দিনের সংগ্রামের তোড়জোড় করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি আবার বৈঠকে বসল। ঠিক হল আগষ্ট মাসের মধ্যে কমপক্ষে ৭'৫ লক্ষ সত্যাগ্রহীর নাম তালিকাভুক্ত করা হবে। ১১ই সেপ্টেম্বর আগ্রার জনসভায় গান্ধিজী বললেন, "আমি পুনরায় অসহযোগের ক্ষমতায় আস্থা জ্ঞাপন করছি। এখন থেকে আপনাদের সবাইকে ৩০শে জানুয়ারীর (১৯৩০) জন্য তৈরী থাকতে হবে। তাঁর ধারণায় গঠন-মূলক কর্মসূচীকে রূপায়িত করলেই ভারত স্বরাজের সংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে। (কৃপালনী ; পৃ. ১২৫)

সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে এ. আই. সি. সি.' র অধিবেশন বসল আগামী লাহোর অধিবেশনের সভাপতির নাম স্থির করতে। গান্ধিজী রাজী হলেন না। তিনি জওহরলালের নাম প্রস্তাব করলেন এবং ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে তা' মেনে নিল। যদিও বল্লভভাই প্যাটেলের নাম সভাপতির জন্য প্রস্তাব করেছিল পাঁচটি প্রাদেশিক কমিটি এবং জওহরলালের নাম তিনটি।

৩১শে অক্টোবর আরউইনের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে যে "দিল্লী ঘোষণাপত্র" ভারতীয় নেতারা জারী করেছিলেন জওহরলাল সুভাষচন্দ্রের সাথে এক মত পোষণ করেও শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষর দিলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর পূর্বে ঘোষণা মত সাক্ষর দিলেন পাল্টা ঘোষণাপত্রে। ২৩শে ডিসেম্বর গান্ধিজী ভাইসরয়ের সাথে দেখা করে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট আশ্বাস আদায় করতে ব্যর্থ হলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "আমরা এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। সুদূর নয়, বর্তমান লক্ষ্যই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা" (···goal is complete independence") খ্রীষ্ট মাসের সময়ে লাহোর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি জওহরলাল নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করলেন। তেণ্ডুলকার লিখছেন, "কলকাতায় স্বধীনতা দাবীর ঘোষণাকে স্থগিত রাখার জন্য দায়ী গান্ধী ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন—যাতে বলা হল কংগ্রেস সংবিধানের প্রথম ধারায় উল্লেখিত স্বরাজ শব্দটির অর্থ গ্রহণ করতে

হবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।" ("...that the word Swaraj in the first article of the Congress Constitution shall mean Complete Independence." page. 384) ১৯৩০ সালের দারুণ শীতের মধ্যরাতে যখন স্বাধীনতার পাতাকা উত্তোলিত হল তখন সমবেত পঞ্চাশ হাজারের মত জনতা প্রাণভরে শ্লোগান দিল, "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" বা "ইনকিলাব জিন্দাবাদ।" লক্ষণীয় তেণ্ডুলকার 'বন্দেমাতরম' শব্দটির উল্লেখ করেননি। এটি বোধ হয় সেই মুহূর্তের মেজাজের সাথে মানানসই হতে পারেনি। (ঐ; পৃ. ৩৮৫) যদিও পরবর্তীকালে ওই ধ্বনি দিয়েই বহুলোক পুলিশের গুলীর সম্মুখীন হয়েছিল।

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট অধিবেশনের মঞ্চ থেকে নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করছেন আর অর্ধলক্ষ নারী-পুরুষ রাভী নদীর তীরে শীতের মধ্য রাতে সোচ্চারে শ্লোগান দিচ্ছে "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক"—সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে ভারতের জনসাধারণ কি চায়! তাদের শ্লোগানই বলে দিচ্ছে ভারতবর্ষ এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে। মনে রাখা প্রয়োজন, জওহরলাল নেহেরু শুধু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হননি, তিনি ওই একই বছর ভারতের উত্থিত শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্বও পেয়েছেন। লাহোর অধিবেশনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে নাগপুরে তিনি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (এ. আই. টি. ইউ. সি.) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ প্রত্যাহৃত হওয়ার দরুন জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবের গতিস্রোত রুদ্ধ হল। তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া শ্রমিক আন্দোলনেও অনুভূত হল। স্ট্রাইক বা ধর্মঘটের সংখ্যা শুধু হ্রাস পেল তাই নয় তার সাথে ধর্মঘটীদেরও। কিন্তু ১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৭০০,০০০ এবং ১২,৫০০,০০০ শ্রম দিবস নষ্ট হল শ্রমিক ধর্মঘটের জন্য। তবে তখনো পর্যন্ত আন্দোলনে আক্রমণাত্মক ঝোঁক ছিল না। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৬ সালে ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট বা কারখানা আইন প্রবর্তন করে শ্রমিকদের উপর নতুনভাবে দমন নীতি চালু করল। ১৯২৬ সালের শেষে দেখা যায় ভারতে অন্ততঃপক্ষে দু'শটি শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং এদের মোট সদস্যসংখ্যা ৩,০০০,০০০। তার মধ্যে ১২৫,০০০ জন এ. আই. টি. ইউ. সি.-র সদস্য। যার প্রতিষ্ঠাকালমাত্র ছ'বছর পূর্বে। শ্রমিক সংগঠনগুলির অর্থনৈতিক দাবির সাথে রাজনৈতিক দাবিও ক্রমশঃ যুক্ত হতে লাগল। এর কারণ ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের (বিশের দশকের গোড়ায় এবং ১৯২৫

সালে কানপুরে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন) শ্রমিক সংগঠনগুলিতে ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রহণ ও প্রভাব বৃদ্ধি। কম্যুনিষ্টরাই প্রথম ১৯২১-এ আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতাই যে ভারতের জাতীয় দাবী হওয়া উচিত, এই বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। পট্টভি সীতারামাইয়া তাঁর হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বই-এর প্রথম খণ্ডে এই বক্তব্যকে স্বীকার করেছেন। (উদ্ধৃতির জন্য, গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ; ইতিহাস-চর্চা: জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা; পৃ. ১৬; সংস্করণ, ১৯৮৫) অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মিটিং (এ. আই. টি. ইউ. সি.) গুলিতে কম্যুনিষ্ট এবং অন্যান্য চরমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের ক্রমশঃ প্রাধন্য বৃদ্ধি পেতে থাকায় প্রস্তাবগুলিতেও রাজনৈতিক মেজাজ এসে গেল। ১৯২৪ সালে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে পুলিশী অত্যাচারকে নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হল। ১৯২৫ সালে এ. আই. টি. ইউ. সি. নির্বাচনে শ্রমিকদের ভোটাধিকারের দাবী জানাল।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এ. আই. টি. ইউ. সি. (A. I. T. U. C.)-র নেতৃত্ব তখনও পর্যন্ত সংস্কারপন্থী এবং আপোষকামীদের হাতে ছিল। ফলে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে জড়িত কম্যুনিষ্ট ও সোস্যালিষ্টরা আরো প্রকাশ্যে কাজ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলেন। প্রধান কম্যুনিষ্ট নেতা এক সময়ে কংগ্রেস কর্মী এবং বর্তমানে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সম্পাদক, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রীপাদ তাঁর বইতে লিখেছেন, "বিচ্ছিন্নভাবে সোস্যালিষ্ট এবং কম্যুনিষ্ট গ্রুপের আবির্ভাব ঘটল কলকাতা এবং বোম্বাইয়ের মত শিল্পনগরীগুলিতে। ধীরে ধীরে তাঁরা অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মেও লিপ্ত হয়ে পড়লেন এবং এর ফলশ্রুতি হল ওয়ার্কাস এণ্ড পেজেণ্ট পার্টির (Workers' and Peasants' party) প্রতিষ্ঠা।" (দি মহাত্মা এণ্ড দি ইজম; পৃ. ৪৪; সংস্করণ, ১৯৮১) প্রকৃতপক্ষে বোম্বাই এবং কলকাতায় (অবশ্য এর নাম, "পেজেণ্টস এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি' (১৯২৫—২৬)। প্রতিষ্ঠাতা, মুজঃফর আমেদ, কবি নজরুল ইসলাম, কুতুবুদ্দীন আমেদ এবং চিত্তরঞ্জনের সেক্রেটারী (হেমন্তকুমার সরকার) কম্যুনিষ্টরাই প্রধানতঃ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফলে শ্রমিক আন্দোলনে স্বাভাবিকভাবে তাঁরাই পুরোভাগে এলেন। সোবিয়েত ঐতিহাসিকরা লিখছেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্কার্স এবং পোজেণ্ট পার্টির মাধ্যমে কম্যুনিষ্টরা তাঁদের প্রভাব শুধু শ্রমিকদের মধ্যে নয়, কৃষক এবং শহরে মধ্যবিত্তদের মধ্যেও বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে আরো বেশি করে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হল এবং তৈরী হল কৃষকদের নিয়ে "কিষান সভা" সংগঠন। ট্রেড

ইউনিয়ন এবং কিষান সভাগুলি পূর্ণ স্বাধীনতা এবং জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপের সপক্ষে ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠল। বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকাও এর সমর্থনে প্রকাশ করল এবং যার প্রভাব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের একাংশকেও প্রভাবিত করল। ফলে কংগ্রেসের মধ্যেও কিছুটা বামপন্থী মেজাজ পরিলক্ষিত হল—বলা বাহুল্য এটা প্রধানতঃ তরুণদের মধ্যেই দেখা গেছল। সোবিয়েত ঐতিহাসিকদের মতে কম্যুনিষ্ট এবং ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্টস পার্টির সদস্যরা মুক্তি আন্দোলনে নতুন জোয়ার আনাব পূর্বশর্ত পালন করেছিলেন তাঁদের কার্য-কলাপের দ্বারা। (হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, ২য় খণ্ড, পূর্বোল্লিখিত; পৃ. ১৮৪)

১৯২৭-২৮ সালে ভারতের অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশঃ তীব্র হচ্ছিল। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে। প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যের দাম দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। যেমন, গমের মূল্য ৫০ শতাংশ এবং পাটের ৫০ থেকে ৬৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। কাঁচা তুলোর সর্বভারতীয় গড় দাম (১৮৭৩=১০০) ১৯২৯ সালে ১৩৩ থেকে নেমে দু'বছরের মধ্যে ৭০এ দাঁড়ালো। বাংলাদেশে পাটের মূল্য (১৯২৯=১০০) অবিশ্বাস্যভাবে কিমে ১৯৩৪ সালে হল ৪৩'৫ এবং উত্তর প্রদেশে পাইকারী দাম (১৯০১-০৫=১০০) ১৯২৯ সালে ২১৮ থেকে এক বছরের মধ্যে হল ১৬২ এবং পরের বছরে অর্থাৎ ১৯৩১ সাসে ১১২ এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৩৪ সালে হল ১০৩। (সি. জে. বেকার, বি. বি. চৌধুরী এবং জ্ঞান পাণ্ডের লেখা প্রবন্ধগুলি; উদ্ধৃতির জন্য মডার্ণ ইণ্ডিয়া, সুমিত সরকার, পৃ. ২৫৭) ব্রিটিশ সরকার চিন্তা করছিল। জমির খাজনা নতুন করে বৃদ্ধি করতে আব জমিদাররা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে কাটিয়ে উঠার জন্য চাষীর কাছে দাবী করল সামগ্রর বদলে নগদ খাজনা। ফলে অধিকাংশ রায়ত ঋণের দায়ে তাদের প্রজাস্বত্ব হারাতে বসল। জমি হাত বদল হয়ে ঋণের দায়ে মহজেনের কুক্ষিগত হল। কৃষিক্ষেত্রে ঋণের মোট পরিমাণ ন'হাজার মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়ে ছিল। সংকট শুধু গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল না বিস্তৃত হয়েছিল শহরে। ছোট ছোট কারখানাগুলো কজের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল। ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী আথিক মন্দা ভারতেও অনুভূত হল। একদিকে যেমন শ্রমিকদের মধ্যে বেকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তেমনি অন্যদিকে ছোট ছোট পুঁজির মালিকরাও তাদের দোকান-পাট বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল। ১৯২৮-২৯ সালের সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, "বিগত বছরগুলির চেয়ে ভারতের শিল্প-জীবন অনেক বেশি অশান্তিপূর্ণ।" অর্থনৈতিক সংকট যত তীব্র হল ভারতের জন জীবনেও তত বেশি করে বামপন্থী ও চরমপন্থী চিন্তাধারা প্রভাব ফেলতে লাগলো। স্বভাবতঃই কৃষক ও শ্রমিকরা এর আওতায় এসে পড়ল।

দেশের বহুস্থানে শ্রমিক ও কৃষকেদের নিয়ে সংগঠন তৈরী হল। অধিকাংশ স্থানেই নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এল সাম্যবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ দল এবং গোষ্ঠীগুলি। উত্তর প্রদেশে জমি-সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবীতে এবং গুজরাটে সরকারের ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে কৃষকরা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে নেমে পড়ল। শুধু কৃষকরা নয়, ১৯২৮ সালে খড়্গপুরে রেল শ্রমিকরা প্রায় দু'মাস ধরে ধর্মঘট করল। জামসেদপুরের টাটা কোম্পানীতে লৌহ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট করল। ধর্মঘটের অবসান ঘটল কেবলমাত্র সুভাষচন্দ্রের মধ্যস্থতায়। বোম্বাইতে সূতীকলের প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পাঁচ মাসের উপর বীরত্বের সাথে ধর্মঘট চালালো। বোম্বাইয়ের সূতীকল ধর্মঘট নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে দু'ধরনের ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল। জাতীয়তাবাদী সংস্কারকপন্থী যাঁরা মালিকের সাথে আপোষ করে দাবী আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যরা বিশেষ করে কম্যুনিষ্টরা দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে পিকেটিং, ধর্মঘট বা আরো কোনো প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। অচিরেই এই দু'টি বিপরীতমুখী দৃষ্টিভংগীর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল বোম্বাইতে সূতীকল ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে। বিশ শতকের শেষ দিকে সূতীকল মালিকরা তাদের অর্থনৈতিক বোঝা (ব্রিটিশ সরকারের শুল্ক-সংরক্ষণের সুযোগ দিতে অসম্মতি) শ্রমিকদের মজুরী হ্রাস করে লাঘব করতে চাইল। এরই প্রতিবাদে বোম্বাইয়ের সূতীকলগুলিতে ধর্মঘট শুরু হল আর জন্ম নিল কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে অধিকতর বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গিরনি কামগার ইউনিয়ন (**Girni Kamgar Union**)। ইউনিয়নের নেতারা আলভে (**A. A. Alve**) এবং কাসলে (**G. R. Kasle**) তৎকালীন বোম্বাইয়ের অন্যান্য কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতা মীরাজকর, ডাঙ্গে এবং জোগলোকরের সংস্পর্শে আসেন। এছাড়া ইউনিয়নকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট বেন ব্রাড্‌লে (**Ben Bradley**) যিনি এসময়ে ভারতে শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত ছিলেন। ধর্মঘটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ধর্মঘটী শ্রমিকদের নিয়ে ৪২টি মিল কমিটি গঠন। মালিকপক্ষ কয়েক হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করলে প্রতিবাদ সংগঠিত হল আর তার জবাবে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে তারা কারখানায় লক আউট বা বন্ধ ঘোষণা করল। ফলে শ্রমিকদের সামনে ধর্মঘট করা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা রইল না। এই ধর্মঘট সর্বাত্মক এবং সম্পূর্ণ ছিল। ছ'মাসের এই ধর্মঘটে (এপ্রিল থেকে অক্টোবর, ১৯২৮) প্রায় দু'শ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল।

প্রচণ্ড অভাব, অনটনের মধ্যেও এই ধর্মঘট ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। ১৬ই আগষ্ট, ১৯২৮ সালে বোম্বাইয়ের গবর্ণর সেক্রেটারী অব ষ্টেটস বা ভারত সচিবকে এক গোপন পত্রে ধর্মঘটী শ্রমিকদের দৃঢ় মনোভাব সম্পর্কে লিখছেন, "আমার কাছে অবাক লাগছে লোকগুলো কিভাবে এখনও লড়ে যাচ্ছে···আমার আরো অস্বস্তি লাগছে এই ভাবে যে অনেক সময়েই মিল মালিকরা কারখানার একাংশ খুলে রাখছে। পুলিশি প্রহরারও যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তথাপি একটি লোকও কারখানায় ফিরে আসছে না।" (উদ্ধৃতির জন্য, সুমিত সরকার, পৃ. ২৭১) ধর্মঘটের অবসান ঘটল যখন মালিক পক্ষ মজুরী হ্রাস বাতিল করে ১৯২৭ সালের দেয়া মজুরীর হারকেই বহাল রাখতে সম্মত হল।

বলাবাহুল্য এই ঐতিহাসিক ধর্মঘট বোম্বাইয়ের আশেপাশের শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদেরও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। শোলাপুর জি. আই. পি. রেলওয়ে এবং তেলের ডিপোয় কর্মরত শ্রমিকরাও এই ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। আর্থিক সাহায্যের জন্য বিশেষ তহবিল সংগ্রহ হয়েছিল শুধু ভারতের নয় গ্রেট ব্রিটেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নেও। ধর্মঘটের সাফল্য গিরনি কামগার ইউনিয়ন অব টেক্সটাইল ওয়ার্কার্সকে সুতী শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার সরকারী স্বীকৃতি এনে দিল। গিরনি কামগার ইউনিয়ন মাত্র ৩২৪ জন সদস্য নিয়ে যার শুরু সেই বছরেই (১৯২৮) ডিসেম্বর মাসে তার সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল ৫ হাজার ৪ শত। আর ১৯২৯ সালের প্রথম তিন মাসে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬ হাজার ৫ শত।

বোম্বে সুতীকলগুলিতে ধর্মঘটের সাফল্য শিল্পপতি ও সরকারকে আরো প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুললো। নানা ধরনের বিবেকবর্জিত উপায় তারা অবলম্বন করল। ধর্মঘট শারীরিকভাবে ভাঙ্গার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাংশকে কাজে লাগাতে গিয়ে ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাইতে এক অভূতপূর্ব দাঙ্গা বেধে গেল। এই ঘটনায় যে সরকারের হাত ছিল কম্যুনিস্টরা তা' ফাঁস করে দিয়েছিলেন। মাসের পর মাস সাধারণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য গড়ে উঠেছিল তাকে ভেঙে ফেলাই এর উদ্দেশ্য ছিল। (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা; বি. টি. রণদিভে; পৃ. ১৯-২১; সংস্করণ, ১৯৮৫) সুমিত সরকার লিখছেন, ১৯২৮-২৯ সালে বাংলার গবর্নর এবং বোম্বাইয়ের গবর্নরদের মধ্যে যে সব পত্র বিনিময় হয়েছে সেগুলি পাঠ করলে দেখা যায় কিভাবে সরকার আতংকিত হয়ে পড়েছেন এবং ভারতীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দেশীয় পুঁজিপতিদের সর্ববিধ সাহায্য দিতে তাঁরা আগ্রহ

প্রকাশ করছেন। সরকার অবশ্য কোনোভাবে নিষ্ক্রিয় থাকেননি। তৈরী হল জন নিরাপত্তা বিল, প্রধানতঃ কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপকে খর্ব করার জন্য। সালিশী ব্যবস্থা প্রবর্তন, সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ ও অত্যাবশ্যকীয় সংস্থায় ধর্মঘটের অধিকার সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে ১৯২৯ সালের এপ্রিলে ট্রেড ডিসপিউট অ্যাক্ট পাশ করা হল। বি. টি. রণদিভের মতে কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের ধ্যান ধারণাগুলির প্রচার শ্রমিকদের মধ্যে চালিয়ে যাচ্ছিল এবং তার ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি, আরো বিশেষ করে রেলওয়ে ইউনিয়নগুলির মধ্যে তার প্রভাবের যে বৃদ্ধি ঘটছিল তা' সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।

এই দুইটি জনবিরোধী বিল সম্পর্কে কংগ্রেসের ভূমিকা বিস্ময়কর। সরকারী ভাবে জাতীয় কংগ্রেস বিলের বিরোধিতা করলেও আইনসভায় জন নিরাপত্তা বিল আলোচনার সময়ে দেখা গেল তাদের অধিকাংশ সদস্য কোন অজ্ঞাত কারণে অনুপস্থিত। (ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টারলি রেজিষ্টার, উদ্ধৃতির জন্য, সুমিত সরকার, পৃ. ২৭১-৭২)

কেবলমাত্র ১৯২৮ সালে পাঁচ লক্ষেরও উপর শ্রমিক, কর্মচারী বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলনে নেমে ছিল। ভারতীয় যুব সমাজও ধীর স্থির হয়ে বসে ছিল না। ইউথ লীগ তৈরী হয়েছিল এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছিল। জওহরলালের সভাপতিত্বে ১৯২৮ সালে প্রথম বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিপানচন্দ্র "মডার্ণ ইণ্ডিয়া" (Modern India) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, "তরুণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ক্রমশঃ সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকতে শুরু করল। দেশ যে সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অন্যায় থেকে ভুগছে তার বৈপ্লবিক সমাধানের কথা বলতে লাগল। তারা পূর্ণ স্বাধীনতার কর্মসূচী রাখল এবং তাকে জনপ্রিয় করার জন্য সর্ববিধভাবে নিজেদের নিয়োজিত করল।" (পৃ. ২৭৯-৮০; দিল্লী, ১৯৭৭) এই বিশেষ দশকেই রুশ বিপ্লবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সোস্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট গ্রুপ তরুণদের মধ্যে তৈরী হল। তারাচাঁদ লিখছেন, "১৯২৪ সালের মধ্যেই কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল।" (হিষ্ট্রি অব দি ফ্রিডম ম্যুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া; ৪র্থ খণ্ড; পৃ. ৮৪; ভারত সরকার, ১৯৮৩) ফলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। তরুণ কম্যুনিষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করল। অপরাধ—এঁরা সরকারের বিরুদ্ধে হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি করছিলেন এবং দেশবাসীর মধ্যে ছড়াচ্ছিলেন সাম্যবাদী ভাবধারা।

কোন অসংগতি খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল। অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী মন্তব্য করেছেন যে, কলকাতা কংগ্রেসে (১৯২৮) গান্ধিজীকে তাঁর নিজস্ব সৃষ্ট নির্জনতা থেকে টেনে আনা হয়েছিল। "...Was dragged in from his self chosen seclusion" (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম; পৃ. ১৭৫; কলকাতা, ১৯৬২) কিন্তু গান্ধিজীকে টেনে আনার কোনো ব্যাপারই ছিল না। কারণ তিনি জেল থেকে বেরোবার পর থেকেই কখনও রাজনীতিবর্জিত জীবন কাটান নি। এর প্রমাণ "ইয়ং ইণ্ডিয়া"র পৃষ্ঠাগুলি, এ. আই. সি. সি.'র সদস্যদের সাথে আলোচনা ও উপদেশ এবং দেশময় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ। "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় যেমন তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচীর উপর বক্তব্য রেখেছেন তেমনি ১৯২৪ সালে এ. আই. সি. সি.'র সদস্যদের বিবেচনার জন্য "পাঁচটি বয়কটে"র প্রস্তাবও রাখেন। তিনি যে নিষ্ক্রিয়—সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়াতে রাজী নন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্ততঃ ১৯২৪ থেকে ১৯২৮-এর ঘটনাবলী তাই বলে। কলকাতায় ব্রিটিশ সরকারের নিপীড়নমূলক অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে জনসভায় (১৯২৪) বক্তৃতাও করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখ্য, বেলগাঁওতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্বও করেছেন। অথচ এসবে তিনি অংশ নিয়েছেন ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯২৪) মুক্তি পাওয়ার কয়েকদিন পরেই। অথচ সে সময়ে তিনি জেলের বাইরে থেকেও জেল-মেয়াদের সময়কে স্বেচ্ছায় কারাবাস মনে করে রাজনীতিতে অংশ নেবেন না বলে ঘোষণা করেছিলেন। (তেণ্ডুলকার, মহাত্মা; ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭) ভারতের তৎকালীন অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিরতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের দাবী-দাওয়ার আন্দোলন। এরা শুধু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তাই নয় এদের মধ্যে একাংশ আবার রুশ বিপ্লবের প্রেরণায় সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। এরকম অবস্থায় অহিংসায় আস্থাবান এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনে অবিশ্বাসী গান্ধিজীর পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁরই ধারণা অনুযায়ী রাজা এবং জমিদাররা মানুষকে শোষণ করলেও "আমরা যদি আমাদের পদ্ধতিকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারি তাহলে তারা আমাদের ভয় বা অবিশ্বাস করবে না। আমরা কারুর ওপর জবরদস্তি করতে চাই না, আমরা তাদের পরিবর্তন করতে চাই। এই পদ্ধতি হয়ত দীর্ঘ মনে হতে পারে, বোধহয় খুব কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এটাই হ্রস্বতম।" (জওহারলালকে লেখা গান্ধিজীর পত্র; ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, যা' গান্ধিজীর সুযোগ্য

নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল তা তাঁরই চোখের সামনে অথবা নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বামপন্থী আদর্শে উদ্বুদ্ধ জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র প্রমুখ তরুণ নেতাদের নেতৃত্বে ক্রমশঃ সর্বহারা শ্রেণীর চরিত্র গ্রহণ করবে একথা তাঁর কাছে ছিল অচিন্ত্যনীয়। ১৯২৪ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে জওহরলাল লিখছেন, "এটা সত্য যে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁর (গান্ধিজী) তখনো বিশেষ কিছু জানা ছিল না এবং কংগ্রেসের ওপরতলার সদস্যদের মনে ভয় জাগাত।" (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী ; পৃ. ১২৮) নেহেরু আত্মজীবনীর অপর এক স্থানে লিখেছেন, "আমি বিশেষ করে কংগ্রেস কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলাম কারণ এঁরাই ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের মেরুদণ্ড।" (ঐ ; পৃ. ১৮২)

১৯২৭ সালে জওহরলাল যখন য়ুরোপ থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি দেখলেন "ভারতে এক অস্পষ্ট ভাসাভাসা সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়া বিদ্যমান।" তাঁর মতে শ্রমিক সংগঠনগুলি "নিশ্চিতভাবে সমাজতন্ত্রী এবং অধিকাংশ ইউথলীগও।" (ঐ পৃঃ ১৮৩) সুভাষচন্দ্র লিখছেন, ১৯২৩ সালের শেষ দিকে দেশের রাজনৈতিক হাওয়া আবার চাঙ্গা হতে শুরু করল…"the political barometer had once again begun to rise" (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, পৃঃ ৯৩) ১৯২৫ সালে ধর্মঘটের দরুন ১২,৫০০,০০০ শ্রম দিবস নষ্ট হল যা' ১৯২২ সালের চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বেশী ছিল। ১৯২৬ সাল সম্পর্কে সুভাষ চন্দ্র লিখছেন, দেশের তরুণ সমাজ জেগে উঠেছে। প্রাচীন পন্থীদের সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধতায় বিরক্ত। তারা দেশের "পচাগলা অবস্থা সম্পর্কে অধৈর্য ও বিদ্রোহ-মুখী।" (ঐ ; পৃঃ ১২৪-১২৫)

এ অবস্থায় গান্ধিজী জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সুভাষচন্দ্রের ভাষায় "কয়েক সপ্তাহের পরই তিনি প্রকাশ্য কাজকর্মে কৌতূহল দেখাতে শুরু করলেন এবং ক্রমশঃ স্বাভাবিক কাজগুলো হাতে তুলে নিলেন।" (ঐ ; পৃঃ ১০২) গান্ধিজী যখন জুহুতে ১৯২৪ সালের এপ্রিলে দাশ ও মোতিলালকে জানালেন তিনি কাউন্সিলে অংশগ্রহণের বিরোধী এবং অসহযোগের সপক্ষে— তার অর্থ দেশে তখনও অসহযোগ আন্দোলন চলছে, তবে তা' সীমিত এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিজেকে "নো-চেঞ্জার" (অর্থাৎ ১৯২১ সালের অসহযোগ কর্মসূচীর প্রতি আস্থাবান) বলার অর্থ ভারতের জনগণকে জানিয়ে দেওয়া যে তিনি এখনও আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং নেতৃত্ব দিতেও প্রস্তুত। "পাঁচটি বয়কট"-এর প্রস্তাব কংগ্রেসকে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন,

এগুলির প্রয়োজন "স্বরাজ" লাভের জন্য। তা' ছাড়া জনগণকেও তিনি "তিনটি কর্মসূচী" সফল করার উপদেশ দিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই এবং খদ্দর প্রস্তুত ও পরিধান। বিদ্রোহমুখী অধৈর্য জনগণকে নিশ্চয়তা দিলেন যদি এগুলি তারা সাফল্যের সাথে কাজে রূপায়ণ করতে পারেন তাহলে তাদের আর পুনরায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করতে হবে না। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণ চাইছিল নেতৃত্ব এবং কর্মসূচী। গান্ধিজী এদু'টোই দিলেন। তবে জওহরলাল কথিত সমাজতন্ত্রের কোনো ছিটে-ফোঁটাও এতে ছিল না। না ছিল শ্রমিক, কৃষককে সংগঠিত করার কোনো উপযুক্ত কর্মসূচী আর না ছিল অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে কোনো সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। যে খদ্দরের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে তিনি কমরেড সাকলাতওয়ালাকে "স্বরাজ" আনবেন বলে জানিয়েছিলেন সেখানেও তিনি ব্রিটিশ শোষণকে নিশ্চিহ্ন করার কোনো কথা বলেননি। কেবল বলেছিলেন ব্রিটিশ শোষণকে অকার্যকরী বা যোগা-যোগকে বিশুদ্ধকরণের কথা…"must sterilize the British exploitation at its centre. It is calculated to purify the British Connection." শ্রমিকদের কাছে স্বতন্ত্র কর্মসূচী গান্ধিজীর পক্ষে পেশ করা সম্ভব ছিল না। তিনি শ্রমিকদের সাথে মালিকের মধ্যেও মানবিক গুণের সন্ধান পান এবং তাঁর মনে হয় কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সহানুভূতিশীল। একারণেই টাটা কোম্পানীর মালিক শ্রীরতন টাটা তাঁর কাছে খুবই সম্মানিত ব্যক্তি। টাটা যে তাঁর বক্তৃতায় শুধু সভাপতিত্ব করেন তাই নয়, গান্ধিজী স্বরাজ লাভের আন্দোলনের জন্য তাঁর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যও গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না। (মহাত্মা ; ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৬) আর এ জন্যই গান্ধিজী সমবণ্টনের পরিবর্তে ন্যায় বিচারপূর্ণ বণ্টনের কথা বলেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তকে অর্থ নৈতিক শোষণ থেকে রক্ষা করার সুস্পষ্ট কোনো প্রতি-শ্রুতি না দিয়েও গান্ধিজী কি করে সমাজের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন লাভ করেছিলেন? সুভাষচন্দ্র এর একটা উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মতে মহাত্মা গণ-মানসিকতাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ছিলেন। যেগুলির জন্য প্রধানতঃ ভারতের পতন ঘটেছিল, দেশবাসীর সেই সব চারিত্রিক দুর্বলতাকে গান্ধিজী ব্যবহার করেছিলেন। ভারতবাসীর চরিত্রের দুর্বল দিকগুলি বলতে সুভাষচন্দ্র বুঝিয়ে ছিলেন, অতি প্রকৃত শক্তিতে বিশ্বাস, আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তির প্রতি ঔদাসীন্য এবং নিঃস্তরঙ্গ জীবন যাত্রায় অভ্যাস। (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ; পৃ. ১১৪) সুভাষচন্দ্রের বর্ণিত উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও জনগণের মনে একটা

বিশ্বাস জন্মেছিল যে গান্ধিজীর "স্বরাজ" পুরাণে কথিত রামরাজ্যের পুনরাবির্ভাব ঘটাবে। শ্রমজীবী মানুষের মনে হয়েছিল ভবিষ্যতে ওই রামরাজ্যে সে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না। কারণ গান্ধিজী দরিদ্রকে নারায়ণের সমতুল্য মনে করতেন। দরিদ্রের বন্ধু সেই গান্ধিজী ১৯২৭ সালের ১৬ই নভেম্বর কলোম্বোতে (Colombo) 'লেবর ইউনিয়ন"-এর সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, "হে শ্রমিক বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের প্রাপ্য থেকে এখনো পর্যন্ত বঞ্চিত এবং বোধ হয় সেই কারণেই রামের সাহায্যের এবং দয়ার আরও প্রয়োজন।" (মহাত্মা; ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭) তবে স্মরণ করা যেতে পারে রামও একজন রাজাই ছিলেন, যিনি প্রজা-শাসন করতেন। অবশ্য গান্ধিজী সেই রামের সন্ধান করতে বলেছেন প্রত্যেক শ্রমিককে তাঁর হৃদয়ের মধ্যে।

আমেদাবাদ, বোম্বাইতে বড় বড় কাপড়ের মিলগুলিকে চালু রেখে, হাতে-বোনা খদ্দরের সুতো দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে নিজের পরিধান বস্ত্র নিয়মিত প্রস্তুত করা জনসাধারণের নিকট কতখানি আকর্ষণীয় হবে বা আর্থিক বৈষম্য দূর না হলে অস্পৃশ্যতার মূলোচ্ছেদ অথবা হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার স্থায়ী সমাধান সম্ভব কিনা, এসব প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় গান্ধিজী যদি সক্রিয় অসহযোগিতাকে স্বরাজ লাভের অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করতেন তাহলে উপরোক্ত তিনটি কর্মসূচীও বহুল পরিমাণে রূপায়িত হত। কিন্তু গান্ধিজী ওই তিনটি কর্মসূচীকেই অসহযোগ আন্দোলনের সমার্থক বলে বিবেচনা করেছিলেন। বস্তুতঃ ভারতে গণ-আন্দোলনের পথিকৃত হয়েও স্রষ্টিকর্তা যখনই লক্ষ্য করেন সৃষ্ট বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন তখনই তিনি সংখ্যার চেয়ে গুণের উপর গুরুত্ব দেন। আন্দোলন শুরুও করেন প্রতীক বা সিম্বল হিসেবে। বারদৌলী বা ডাণ্ডীও সে কারণেই প্রতীক—তা' সে রাজস্ব বৃদ্ধি অথবা লবণ কর বৃদ্ধিই হোক। ১৯২১ সালের ৩১শে জানুয়ারী সুরাটে গান্ধিজীর পরামর্শে ওয়ার্কিং কমিটি বারদৌলী সত্যাগ্রহ সম্পর্কে যে প্রস্তাব নিল তাতে ভারতের অন্যান্য অংশের দেশবাসীকে উপদেশ দেওয়া হল তারা যেন কোনো উগ্র গণ-আইন অমান্যের (অথবা ব্যক্তিগত) বিক্ষোভ থেকে বিরত হয়ে বারদৌলীর সত্যাগ্রহকে সহযোগিতা করেন। (ঐ; পৃ. ৭৯) ডাণ্ডী অভিযানের ক্ষেত্রে গান্ধিজীকে যখন ওয়ার্কিং কমিটির সহকর্মীরা প্রশ্ন করলেন পূর্ণ স্বরাজের দাবীতে অসহযোগ আন্দোলনে তাঁরা কি করবেন? গান্ধিজী তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উত্তর দিলেন। "আমার শুরু করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। একবার ওখানে পৌছালেই (ডাণ্ডী) কর্মসূচী বেরিয়ে আসবে।" ("Once I march to the place the idea

will be released.") আর সত্যাগ্রহ যেখানে সংখ্যার উপর নির্ভরশীল নয় সেখানে একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহীর সন্ধান পেলেই গান্ধিজী খুশী। "One perfect Satayagrahi is enough to vindicate truth." তাঁর কাছে "truth" বা "সত্যই" হল স্বরাজ। প্রকৃতপক্ষে গান্ধিজী চান নেতা হিসেবে আন্দোলন যেন তাঁর পরিকল্পিত রূপরেখার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। অহিংসা এবং হিংসার সীমারেখা যেন মিলে-মিশে একাকার না হয়ে যায়। যদিও তিনি আন্দোলনে নেমে ব্রিটিশ শাসনকে অভিশাপ এবং শয়তানের শাসন মনে করে গর্জে ওঠেন। "আমরা আর বায়বীয় শান্তিতে সন্তুষ্ট থাকতে নারাজ। আমরা অন্ধকার বিশৃঙ্খলার ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত যদি তার দ্বারা শোচনীয় দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।" (ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০) বাস্তব রাজনীতিক হিসেবে গান্ধিজীর এটাও অজানা নয় যে "আইন অমান্য আন্দোলন হিংসাপূর্ণ আইন অমান্যতে পরিবর্তিত হতে পারে। আমি (গান্ধী) দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি এটা অসম্ভব ঘটনা নয়।" (ঐ; পৃ. ৭)

নেতৃত্ব সম্পর্কে সজাগ বলেই গান্ধিজী স্বরাজকে সত্যের অপর নাম বলে ব্যাখ্যা দিলেও যখন সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তখন কিন্তু তিনি স্বরাজের কোনো আত্মিক ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট থাকেননি। কংগ্রেসের সহকর্মীদের তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "স্বরাজ" অর্থে তাঁরা যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বা কমন-ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস" বোঝেন। ১৯২৫ সালের জুন মাসে দেশবন্ধু মারা যাওয়ার পর সুভাষচন্দ্র দুঃখ করছেন। দেশের সেই সংকটময় মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল গান্ধিজীর নেতৃত্বের। কিন্তু তিনি তাঁর স্বেচ্ছা আরোপিত নির্বাসন (১৯২৬ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর) থেকে বেরিয়ে এলেন না। তাঁর মতে ইতিহাসের গতি বদলে যেত কিন্তু "ভারতের দুর্ভাগ্য তিনি তা করলেন না।" (ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল; পৃ. ১১৬) অথচ বছরের শেষে তিনি নির্বাসন থেকে বেরিয়ে গৌহাটী কংগ্রেসে সক্রিয় ভূমিকা নিলেন এবং ফলাফল হিসেবে "পূর্ণ স্বাধীনতা"র প্রস্তাবটি বাতিল হল।

গান্ধিজীর কাছে নেতৃত্বে থাকা এবং নেতৃত্ব দেওয়া কোনো সংকীর্ণতার বিষয় ছিল না। এটি তাঁর কাছে দীর্ঘকাল ধরে গড়ে-তোলা একটি আদর্শকে রূপায়নের প্রশ্ন ছিল। সে আদর্শটি হল আন্দোলনের মাধ্যমে স্বরাজ লাভ। যে স্বরাজে শ্রমিকরা সুবিচার পাবে কিন্তু কর্তব্য হবে "তোমার মালিকের ব্যবসাকে নিজের আপন ব্যবসা মনে করে সৎ এবং অচঞ্চল দৃষ্টি দেবে।" (মহাত্মা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮) গান্ধিজীর চিন্তাধারায় "দক্ষিণ আফ্রিকা, চম্পারণ অথবা আমেদাবাদে"

তিনি যে ধরণের শ্রমিক সংগঠন গড়েছেন "তার মধ্যে পুঁজিপতিদের প্রতি কোনো বিরোধিতার মানসিকতা নেই।" ("was in no spirit of hostility to the Capitalists") অথচ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একদল মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে যারা অহিংসা আন্দোলনে কিছুটা হিংসার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত এবং শ্রমিক, কৃষকের প্রশ্নে সরাসরি শোষকের ভিত্তিমূলে আঘাতের দাবী জানাচ্ছে। যাদের গান্ধিজী কথিত রামরাজ্যে আস্থার অভাব। ১৯২২ সালে আন্দোলন হিংসার নাম করে প্রত্যাহার করে নেওয়ায় জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ অনেক নেতা প্রকাশ্যে তাঁদের অসন্তোষ ব্যক্ত করেছিলেন। এই সব নেতারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সামন্ততান্ত্রিক বিরোধিতাতেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এলাহাবাদ থেকে ১৯২৮ সালের ১১ই জানুয়ারী জওহরলাল গান্ধিজীকে লেখা এক পত্রে সরাসরি অভিযোগ করছেন, "আপনি ভারতের অধিকাংশ স্থানে যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী ব্যবস্থা আছে তার বিরুদ্ধে অথবা শ্রমিক এবং ক্রেতাদের উপরে যে পুঁজিবাদী শোষণ চলেছে তার বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন না।" (উদ্ধৃতির জন্য ; কৃপালনী, পৃ. ৪৩৮) জওহরলাল উক্ত পত্রে গান্ধিজীর পুঁজি ও শ্রমের আপোষের বক্তব্যটিকে উড়িয়ে দিয়ে সরাসরি লেখেন "আমি মনে করি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই (পুঁজি ও শ্রম) সংঘর্ষ অনিবার্য।" সুভাষচন্দ্র গান্ধিজীর আকস্মিক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলে "এক সরকারী বিদ্রোহ" ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ; পৃ. ৭৩)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গান্ধিজী পরিকল্পিত কংগ্রেসের আন্দোলনে তাঁর সমালোচকরা কংগ্রেসের সদস্য হয়েও এক প্রতিবন্ধকতা বা বাধার দেওয়াল সৃষ্টি করছে। প্রয়োজন দল থেকে বহিষ্কার অথবা এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে করে তারা নিজেরাই সরে দাঁড়ায়। গান্ধিজী জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই কংগ্রেসের বৎসরে চার আনা (পঁচিশ পয়সা) দিয়ে সদস্য হওয়ার প্রথা রদ করে দেওয়ার প্রস্তাব আনলেন। পরিবর্তে স্বহস্তে তাঁত চালিয়ে প্রতি মাসের পনেরো দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশ তোলা সূতা অল ইণ্ডিয়া খাদি বোর্ডের সেক্রেটারীর কাছে জমা রাখলে সদস্য পদ পাওয়া যাবে বলে নতুন প্রস্তাব রাখলেন। প্রতি সদস্যকে অন্ততঃ দিনে আধ ঘণ্টার জন্য সূতা কাটতে হবে। গান্ধিজী ১৯শে জুন এই প্রস্তাব রেখে বললেন প্রত্যেক সদস্যের প্রথম কোটা ১৫ই আগষ্টের পরে যেন না পৌঁছায়। যিনিই পাঠাতে ব্যর্থ হবেন তারই সদস্যপদ কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলি থেকে খারিজ হবে এবং সংগঠনগুলির পুনরায়

নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। গান্ধিজীর মতে চার আনা বাৎসরিক সদস্যের হার নির্ধারিত করেও সারা দেশে মাত্র ৫০,০০০ হাজার সদস্য সংগৃহীত হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, কর্মীদের কাছে সদস্য সংগ্রহ করার কাজটি কষ্টসাধ্য। নতুন যে গুণাবলী ধার্য করা হল সদস্য পদ লাভের জন্য তার দ্বারা ব্যাপারটি আরো কষ্টসাধ্য হলেও গান্ধিজীর মতে পূর্বের চেয়ে বেশী নয়। অবশ্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্রবল বিরোধিতায় প্রধানতঃ স্বরাজপন্থীদের কাছ থেকে—যারা ছিলেন "পরিবর্তন কামী" বা "প্রো-চেঞ্জার", গান্ধিজী সদস্যপদ লাভের গুণাবলীর কঠোরতা বহুলাংশে হ্রাস করতে বাধ্য হলেন। সংশোধিত নিয়মাবলীতে (১৯২৫) বলা হল প্রতি মাসে সদস্যদের ২০০০ হাজার গজ সুতা কাটতে হবে অথবা "অনিচ্ছুক" সদস্যদের ওই পরিমাণ সুতা কাউকে দিয়ে কাটিয়ে জমা দিতে হবে। (মহাত্মা ; পৃ. ১৭৫, ২য় খণ্ড) অনিচ্ছুকদের জন্য এই সহজ ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা করলেও গান্ধিজী তাঁর প্রতিপক্ষদের সুতা কাটা-ভোটাধিকার বা "স্পিনিং ফ্রানচাইজ" গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হলেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২৫ সালের শেষে (সেপ্টেম্বর, ২২শে) পাটনায় স্থির হল, যে কোনো ব্যক্তি বছরে চার আনা অথবা ২০০০ গজ সুতা কাটলে কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভ করতে পারবে।

কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভের উপর যখন কোনো বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারলেন না, তখন গান্ধিজী কংগ্রেস এবং কংগ্রেসীদের উপর তাঁর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হলেন। এই কাজ শুরু করলেন পাটনার ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক থেকে—যখন দেশবন্ধু মারা গেছেন (জুন মাস, ১৯২৫) এবং সুভাষচন্দ্র দুঃখ করছেন গান্ধিজী প্রকাশ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন না বলে তিনি তৈরি করলেন অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন (এ. আই. এস. এ.) যার শাখা প্রদেশগুলির সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। উদ্দেশ্য, হাতে বোনা সুতা এবং খদ্দরের উন্নতি ও প্রচার করা। তেণ্ডুলকার মন্তব্য করেছেন, "পাটনায় (সেপ্টেম্বর ১৯২৫) এ. আই. এস. এ.-র জন্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।" (মহাত্মা ; পৃ. ২০৪) সত্যই তাই —কারণ এ. আই. এস. এ.'র দ্বারা খদ্দর বা সুতাকাটা কতটা জনপ্রিয় হয়েছিল এ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ সমালোচক প্রশ্ন তুলতে পারেন, তবে একথা অনস্বীকার্য এই ঘটনা গান্ধিজীকে বহু জানা-অজানা কংগ্রেসীদের কাছে পরিচিত ও জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছিল। সুভাষচন্দ্র লিখছেন, "তাঁর (গান্ধিজী) নেতৃত্বে অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের শাখা সর্বত্র বিস্তৃত হল। এই সংগঠনের

মাধ্যমে মহাত্মা নিজের দল (গ্রুপ) তৈরি সংগঠনকে পুনর্দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।" (ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল; পৃ. ১২৪)

১৯২৬ সালে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব বাতিল করে দিলে গান্ধিজীর নিকট তা' "সুস্থতা" ("Sanity")-র উদাহরণ বলে মনে হয়েছে। তিনি দেশবাসীকে কোনো একটি নিশ্চিত সংজ্ঞার চেয়ে "সংজ্ঞাবিহীন স্বরাজ" গ্রহণ করতে অনুরোধ করছেন। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেস স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ করলে তাঁর কাছে মনে হয়েছে এটি একটি "চিন্তাহীন" কাজ। ১৯২৮ সালে ১২ই জানুয়ারী লেখার মধ্য দিয়ে "ইণ্ডিপেনডেন্স" বা "স্বাধীনতা" প্রস্তাবটিকে তীব্র আক্রমণ করে পুনরায় "স্বরাজ" শব্দটির পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হলেন। পরিষ্কার জানালেন, "স্বাধীনতা আমার লক্ষ্য, এর বিরোধিতা করি।" ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস" আদায়ের জন্য প্রথমে ব্রিটিশ সরকারকে দু'বছরের সময় সীমা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরোধিতার সামনে দাঁড়াতে না পেরে গান্ধিজী পিছু হঠে এক বছর করতে বাধ্য হলেন; অর্থাৎ আন্দোলন এড়িয়ে চুপচাপ দেখা ইংরেজরা এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস মঞ্জুর করেছে কিনা; কলকাতা কংগ্রেসে (১৯২৮) জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র আনীত "প্রস্তাবকে পুনরায় বাতিল করে দিলেন গান্ধিজী। তিনি কংগ্রেসকে দিয়ে "স্বরাজ" শব্দটি গ্রহণ করালেন। কিন্তু ১৯২৯ সালে ভাইসরয়ের কাছ থেকে "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস" সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে বললেন, আমাদের "বর্তমান লক্ষ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।" শুধু তাই নয়, লাহোরে তিনি নিজে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, "স্বরাজ" শব্দটির অর্থ "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা" শব্দ বাতিল করে "স্বরাজ" গ্রহণ করেছেন এই কারণে যে তা' কেবল বর্তমান কথা বলে। এর ফলে "সীমিত দৃষ্টিতে সীমিত ক্ষেত্রে" কাজ করা সম্ভব হবে। "স্বাধীনতা"র সংজ্ঞা নিয়ে শুধু বিতর্ক আছে তাই নয়—"আমরা জানিনা আমাদের দূরলক্ষ্য" অথচ ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে (ভাইসরয়ের দ্বারা প্রত্যাখাত হওয়ার পরে) তিনি সেই স্বরাজের অর্থ শুধু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বললেন এটি "দূর নয়, বর্তমান লক্ষ্য।" ১৯২৮ সালের ১২ই জানুয়ারী গান্ধিজী লিখছেন, "আমি স্বাধীনতা চাই না কারণ এটি আমার বোধগম্য নয়" কিন্তু তিনি "ইংরেজ জোয়াল থেকে মুক্তি (freedom) চান।" (মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃ. ৩২৬) কিন্তু এগারো মাসের মধ্যেই তাঁর মনোনীত প্রেসিডেন্টের কণ্ঠে গর্জিত হল, "স্বাধীনতার অর্থ আমাদের নিকট ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ এবং আধিপত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি।"

গান্ধিজীও ডাক দিলেন, "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ("Complete Independence").

গান্ধিজী কোনো ভণ্ড রাজনীতিক ছিলেন না। তিনি তাঁর লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে সরে দাঁড়াবার মত দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না। তবে তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী "কৌশলে" বিশ্বাসী ছিলেন। কাউন্সিলে যোগদানের বিরোধী হয়েও ১৯২৪ সালে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হল, আপনি কেন স্বরাজপন্থীদের কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করতে বলছেন না? তাঁর উত্তরে তিনি জানান নীতি স্থির রেখেও আশু প্রয়োজনে কৌশলের উপর নির্ভর করতে হয়। (ঐ; পৃঃ ১৪৫) ১৯২৭ সাল থেকে ভারতের ক্রমবর্ধমান শ্রমিক, কৃষক অসন্তোষ ও কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বাম রাজনীতির সমর্থকদের জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রভাব বৃদ্ধি গান্ধিজীর দৃষ্টি এড়ায়নি। সাইমন কমিশনের গঠন সম্পর্কে সমস্ত ভারতীয় নেতারা বিরাগ মন্তব্য করলেও গান্ধিজী তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেননি। ইতিমধ্যে কমিশনের ভারত সফর উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী বিক্ষোভের ঝড় উঠল। কলকাতার কংগ্রেস তেণ্ডুলকারের বর্ণনা অনুযায়ী "সম্মুখীন হল বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের" আশা-আকাঙ্ক্ষার। এক বছরের জন্য অপেক্ষা করার অনুরোধে অধৈর্য পঞ্চাশ হাজারের (শ্রমিক) অধিবেশনস্থলে পৌছে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানালো এবং তারপর তারা কংগ্রেস মণ্ডপ দখল করে আশু স্বাধীনতার সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করল। (ঐ; পৃ. ৩৩৬) রজনীপাম দত্ত ঐ শ্রমিকদের সংখ্যা আনুমানিক পঁচিশ হাজার লিখেছেন এবং কিছু প্রত্যক্ষদর্শী যাঁরা এখনও জীবিত আছেন, তাঁরা বলেন, গান্ধিজীর অনুমতিক্রমে শ্রমিকদের অধিবেশনে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় এবং শ্রমিকরা কোনো আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেননি, তাঁরা সুশৃঙ্খল ছিলেন। যাইহোক, গান্ধিজী লক্ষ্য করেছিলেন নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণে জওহরলালের আপত্তির কারণগুলি। জওহরলালের মতে ওই রিপোর্টে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি—উপরন্তু ওই দুটি বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধিজীকে অগ্রাহ্য করে জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র তরুণদের সমর্থনে পূর্ণ স্বাধীনতার সপক্ষে প্রস্তাব আনার সাহস দেখিয়েছিলেন। যদিও প্রস্তাবটি গান্ধিজীর ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে বাতিল হয়ে যায় তথাপি প্রস্তাবের অনুকূলে মোট ভোটের প্রায় বিয়াল্লিশ শতাংশ পড়েছিল—এই তাৎপর্যমূলক ঘটনাটি গান্ধিজীর মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিকের দৃষ্টি এড়ায়নি। সুতরাং প্রধান

লক্ষ্য হল বামপন্থী মনোভাবাপন্ন রাজনীতিকদের একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং কৌশলগত দিক থেকে উদ্দেশ্যকে স্থির রেখে শব্দ সম্পর্কে কিছুটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ। অর্থাৎ প্রয়োজনে স্পর্শকাতরতাকে গুরুত্ব না দেওয়া। ইতিমধ্যে ১৯২৯ সালের মার্চে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়েছে। গঠিত হয়েছে হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশন এবং তরুণদের নিয়ে তৈরী হয়েছে ছাত্র সংগঠন ও ইউথলীগ। বস্তুতঃ বাতাসে বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। গান্ধিজী দেখতে পাচ্ছেন তাঁর প্রচারিত অহিংস আদর্শ এক দিক থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, শুধু তাই নয়, তাঁর নেতৃত্বও। এরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বল্লভভাই প্যাটেলের চেয়ে দু' ভোট কম পাওয়া সত্বেও সত্যের পূজারী গান্ধিজী জওহরলালকে লাহোর কংগ্রেসের ভাবী সভাপতি মনোনীত করলেন। কারণ তরুণদের মধ্যে সমাজতন্ত্রী হলেও জওহরলাল ছিলেন গান্ধিজীর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অনেক নিরাপদ। তাঁর অন্ধ আনুগত্যের প্রমাণ তিনি ইতিপূর্বে বহুবার পেয়েছেন। জওহরলাল যখনই গান্ধিজীর আন্দোলন বা নীতি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তখনই তিনি তাঁর কাছে তিরস্কৃত বা সমালোচিত হয়েছেন এবং কৌতূহলের বিষয় সবশেষে তিনি গান্ধিজীর বক্তব্যকেই মেনে নিয়েছেন। এ কারণে ১৯২৭ সালের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে গান্ধিজীর তিরস্কারকে জওহারলাল শেষ পর্যন্ত সঠিক বলে মনে করেছেন। এমন কি ১৯২৮ সালের জানুয়ারীতে লেখা এক পত্রে গান্ধিজী জওহরলালকে জানিয়ে ছিলেন, "তোমার ও আমার মধ্যে তফাত এত বেশী যে এর মধ্যে কোনো আপোষ করার জমি নেই।" তথাপি জওহরলাল গান্ধিজীকে পরিত্যাগ করেননি। জীবনীকার ফ্রাংক মোরেসের ভাষায় জওহরলালের কাছে "দেশ ও কংগ্রেসের প্রতি বৃহত্তর আনুগত্য গান্ধীর সাথে সমার্থক" ছিল। (জওহারলাল নেহেরু ; পৃ. ১২৪-২৫) গান্ধিজীর প্রতি আনুগত্যকে জওহরলাল নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। "আমি অন্ধ ছিলাম।" যদিও তিনি জানেন, "নেতার প্রতি এই অন্ধতা ক্ষমার অযোগ্য।" (উদ্ধৃতির জন্য ; ঐ, পৃ. ২৩০) জওহরলালের সভাপতির পদে এই মনোনয়ন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, "মহাত্মার সাথে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নতুন করে বোঝাপড়া ঘটল এবং এর ফল হিসেবে শেষোক্ত জনের সাথে কংগ্রেসের বামপক্ষের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হল।" (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ; পৃ. ১৬৯) সুভাষচন্দ্র লিখছেন, জওহরলাল ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে য়ুরোপ ভ্রমণ শেষে ভারতে এসে নিজেকে পুরোপুরি সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন এবং গান্ধিজীর বিরুদ্ধাচরণে নেমে পড়েছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় গঠিত

হয়েছিল "ইনডিপেনডেন্স লীগ।" সুতরাং "মহাত্মার কাছে জরুরী ছিল বামপন্থীয় বিরোধিতাকে দাবিয়ে রাখার জন্য জওহারলাল নেহেরুকে নিজের কাছে টেনে আনা।" শুধু তাই নয়, বামবিরোধিতা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য যে ওয়ার্কিং কমিটি (১৯৩০ সালের জন্য) তৈরী হল তাকে যে পনেরো জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গান্ধিজী তালিকা পেশ করলেন সেখানে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সুভাষচন্দ্র বসু এবং "অন্যান্য বামপন্থীদের ইচ্ছাপূর্বক বাদ দিলেন।" তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে তিনি এমন একটি কমিটি চান যারা একাত্ম হয়ে কাজ করবে। (ঐ; পৃ. ১৭৪-১৭৫) অর্থাৎ গান্ধিজীর চিন্তা এবং কর্মপন্থা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুলবে না।

ফলে লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেও বিনা দ্বিধায় গান্ধিজী তিন মাসের মধ্যে (২রা মার্চ, ১৯৩০) ভাইসরয়কে আশ্বস্ত করেন। জানেন পুতুল ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর বিরোধিতা করবেন না। "স্বাধীনতার প্রস্তাবে আতংকিত হওয়ার কারণ নেই।" কেননা, গান্ধিজী স্মরণ করিয়ে দেন, "দায়িত্বশীল ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা" ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসকেই প্রায় স্বাধীনতা বলে স্বীকার করেছেন। (মহাত্মা; ৩য় খণ্ড; পৃ. ১৫) এমন কি তিনি আইন অমান্য আন্দোলনও বন্ধ করে দিতে প্রস্তুত যদি ইংরেজ সরকার "বহিরঙ্গে না হলেও স্বায়ত্ত শাসনের সারবস্তু মঞ্জুর" করতে রাজী থাকেন। লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত পূর্ণ স্বরাজের বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete Independence)-এর পরিবর্তে তিনি এগারো দফা দাবী মেনে নিতে আহ্বান জানালেন। তিনি ভাইসরয়কে কথা দিলেন, যদি সরকার এগুলি মেনে নেয় তাহলে তাঁকে "আইন অমান্যের বিষয়" শুনতে হবে না। (ঐ; পৃ. ১০) এগারো দফা দাবীগুলির মূল কথা হল, আর্থিক সম্পর্কিত আইনগুলির কঠোরতা হ্রাস; রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি (ব্রিটিশ বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা ছাড়া); এবং বিদেশী বস্ত্রকে কোনো রকম শুল্কের রেহাই না দেওয়া। দাবীগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ব্রিটিশ শাসনকে কিছুটা সহনীয় করার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু শাসন মুক্তির বা ব্রিটিশের বেড়াজাল ছিন্ন করার কোনো কথাই উচ্চারিত হয়নি। অথচ কংগ্রেসের সভাপতি বলছেন, স্বাধীনতার অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন (সভাপতির সুস্পষ্ট বক্তব্য সত্ত্বেও) গান্ধিজীর মনোনীত প্রার্থীদের দিয়ে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি আগামী দিনের আইন অমান্য আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক হিসেবে গান্ধিজীকেই নির্বাচিত করেছে। আন্দোলনের

জন্য যা' কিছু উচিত বিবেচনা করবেন তা' করার সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত হয়েছে। সুতরাং ভাইসরয়কে গান্ধিজীর নিশ্চয়তা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন শুরু করার পূর্বেই "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা" প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ মেজাজ শুধু হালকা হয়ে গেল তাই নয় আন্দোলনে সম্ভাব্য যোগদানকারীরাও অনেকটা সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং সময়ের ব্যবধানে আন্দোলনের গতিবেগও যে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে একথাও নিশ্চিত-ভাবে বলা যায়।

(৫)

লবণ সত্যাগ্রহের এক মাস পরে মে' মাসে গান্ধিজী গ্রেপ্তার হলেন। দেশময় তুমুল বিক্ষোভের মোকাবেলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মরীয়া হয়ে মারমুখী আচরণ শুরু করল। এই আন্দোলনে সর্বপ্রথম ভারতীয় মহিলারা নিশ্চিন্ত গৃহ কোণ পরিত্যাগ করে প্রকাশ্যে এলেন। পিকেটিং, বিদেশী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ এবং সত্যাগ্রহে দলে দলে সামিল হলেন। তাঁরাও পুরুষদের মত পুলিশের বর্বোরোচিত নির্যাতনের সম্মুখীন হলেন। শ্রমিকরা পিছিয়ে রইল না—ধর্মঘট শুরু করল। কৃষকরা বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দিল। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থান অস্ত্রাগার দখলের মাধ্যমে।. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জনগণ সাহসের সাথে কয়েকদিন পেশোয়ার শহর দখল করে রইলো। ইংরেজদের বেতনভূক গাড়োয়ালী সৈন্যরা বিদ্রোহীদের উপর গুলী চালাতে অসম্মতি প্রকাশ করে সাম্রাজ্যবাদসৃষ্ট সেনা বাহিনীর শৃঙ্খলাকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসলো। সরকারের তরফে দমনমূলক অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স পাশ হল। কোথাও সামরিক আইন বলবৎ করা হল। বেআইনী ঘোষিত হল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সম্পর্কিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান। গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৬০,০০০ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় লক্ষে পৌছালো। জেলখানায় স্থান সংকুলান হল। গ্রেপ্তারের চেয়ে দৈহিক নির্যাতনের দিকে সরকার বেশি করে ঝুঁকলো। লাঠি, চাবুক ও গুলীতে হত ও আহতের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। তবু ভারতের জাগ্রত বিপ্লবী চেতনায় ভাঁটা পড়ার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। নিঃস্তেজ হল না স্বাধীনতার পিপাসা।

অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১-২২) তুলনায় কারাবরণকারীদের সংখ্যা প্রায় তিন গুণ ছিল। জওহরলাল এর সংখ্যা এ. আই. সি. সি.-র রিপোর্টে দিয়েছেন, ৯২,১২৪ জন। স্থানগুলি বাংলা, বিহার, ইউ. পি.' উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত প্রদেশ, বম্বে সিটি, দিল্লী, গুজরাট, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র এবং সেন্ট্রাল প্রোভিন্স। উল্লেখযোগ্য এর মধ্যে সবচে বেশি সংখ্যক আইন অমান্যকারীরা এসেছিলেন বাংলা, বিহার, ইউ. পি. এবং পাঞ্জাব থেকে। (সুমিত সরকার, পৃ. ২৮৯) বাংলার ছিল সর্ববৃহত—১৫,০০০ জন।

সম্প্রতি কিছু ঐতিহাসিক আইন অমান্য আন্দোলনকে কিছুটা লঘু করে দেখানোর জন্য বিভিন্ন প্রদেশের উপর অনুসন্ধানের আলো ফেলে এই সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন অনেক জায়গাতেই বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। এর উপর তাঁদের বক্তব্য শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী আশানুরূপ এগিয়ে আসেননি। এধরণের গবেষণায় রমেশচন্দ্র মজুমদারের সাথে হাত মিলিয়েছেন জুডিথ ব্রাউন।

প্রথমতঃ এই আন্দোলনকে সাধারণ মানুষ সত্য সত্যই কি ভাবে নিয়েছিল, তা'যদি জানতে পারা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে শেষ পর্যন্ত কারাবরণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত না হ্রাস পেত। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে এ. কে. গোপালনের বয়স ছিল ছাব্বিশ এবং তিনি ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। গান্ধিজীর আহ্বানে একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্মী হিসেবে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে কেরালার কালিকট অঞ্চলে আসেন সত্যাগ্রহ সংগঠিত করার জন্য। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। "জেল এবং আইন অমান্যের দু'মাস আগে থেকেই পিকেটিং-এর জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা ছিল আমার দায়িত্ব। বেশ কৌতূহলপূর্ণ কাজ ছিল। অগণিত তরুণেরা আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য তৈরী ছিল। যদিও তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা যথেষ্ট ছিল না তবু তারা জানত ব্রিটিশ শাসন ছিল যন্ত্রণাদায়ক। তবে কেন তফাতে দূরে সরে থাকা—যখন গান্ধী চাইছেন জেলে গেলে স্বাধীনতা আসবে? তা' ছাড়া তারা জানত জেলে যাওয়া এক মহান কাজ।" (ইন দি কজ অব দি পিপল; পৃ. ১৭) গোপালন তাঁর ছোট্ট গ্রাম উত্তর মালাবারের মাখেরি (Makberi) থেকে নিজের চেষ্টাতে একাই প্রায় চব্বিশ জন তরুণ স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিংএর জন্য সংগ্রহ করেছিলেন।

মনে রাখতে হবে আইন অমান্যে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা "জীবন, মৃত্যু চিত্ত ভাবনাহীন" হয়েই এগিয়ে এসেছিলেন। পুলিশের অত্যাচার স্ত্রী, পুরুষ কাউকে রেয়াত করেনি—অথচ. অসীম সাহসের সাথে সত্যাগ্রহীরা সেই অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ইউরোপীয়ান সাংবাদিক ইউনাইটেড প্রেসের ওয়েব মিলার সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ২৫,০০ সত্যাগ্রহীর আইন ভংগের দৃশ্য

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন কি ভাবে পুলিশের নৃশংস লাঠি চার্জের মধ্যেও একজন সত্যাগ্রহীও বিচলিত হননি। হাত তুলে মাথার উপর একটা লাঠিকেও ঠেকাবার চেষ্টা করেননি। ওয়েব মিলার লিখছেন, "যদিও প্রত্যেকে জানে মুহূর্তের মধ্যে সে মার খাবে, হয়ত মারা যাবে, তথাপি আমি এতটুকু চাঞ্চল্য অথবা ভয় দেখতে পাই নি।" (উদ্ধৃতির জন্য, লুই ফিসার, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪) মনে রাখা প্রয়োজন, সত্যাগ্রহে স্ত্রী এবং কিশোরদের সংখ্যা কম ছিল না। ১৯৩০ সালের ১৫ই নবেম্বরের মধ্যে যে ২৯,০৫৪ জন সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেছিল, তাদের মধ্যে ২০৫০ জনের বয়স সতেরোর নীচে ছিল এবং ৩৫৯ জন ছিলেন স্ত্রীলোক। এর উপর দরিদ্র সত্যাগ্রহীর সামনে ছিল আরো ভয়ারহ বিপদ। যেমন ভূমি রাজস্ব অথবা চৌকিদারী ট্যাকস প্রদানে অসম্মতির অর্থ তার সামান্য ঘর-বাড়ী জমি-জমা সব সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। (সুমিত সরকার; পৃ. ২৯০)

আইন অমান্যে যোগ দেয়ার এই ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ রেখে আমাদের আঞ্চলিক অনুসন্ধানে নামতে হবে। ভারতের মত একটা বিরাট যুক্তরাজ্যে জাত-পাত, উৎপাদন-অনুৎপাদন, শিক্ষা-অশিক্ষা, শাসন এবং শোষণের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য আছে। কোনো একটি আন্দোলন সমর্থন এবং না-সমর্থনের মধ্যেও সে পার্থক্য প্রতিফলিত হবে। কোনো অঞ্চলে দেখা যাবে বিরাটভাবে সমর্থন আবার কোথাও দেখা যাবে উৎসাহ আশানুরূপ নয়। উত্তর প্রদেশে যদি কৃষকরা রায়তওয়ারী এলাকায় খাজনা বন্ধ করে থাকে তো মেদিনীপুরে জমিদারদের বিরুদ্ধে। কাঁথি মহকুমার "নীহার" পত্রিকা ২৬শে মে, ১৯৩১ সালে লিখছে : "মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফলে দেশের জনসাধারণের মনে নব নব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা জাগিয়াছে। নব ভাবে উদ্বুদ্ধ দেশের দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকগণ একতাবদ্ধ হইতে শিখিয়াছে। তাই বর্তমান বৎসর এতদঞ্চলের (খেজুরী থানা) কৃষকগণ নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জমিদার মহাজনদের অন্যায় পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করিয়াছে।" (উদ্ধৃতির জন্য, হিতেশ রঞ্জন সান্যালের প্রবন্ধ, কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা, "দেশ") স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, বিহার কিষাণ সভার সভাপতি লিখেছেন, "১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ কৃষকদের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ এনেছিল।" আবার গোপবন্ধু চৌধুরীর উৎসাহে উড়িষ্যায় সত্যাগ্রহীরা যে ভাবে দলে দলে আইন অমান্যে যোগ দিতে এগিয়ে এসেছেন· ঠিক সে ভাবে কংগ্রেসী নেতা তরুণরাম ফুকন এবং এন. সি. বর্দোলী উৎসাহ না দেখানোর ফলে আসামে সত্যাগ্রহ

জমে উঠেনি। আসামে এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্ব অথবা তৎকালীন পূর্ববঙ্গ (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে আগত কৃষকদের আগমনের ফলে চাষের ক্ষেত্রে নতুন সমস্যা। তাহলেও স্মরণ রাখা ভাল ১৯৩০-৩১-এ আসামে কারাবরণকারীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৩৭৩ জন। অন্যদিকে বিস্ময় লাগে যে বাংলা সবচে বেশি সংখ্যায় সত্যাগ্রহে অংশ নিয়েছিল (১৫,০০০)। সেই বাংলায় নেতৃত্ব ছিল অতি তীক্ষ্ণভাবে সুভাষ বসু এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত। জুডিথ ব্রাউন প্রমুখ ইউরোপীয়ান ইতিহাসবিদদের মতে খিলাফতের মত কোনো ধর্মীয় প্রস্তাব না থাকায় অসহযোগ আন্দোলনের মত আইন অমান্য আন্দোলনে মুসলমানরা এগিয়ে আসেননি। অথচ যে খিলাফতের দিনগুলিতে মুসলমানরা আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের রাজত্ব পরিত্যাগ করেছিলেন সেই আফগানিস্তান সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা আইন অমান্যের সময়ে গান্ধিজীর ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছিলেন। গান্ধিজীর শিষ্য আবদুল গফফর খাঁর তৈরী খুদাই খিদমদগার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংখ্যা ছ'মাসে ৫০০ থেকে ৫০,০০০ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছিল। গান্ধিজীর মত গফফর খাঁও যখন বন্দী হলেন তখন উপজাতিরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল অবিলম্বে এই দুই নেতার মুক্তির দাবিতে। বিক্ষোভকে চূর্ণ করার জন্য শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বিমান যোগে বোমা বর্ষণ করতেও দ্বিধা করল না। আর এই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯২ জনই ছিল মুসলমান। মুসলমান নেতৃত্বের বৃহত্তর অংশই ছিলেন সত্যাগ্রহের পক্ষে। আব্বাস তায়েবজী, আবুল কালাম আজাদ, সৈয়দ মাহমুদ, রফি আমেদ কিদোয়াই, আমেদ খাঁ শেরওয়ানীর মত শুধু বিশিষ্ট মুসলমান নেতারা নন, তাঁদের সংগঠনগুলিও জমায়েত উল উলেমা, আহরুল ইসলাম, খুদাই খিদমদগার এবং ন্যাশানালিষ্ট মুস্লিম পার্টিও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এমন কি চৌধুরী খালিকুজ্জমানের মত নেতা ভিন্ন মত পোষণ করেও ১৯৩০ সালের শেষ মাসগুলোয় আন্দোলনের "ডিক্টেটর" পরিচালক নেতা হিসেবে কাজ করেছিলেন। তারাচাঁদ লিখছেন, প্রায় ১২,০০০ হাজার মুসলমান কারাবরণ করেছিলেন। (হিস্ট্রি অব দি ফ্রিডম ম্যুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া; চতুর্থ খণ্ড; পৃ. ১২৮-২৯)

শোলাপুরে, করাচীর ডকে, মাদ্রাজের চুলাই মিলে কলকাতার পরিবহণে এবং বজবজের মিলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিল। বোম্বাইতে ব্রিটিশ-মালিকানার বোলোটি কাপড় তৈরীর কারখানা বন্ধ হয়ে গেছল। তথাপি যদি আশানুরূপ

সাড়া না পাওয়া গিয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে খোদ গান্ধিজীরই বোধ হয় তা' অভিপ্রেত ছিল না। ভাইসরয়ের কাছে তিনি যে এগারো দফা দাবীপত্র পেশ করেছিলেন তার কোথাও শ্রমিকদের স্বপক্ষে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি। তার উপর শ্রমিকদের যাঁরা নেতৃত্ব দেয়ার উপযুক্ত ছিলেন সেই কম্যুনিষ্টদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা "মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা"য় ধৃত হয়ে কারাবন্দী ছিলেন। বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলেন। রণদিভে এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা" (পৃ. ২৩) বইতে। তিনি লিখেছেন, "বিগত ১৯৩০ সালের সংগ্রামের সময়ে কমিউনিস্টদের একটা সংকটজনক কালের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এই সংগ্রাম যে সময়ে শুরু হয়েছিল তখন ইতিমধ্যেই অধিকাংশ গণ সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাদের নতুনভাবে গড়ে তুলবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তা'ছাড়া মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হবার পর এই গণসংগঠনগুলিকে কতিপয় গ্রেপ্তারের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় ও তার ফলে বহু নেতা কর্মক্ষেত্র থেকে অপসৃত হন। এই সমস্ত ঘটনার সংগে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে বেঠিক ধারণা থেকে উৎসারিত যে ভুল তা' যুক্ত হয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করল যে, একটি সুদৃঢ় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীকে গড়ে তুলবার এত বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম (১৯২৮ সালের সূতীকল ধর্মঘট) সত্বেও কমিউনিষ্টরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন।"

কিন্তু এতৎসত্বেও গান্ধিজীর প্রামাণ্য জীবনীকার তেণ্ডুলকার যখন শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের নিম্নোক্ত বর্ণনা দেন তখন তাকে একেবারে অকিঞ্চিতকর বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। গান্ধিজীর গ্রেপ্তারে "সারা ভারত জুড়ে হরতাল এবং ধর্মঘট হল। বোম্বাইতে বস্ত্রশিল্পের সংগে যুক্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক তাদের হাতের যন্ত্র নামিয়ে রাখল। রেল শ্রমিকরাও বিক্ষোভে অংশ নিল। মিছিলের বিরাটত্ব পুলিশকে পর্যন্ত সরে যেতে বাধ্য করল।" (মহাত্মা; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৪৯)

শহরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা দলে দলে এগিয়ে আসেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ীর তরুণদের সামনে স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে অর্থকরী কর্মসংস্থানের কোনো পাল্টা ব্যবস্থা ছিল না। পৃথিবীময় মন্দার ফলে কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনাও সংকুচিত হয়ে পড়ছিল। দিন গুজরান করাই এক প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আইনজীবীদের পক্ষে লাভজনক আইন ব্যবসা ত্যাগ করে দেশের কাজে পুরোপুরি নেমে পড়া যথেষ্ট কষ্টজনক কাজ ছিল।

তবে গান্ধিজী লাহোর কংগ্রেসে নিজেই বিদ্যালয়, আদালত বর্জন না করার কথা বলেছেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছে "আজকের আবহাওয়ায় আমাদের কাছে এধরনের বয়কট অপ্রয়োজনীয়।" আসলে কৌশল হিসেবে আন্দোলনের ক্ষেত্রে বয়কট তার প্রয়োজন হারিয়েছে কারণ লাহোর কংগ্রেস পুরোপুরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ব্রিটিশ আধিপত্য এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি—এই প্রথম কংগ্রেস ঘোষণা করল। অথচ সমগ্র আন্দোলনের নেতৃত্বই ছিল শহরাঞ্চলের পাতিবুর্জোয়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের হাতে। জওহরলাল, বল্লভ ভাই প্যাটেল, গোপবন্ধু চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু—কে নয়?

ইতিহাসের উদাহরণ বিপ্লবী আন্দোলনের উত্তাপ সর্বত্র সমানভাবে অনুভূত হয় না—তাই বলে সে আন্দোলন কখনোই তার গুরুত্ব হারায় না। ১৭৮৯-এর ফ্রান্সের বুর্জোয়া বিপ্লব, কি প্যারী কমিউন, অথবা রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব—সর্বত্র একই দৃষ্টান্ত বহন করে। মনে রাখা প্রয়োজন অক্টোবর বিপ্লবের পরই রাশিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রকৃত লড়াই শুরু হয়েছিল। বিপ্লবের সাথে সাথেই দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে সবাই কিন্তু ছুটে এসে দাঁড়ায়নি বিপ্লবীদের পাশে। আর যারা দাঁড়ায়নি, তারা সবাই প্রতিক্রিয়াশীল, এ কথাও বলা যাবে না। চেতনার স্তরের অসম বিকাশ এর অন্যতম কারণ। চীন বিপ্লবের ক্ষেত্রে এটি আরো ভালভাবে বোঝা যায়। কিন্তু সে জন্যে আবার আন্দোলন বা বিপ্লব থেমে থাকে না।

বস্তুতঃ আন্দোলনের বিচারে নেমে গাছ দেখতে গিয়ে অরণ্যটাই না চোখের সামনে হারিয়ে যায়। অংশ থেকে সমগ্রের একটা আন্দাজ করা যায় কিন্তু সেটাই সব নয়। কারণ অংশ কখনো সমগ্রের পরিপূরক নয়। একদা কংগ্রেস কর্মী কমরেড এ. কে. গোপালন যখন তাঁর আত্মজীবনীতে ১৯৩০-এর গণবিক্ষোভ সম্পর্কে ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মতামত দেন তখন তার সত্যতাকে সামগ্রিক হলেও একেবারে নস্যাত করে দেয়া খুবই মুশকিল। তাঁর মতে "১৯৩০ সালের আন্দোলন এক বৃহত্তম জনগণকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে এনেছিল। এর কারণ সারা দেশের সামনে ছিল অভিন্ন কর্মসূচী ও কর্মপন্থা। মধ্যবিত্ত ছাড়াও ক্ষুদ্র আকারে হলেও শ্রমিক এবং কৃষকরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। শাসন কর্তৃপক্ষকে এই আন্দোলন এমনভাবে সচকিত ও আতংকিত করেছিল যা' ইতিপূর্বে কখনো হয়নি।" (ইন দি কজ অব দি পিপল; পৃ. ১৪) ইংরেজ সাংবাদিক লুই ফিশার (Louis Fischer) আইন অমান্যের সময়ে সারা ভারতের একটি চিত্র দিয়েছেন। তাঁর ধারণায় "ডাণ্ডী সৈকতে গান্ধীর লবণ

স্পর্শ করার একমাস পরে ভারত ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে উঠেছে। কিন্তু একমাত্র চট্টগ্রাম ছাড়া কোথাও ভারতীয় হিংসার প্রকাশ নেই—নেই কোথাও কংগ্রেসী সহিংসতা।" (দি লাইফ অব মহাত্মা গান্ধী ; পৃ. ৩৪০)

সবশেষে আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি বা জোয়ার-ভাঁটা সম্পর্কে আন্দোলনের অন্যতম পরিচালক-নেতা জওহরলাল একটি উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে আন্দোলন যুক্তপ্রদেশে (ইউ. পি.) শহর ছাড়িয়ে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার ফলে অন্যান্য স্থানের চেয়ে আন্দোলন ওখানে করবন্ধের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্র গ্রহণ করেছিল। আর যে সব শহরে কেবল মধ্যবিত্তরা এগিয়ে এসেছে সেখানে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এই আন্দোলনকে চালু রাখার ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যেই একঘেয়েমী এবং মন্থরতা দেখা দিয়েছে। জওহরলাল বলেছেন, এটা খুবই স্বাভাবিক।" "কেন না দীর্ঘকাল ধরে জনগণকে একটা বৈপ্লবিক চূড়ায় আটকে রাখা যায় না। সাধারণভাবে এসব জিনিষ (বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ) কয়েক দিনের মধ্যে ঘটে যায় কিন্তু আইন অমান্যের চমকপ্রদ ক্ষমতা আছে মাসের পর মাস চালু রাখার এবং এর পরেও অনির্দিষ্ট কালের জন্য কিছুটা নীচু ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়ার।" ("but civil disobedience had the remarkable capacity for lengthening this period to many months, and even then of carrying on at a lower pitch for an indefinite period." An Autobiography ; P. 238)

জওহরলালের মতে আইন অমান্য আন্দোলন সহসা একটা ঝরণার উৎস মুখ খুলে দিয়েছিল—গ্রামে, শহরে সমস্ত দেশ জুড়ে। কলকাতার ইউরোপীয়ানদের মুখপত্র "দি ষ্টেটসম্যান" স্বীকার করতে বাধ্য হল যে "সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা গুরুতরভাবে প্রতিকূল অবস্থা"য় পড়েছে। আর ভারতে ইউরোপীয়দের মানসিক করুণ অবস্থাকে ব্যঙ্গ করে সমালোচনা করল লণ্ডনে "অবজার্ভার" পত্রিকা তার ৬ই জুলাইয়ের সংস্করণে।

ধরে নেয়া যাক, এই আইন অমান্য আন্দোলন যদি আগামী দশ বছর ধরে চলত তাহলে লোকে কি রকম সাড়া দিত—এই প্রশ্নের একটি জবাব আফগানিস্তানের প্রাক্তন তুর্কী রাষ্ট্রদূত হিকমত ব্যায়ুর (Hikmet Bayur) তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দিয়েছেন। তখন গান্ধী এবং নেহেরু কারাগারে বন্দী। উত্তর ভারতের এক জেলের সুপার হিকমত সাহেবকে চা'য়ের নিমন্ত্রণ করেন। জেলখানার উদ্যানে তিনি এবং আরো কিছু ভারতীয় অতিথি উপস্থিত

ছিলেন। তাঁরা যখন সুপারের সাথে চা পান করেছিলেন, তখন কানে বিরাট জোরে আওয়াজ এল "গান্ধিজী কী জয়।" কৌতূহল হয়ে প্রশ্ন করতে জানা গেল সূর্য ডোবার সময়ে বন্দী সত্যাগ্রহীরা ওই রকম আওয়াজ দিয়ে অভিনন্দন জানায়।

"কতজন এখানে আছে?" জিগ্যেস করলেন তিনি (হিকমত)।

"আট থেকে ন' হাজার।" তাঁকে তাঁরা (ভারতীয় অতিথিরা) বললেন।

"১৯২১-এ কত জন ছিল?"

"প্রায় হাজার।"

"দশ বছর চললে আপনাদের মনে হয় কতজন হবে?" তিনি (হিকমত) জানতে চান।

ভারতীয় অতিথিরা হাসতে থাকেন এবং ঠাট্টা করে সুপারকে দেখান।

"তাহলে উনি (পুলিশ সুপার) ভেতরে ঢুকবেন।"

(উদ্ধৃতির জন্য, ফ্রাঙ্ক মোরেস, জওহরলাল নেহেরু; পৃ. ১৬১)

এক দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেমন দমন নীতি অব্যাহত রাখল তেমনি অন্যদিকে শুরু করল কৌশলের রাজনীতি। সরকার লিবারেল, মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের সাহায্যে এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহযোগিতায় গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে লাগল। কংগ্রেস ব্যতীত ব্রিটিশ শাসিত ভারত থেকে ৫৮ জন এবং দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে ১৬ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে লণ্ডনে বৈঠক শুরু হল। বৈঠক চলল ১৯৩০ সালের নবেম্বর থেকে ১৯৩১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত।

বৈঠকের প্রধান কর্মসূচী ছিল ১৯৩০ সালের জুন মাসে প্রকাশিত সাইমন কমিশনের প্রদত্ত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করা। যদিও ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের কথা বলা হয়েছিল তথাপি জাতীয় আন্দোলন থেকে উত্থিত মৌল দাবীগুলি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল। ভাইসরয়ের পুরো ক্ষমতার উপর কোনো রকম কাট-ছাঁট করা হয়নি। পৃথক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে অস্পৃশ্য বা হরিজনদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের কথা বলা হয়েছিল। বস্তুতঃ জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু করার জন্য বিভেদ চিন্তাধারা অনুপ্রবেশ করানোই ছিল রিপোর্টের প্রধান উদ্দেশ্য। যাইহোক, জাতীয় কংগ্রেস সাইমন কমিশনের প্রদত্ত প্রস্তাবগুলি বা রিপোর্টকে যথার্থই জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী জ্ঞান করে গোলটেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে অসমর্থ জানায়। তা' সত্ত্বেও লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক বসল। কিন্তু কংগ্রেসের মত বৃহত্তম

রাজনৈতিক দল যোগ না দেওয়ায় গোলটেবিল আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। বিপানচন্দ্রের ভাষায় "ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনো সম্মেলন ডাকার অর্থ রামকে বাদ দিয়ে রামলীলা অনুষ্ঠানের মত।" (মডার্ণ ইণ্ডিয়া ; পৃ. ২৮৯) ব্রিটিশ সরকার অন্য কোনো রকম উপায় না পেয়ে অগত্যা কংগ্রেসের সাথে আপোষ আলোচনায় সচেষ্ট হল। প্রথমেই জাতীয় বুর্জোয়াদের সন্তুষ্ট করার জন্য শুল্কনীতিতে কিছু অনুকূল কনশেসন দিল। তারপর গান্ধিজীর কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়ার জন্য ভাইসরয় আরউইন লেজিস-লেটিভ অ্যাসেম্বলি বা আইন সভায় সরকারের সাথে সহযোগিতার জন্য প্রকাশ্যে আহ্বান জানালেন। তাঁর আবেদনের ভিত্তি হল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের গোলটেবিল বৈঠকের শেষ দিনের বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে ঈশ্বরের কৃপায় "সবাই এক সাথে পরিশ্রম" করলে ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনসের মধ্যে তার ডোমিনিয়ান মর্যাদা লাভ করতে পারবে। জওহরলাল অবশ্য তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীরা এ ধরণের বক্তব্য প্রায়শঃই রাখতেন। তিনি এতে কোনো গুরুত্ব দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। যাই হোক, ভাইসরয় তাঁর আবেদনের আন্তরিকতা প্রমাণের জন্য গান্ধিজী সহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নিঃশর্ত মুক্তি দিলেন। গান্ধিজীও আন্তরিকতাকে স্বীকার করে নিলেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি লর্ড আরউইনের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে আবেদন জানালেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যদের নিয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে আলোচনা শুরু হয়ে শেষ হল ৪ঠা মার্চ। প্রকাশিত হল "দিল্লী প্যাক্ট" বা "গান্ধি আরউইন চুক্তি।" গান্ধিজী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রেখে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হলেন। চুক্তির মাত্র বাইশ দিন পরে ২৬শে মার্চ (১৯৩১) করাচীতে কংগ্রেস অধিবেশন বসল। অধিবেশনের মাত্র ছ'দিন পূর্বে সারা দেশ বিষাদমগ্নচিত্তে শুনল ভগৎ সিং এবং তাঁর সাথীদের ফাঁসীর সংবাদ। ভগৎ সিং-এর ফাঁসীকে নিন্দা করে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব এলে গান্ধিজী তাতে বাধা দিলেন না তবে তিনি এর সাথে একটি সংশোধনী যোগ করে জানিয়ে দিলেন যে কংগ্রেস কোনোরকম হিংসাত্মক কাজকে অনুমোদন করে না। এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রস্তাব সুভাষচন্দ্র প্রমুখ তরুণ নেতারা রাখলে গান্ধিজীর প্রচেষ্টায় তা' নাকচ হয়ে যায়। তবে ভোটের ব্যবধান ছিল সামান্য। কংগ্রেস "গান্ধী আরউইন চুক্তি"কে অনুমোদন করল। জওহরলাল যিনি এই চুক্তিকে প্রায়

বিশ্বাসঘাতকতার সামিল বলে মনে করেছিলেন তিনিই শেষ পর্যন্ত গান্ধিজীর অনুরোধে প্রস্তাবটিকে অনুমোদনের জন্য সভার কাছে পেশ করেন। লণ্ডনের বৈঠকের জন্য একমাত্র গান্ধিজীকেই প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হল।

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শুরু হলে গান্ধিজী তাতে যোগ দিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানালেন, তাঁর উদ্দেশ্য আলোচনার মাধ্যমে "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস" আদায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের প্রশ্ন তুলে মূল আলোচনাকে ঘোরালো করে তুলল। তারা বলল, ভবিষ্যত সংবিধান রচনার প্রশ্ন আলোচনা করার পূর্বে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হোক। গান্ধিজী চাইলেন, সংবিধান রচনার প্রশ্নটিকে আলোচনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। তাঁর মতে সংবিধানের প্রশ্নটি মীমাংসা হলেই সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের প্রশ্নটিরও মীমাংসা ঘটে যাবে। যাই হোক, ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যে ভারত শাসন বিধির কথা ঘোষণা করলেন তাতে দেখা গেল শক্তিশালী যুক্তরাজ্য কেন্দ্রের (Federal Centre) কথা বলা হয়েছে এবং প্রদেশগুলিকে যৎসামান্য স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। গান্ধিজী বিরক্ত ও বিষণ্ণ হয়ে শূন্য হস্তে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। কংগ্রেস এবং দেশবাসীর মনে এক দারুণ হতাশা নেমে এল। জওহরলালের ভাষায় "এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হল" যা জাতীয় আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার পক্ষে খুবই প্রতিকূল ছিল।

ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসে লর্ড আরউইনের স্থানাভিষিক্ত হয়ে ভারতে এলেন লর্ড উইলিংডন। গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পূর্বে নতুন ভাইসরয়ের ভারত-বিরোধী মনোভাব দেখে যাওয়ার সুযোগ গান্ধিজী পেয়েছিলেন। বহু ক্ষেত্রেই প্রাদেশিক সরকারগুলি "দিল্লী প্যাক্ট"-কে উপেক্ষা করে রাজবন্দীদের শুধু মুক্তি দিতেই গড়িমসি করছিল না সন্ত্রাসের নীতিও তারা জারী রেখেছিল। এ ব্যাপারে নতুন ভাইসরয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও গান্ধিজী উপযুক্ত সাড়া পান নি। আর এখন দেশব্যাপী হতাশা ও ব্যর্থতার মধ্যে গান্ধিজী যখন শূন্য হাতে দেশে ফিরে এলেন তখন ব্রিটিশ সরকার আরও মারমুখী রূপ ধারণ করল।

ডিসেম্বরে গান্ধিজী ফিরলেন আর জানুয়ারীতে (১৯৩২) নতুন করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। তবে এখন গণ সত্যাগ্রহের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হল। ভাইসরয় উইলিংডনও চণ্ড মূর্তি নিয়ে তৈরী ছিলেন। সমস্ত নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস নেতারা গ্রেপ্তার হলেন এবং দল হিসেবে

কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হল। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সংস্থা ও ব্যক্তিদের সম্পত্তি, বাড়ী, গাড়ী এবং ব্যাংক অমানত বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল। জনসভা, মিছিল নিষিদ্ধ হল। সংবাদপত্র সেনসারশীপের আওতায় এল। সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর ভয়ে জাতীয় বুর্জোয়ারা পেছু হটতে লাগলো। কিন্তু শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী সংগঠনগুলি ব্রিটিশ-বিরোধী তৎপরতা জারী রাখল। উত্তর প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে করবন্ধ ও খাজনা বন্ধ যেমন বজায় থাকল তেমনি বাংলাদেশে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলি মরিয়া হয়ে ব্রিটিশ অফিসার ও তাদের দালালদের উপর আক্রমণ চালাল। ১৯৩৩ সালে মার্চ মাসে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য নির্বাচিত সভাপতি মদনমোহন মালব্য (যিনি হিন্দু মহাসভারও সদস্য) এবং এক হাজার ডেলিগেটকে অধিবেশনের প্রাক্কালে গ্রেপ্তার করা হল। তথাপি অধিবেশনে পুলিসের আক্রমণকে উপেক্ষা করে কার্যকরী সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল। ঘোষণা করা হল আরো একবার—"পূর্ণ স্বরাজ" হল কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং তা উপার্জিত হবে আইন অমান্যের মাধ্যমে। বিদেশী বস্ত্র ও দ্রব্য বর্জনের পুনর্বার আহ্বান জানানো হল। কয়েক হাজার মহিলা ও বালক সহ প্রায় লক্ষাধিক নারী-পুরুষ কারাবরণ করল। আন্দোলনের গতি স্তিমিত না হলেও গান্ধিজী হরিজন সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে একুশ দিনের অনশন ঘোষণা করলেন। উদ্দেশ্য, নিজের এবং দেশবাসীর মন থেকে হরিজন বিদ্বেষ দূর করা। ৯ই মে গান্ধিজী অনশন শুরু করলেন এবং সাথে সাথেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁকে মুক্তি দিলেন। লুই ফিশার লিখেছেন, "তাঁকে মুক্ত করায় বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে গান্ধী ছ'সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখলেন।" ১৫ই জুলাই গান্ধিজী ভাইসরয়ের সাথে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য দেখা করতে চাইলে প্রত্যাখ্যাত হলেন। প্রতিবাদে ১লা আগষ্ট আইন অমান্য করার কথা ঘোষণা করায় পুনরায় গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে তিনদিন পরে মুক্ত করে দেওয়া হল কিন্তু বলা হল তিনি যেন পুনা শহরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন। গান্ধিজী এই আদেশ অমান্য করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল। জেলে গিয়ে গান্ধিজী প্রতিবাদে আবার অনশন শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দিলো। ২৩শে আগষ্ট গান্ধিজী জেল থেকে বেরিয়ে ঘোষণা করলেন, আগামী এক বছরের জন্য (অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের ৩রা আগষ্ট পর্যন্ত) আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ থাকবে। কারণ হিসেবে তিনি জানালেন যে নিজেকে এখনও এক বছরের জন্য বন্দী বলে গন্য করেন। যদিও

ইংরেজরা তাঁকে মেয়াদ শেষ হওয়ার বহু পূর্বে মুক্তি দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আইন অমান্য আন্দোলনের উপর এইভাবে যবনিকা পড়ল। বি, এন, পাণ্ডে লিখেছেন, আইন অমান্য আন্দোলন সরকারী ভাবে কংগ্রেস কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ১৯৩৪ সালের মে মাসে। (দি ব্রেক আপ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া; পৃ. ১৩৬)

(৬)

আইন অমান্য আন্দোলনের শুরু থেকেই গান্ধিজীর প্রতিটি পদক্ষেপ কৌতূহলোদ্দীপক এবং তৎকালীন অনেক নেতার কাছে অনেক সময়ে ধাঁধার মত মনে হলেও তিনি তাঁর আদর্শ (অহিংসা এবং অসহযোগ) ও লক্ষ্য ("পূর্ণ স্বরাজ" ও "ডোমিনিয়ান মর্যাদা অভিন্ন") কে সামনে রেখে, নেতৃত্বকে দৃঢ়ভাবে শক্ত হাতের মুঠোয় রেখেই শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। গান্ধিজীর জীবনীকার লুই ফিশার লিখেছেন, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর কাছে প্রধান চিন্তা ছিল কোন্ উপায়ে ("Means") আসবে? অন্যায় উপায় ব্যক্তিকে নষ্ট করে এবং লাভের চেয়ে তা' ক্ষতির কারণই হয়ে দাঁড়ায়। গান্ধিজী জানতেন একটা জাতিকে পুরোপুরি কল্যাণকর উপায় সম্পর্কে বোঝাতে গেলে সময় লাগবে। জাতির এই উপলব্ধি আসবে খুবই ধীর গতিতে। লুই ফিসারের মতে (যিনি গান্ধিজীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলেন) "তাঁর (গান্ধিজী) হাতে ছেড়ে দিলে তিনি ১৯৩০ সালে স্বাধীনতার প্রশ্নটির উপর জোর দিতেন না। কিন্তু এখন যা ঘটার ঘটে গেছে। কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য প্রচারে নেমেছে। ফলে নেতাকে একজন বিশ্বস্ত সৈনিক হতে হয়েছে।" (দি লাইফ অব মহাত্মা-গান্ধী; পৃ. ৩৩১) কিন্তু একধারে নেতা ও বিশ্বস্ত সৈনিক ১৮ই জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সবরমতী আশ্রমে জানালেন, তিনি আলো দেখতে পাচ্ছেন না বুঝতে পারছেন না আগামী দিনে দেশে কি ঘটনা ঘটবে! চারিদিকে কেবল অন্ধকার ঘিরে আছে। ৩০শে জানুয়ারী "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় "স্বাধীনতা" শব্দের পরিবর্তে এক নতুন শব্দ চয়ন করলেন। তা'হল "স্বাধীনতার সারাংশ" বা "Substance of Independence"। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, তিনি "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা" শব্দটিকে আর ব্যবহার করতেন না। পরিবর্তে "পূর্ণ স্বরাজ" শব্দটি উচ্চারণ করতেন—কেননা এটিকে তিনি তার সুবিধামত ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। (দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল; পৃ. ১৭৮) এরপর ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ ভাইসরয়ের কাছে পত্র দিয়ে এগারো দফা দাবী পূরণ করতে আহ্বান জানালেন যার সাথে

"স্বাধীনতা" নামক প্রস্তাবের কোনো যোগ নেই। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ মন্তব্য করেছেন, "ধার্মিক নয় এমন একজন সাধারণ লোকের কাছে এগারো দফা এবং পত্র সুস্পষ্টভাবে লাহোর প্রস্তাবের পরিপন্থী।" ভাইসরয়কে লেখা পত্রে গান্ধিজী নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যেন তাঁর পত্রকে হুমকী বলে গ্রহণ না করা হয়। "আমি শ্রদ্ধার সাথে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই যেন এক্ষুণি এই সমস্ত অন্যায়গুলি দূর করার পথ সুগম করেন এবং তার ফলে সমমর্যাদা সম্পন্নদের মধ্যে সত্যিকারের বৈঠকের পথ তৈরী হবে।" (উদ্ধৃতি, লুই ফিসার ; পৃঃ ৩৩৪-৩৫) জওহরলাল গান্ধিজীর এই দাবীপত্রে বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন তুলেছিলেন, "যখন আমরা স্বাধীনতার সম্পর্কে কথা বলছি তখন এ ধরনের রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কারের তালিকা তৈরী করার কি যুক্তি আছে ?" (উদ্ধৃতির জন্য ; ফ্রিডম ম্যুভমেন্ট ; ৩য় খণ্ড ; পৃঃ ৩৩৬) সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তিনি ভাইসরয়কে লেখা উক্ত পত্রে ভারতকে শীঘ্র মধ্যে "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস" মঞ্জুর করা হবে না বলে আশংকাও প্রকাশ করেছেন কিন্তু "স্বাধীনতা" শব্দটি পত্রে কোথাও উচ্চারিত হয় নি। ("I fear there never has been any intention of granting······Dominion Status to India in the immediate future.")

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রহরী ভাইসরয় আরউইনকে গান্ধিজী পত্রে "প্রিয় বন্ধু" সম্বোধন করে তাঁকে পথ খুঁজে দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করার অনুরোধ জানালেও ("I would fair approach you and find a way out".) আরউইন নিজের স্বাক্ষরে পত্রের জবাব দেওয়ার ভদ্রতাও দেখালেন না। এমন কি গান্ধিজীর ইচ্ছা সত্ত্বেও দেখা করতে রাজী হলেন না। সেক্রেটারী মারফত গান্ধিজীকে সতর্ক করে দিলেন তিনি যেন কোনো অবস্থাতেই শান্তি বিঘ্নিত না করেন। প্রত্যাখ্যাত গান্ধিজী ব্যথিত চিত্তে জানালেন—যা' অনেকটা আর্তনাদ বলেই মনে হবে। "আমি নতজানু হয়ে রুটি চেয়েছিলাম পরিবর্তে পেলাম প্রস্তর টুকরো।" মনে রাখা প্রয়োজন আন্দোলন তখনো শুরু হয়নি, হয়েছে কেবল উপক্রমণিকা। কিন্তু ভাইসরয়কে লেখা পত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে কংগ্রেস ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলনের উদ্যোগ নিয়েছে তাতে প্রধান গুরুত্ব পাবে পথের আন্দোলনের চেয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে ইংরেজ রাজপুরুষদের সাথে আলাপ-আলোচনা। অথচ এ ধরনের আলাপ-আলোচনার কোনো প্রস্তাবই কংগ্রেস অধিবেশনে বা ওয়ার্কিং কমিটির কোনো বৈঠকে গৃহীত হয়নি। এটি গান্ধিজীর নিজস্ব পদ্ধতি। আন্দোলনের অর্থ

অবশ্যই আলাপ-আলোচনার পথ রুদ্ধ নয়। কিন্তু সে প্রস্তাব আসবে তাদের কাছ থেকে যাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। আন্দোলনের চাপে ভীত ও শংকিত হয়ে তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসবে আপোষ করতে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটি উল্টো। আন্দোলনের হোতাই চাইছেন আলোচনা আর আপোষ করতে। কারণ গান্ধিজীর বিশ্বাস, "ব্রিটিশ জনগণকে অহিংসার মারফত পরিবর্তিত" ("convert") করতে পারবেন। তিনি দেখিয়ে দিতে চান, তারা কতটা ভারতের সর্বনাশ করেছে। অতএব পথের আন্দোলনের চেয়ে তিনি যে আলাপ আলোচনার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করবেন এ ব্যাপারে আর সন্দেহ কী! ঠিক এই কারণেই যখনই কোনো আলোচনার প্রস্তাব এসেছে তিনি যেমন সাড়া দিতে ভোলেননি, তেমনি আন্দোলনের চরম মুহূর্তেও বারবার আলোচনার জন্য শত্রুপক্ষের কাছে অনুরোধ করেছেন। তা' করতে গিয়ে আন্দোলনের মেজাজের উপর কি ধরনের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে সেদিকে তাঁর বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জওহরলালের মতে গান্ধিজীর নিজের ব্যক্তিত্বের উপর এত অগাধ আস্থা ছিল যে তিনি সব সময়ে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের সাথে আলোচনা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতেন। "নীতিগতভাবে তিনি সাধ্যের অতিরিক্ত হলেও তাঁর বিরোধীদের সাথে সাক্ষাৎ ও যেকোনো বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন।" কিন্তু এতৎসত্ত্বেও জওহরলালকে স্বীকার করতে হয়েছে গান্ধিজীর এই স্বভাব মেনে নেওয়া যেতে পারে "ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিগত বা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে"। কিন্তু যেখানে "শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিত্ব করছে ব্রিটিশ সরকার" সেখানে বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। জওহরলালের মতে গান্ধী-আরউইনের প্যাক্টের পূর্ব থেকেই আইন অমান্য আন্দোলন "অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ছিল তার কারণ সরকারের সাথে সম্ভাব্য আলোচনার অত্যধিক প্রচার।" (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী; পৃঃ ২৫০) এ ধরণের কার্যকলাপকে মেনে নেওয়া জওহরলালের পক্ষে অস্বস্তিজনক হতে পারে তবে গান্ধিজীর ক্ষেত্রে কোনো সংশয় বা দ্বিধা ছিল না। "দিল্লী প্যাক্ট" সম্পাদনের পর জনৈক সাংবাদিক গান্ধিজীকে প্রশ্ন করেন, এ ধরণের মীমাংসা কী লাহোরে গৃহীত "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা" প্রস্তাবের বিরোধী নয়? গান্ধিজী উত্তরে জানালেন, "যখন আমি লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করি তখন আমি স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে ব্রিটিশের সাথে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বর্জন। যদি আমরা অহিংস যুদ্ধে ব্রতী হতাম তাহলে হয়ত একের বা অন্যের সম্পূর্ণ সর্বনাশ ঘটত। কিন্তু আমাদের অহিংস যুদ্ধ—পূর্বেই

ধরে নেওয়া হয়েছে আপোষ ঘটবে। ("But ours has been a non violent-war, presupposing compromise.") আমরা সব সময়ে এটাই ভেবেছি এবং কামনা করেছি।" (মহাত্মা; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯) গান্ধীজীর বক্তব্যই পরিষ্কার করে দেয় আন্দোলনের পূর্বে আলোচনায় কেন তাঁর এত উৎসাহ।

গান্ধিজী হয়ত লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের সময়ে আপোষের কথা ভেবে থাকবেন এবং বলে থাকবেন তবে সে সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্য বা মতামত নেহেরুর আত্মজীবনী, সুভাষচন্দ্রের আত্মস্মৃতি বা তেণ্ডুলকারের "মহাত্মা"-তে পাওয়া যায় না। নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র লাহোর প্রস্তাবকে পুরোপুরি আপোষহীন সংগ্রাম বলেই গ্রহণ করেছিলেন। যদিও গান্ধীজী সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের কিছুটা সংশয় ছিল, কারণ "লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কোনো পরিকল্পনার কথা বলা হয়নি।" (দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল; পৃঃ ১৭৪) যাই হোক, গান্ধিজী ব্রিটিশদের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা না ভাবলেও ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেস কর্তৃক রচিত যে শপথবাক্য ("Pledge") দেশবাসী পবিত্রতার সাথে পাঠ করেছিল তাতে অবশ্য স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হয়েছিল, "ভারত অবশ্যই ব্রিটিশের সাথে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করবে এবং অর্জন করবে পূর্ণ স্বরাজ অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা" ("We believe, therefore, that India must tear the British connection and attain purna swaraj or complete Independence") আর উপরোক্ত শপথবানী রচনাতে গান্ধিজীই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

প্রতিপক্ষকে দাবী পূরণের পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার মধ্যে দুটি সম্ভাবনা থাকে। প্রথমটি, যথার্থ বিবেচনা করে প্রতিপক্ষের দাবীগুলি মেনেও নিতে পারে—তবে সেক্ষেত্রে সে দেখবে লড়াই হলে জেতার সম্ভাবনা তার কতটা ছিল। আর দ্বিতীয়টি হল পর্যাপ্ত সময়কে প্রতিপক্ষ যুদ্ধ প্রস্তুতির কাজে লাগাতে পারে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ আইন-অমান্য আন্দোলন মোকাবেলার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছিল।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের (১৯২৭) স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাব গান্ধিজীর মনঃপুত ছিল না। ১৯২৮ সাল রাজনৈতিক দিক থেকে একটি ঝঞ্ঝাবহুল বছর হলেও গান্ধিজী বছরের প্রথম সাত মাস প্রধানতঃ সবরমতী আশ্রমের চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন। তবে লেখনীর মাধ্যমে স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাবকে আক্রমণ করতে কসুর করলেন না। তাঁর বক্তব্য, তিনি স্বাধীনতা

চান না, কেন না তার অর্থ তিনি বোঝেন না। তবে ইংরেজ জোয়াল থেকে অবশ্যই মুক্তি চান। তারপর একেবারে ২রা আগষ্ট বারদৌলীতে কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিলেন। চারদিনের মধ্যে একটা আপোষ হয়ে গেল। খাজনা বৃদ্ধির হার ২২ পার্সেণ্ট থেকে কমিয়ে ৫·৭ পার্সেণ্ট করা হল নীতিগতভাবে খাজনা বৃদ্ধিকে গান্ধিজী শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন। যদিও আন্দোলনের শুরুতে তাঁর ঘোষণা ছিল, "খাজনা বৃদ্ধি ঘোষণা বাতিল করতে হবে এবং পুরানো খাজনা, যা আমরা দিতে প্রস্তুত তা' গ্রহণ করতে হবে।" (মহাত্মা ; ২য় খণ্ড ; পৃঃ ২৩৮) অবশ্য গান্ধিজীর ক্ষেত্রে এটি কোনো নতুন নয়। এ ধরণের ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে। ১৯১৭—১৮'র মধ্যে যে তিনটি সত্যাগ্রহ (চম্পারণ, খেড়া এবং আমেদাবাদ) তিনি সংগঠিত করেছিলেন তার সবগুলিতেই তিনি শেষ পর্যন্ত আপোষ করেছিলেন। চম্পারণের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল চাষীদের তো নীলকরদের নিয়েই বাস করতে হবে। জুডিথ ব্রাউন লিখছেন, গান্ধিজীর আপোষ প্রচেষ্টায় তাঁর সহচররা পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সেক্রেটারী অব ষ্টেট বা ভারত-সচিব মণ্টেগু গান্ধিজীকে প্রশংসা করে লিখলেন, তিনি সরকারকে সাহায্য করেছেন বিহারের নীল-চাষীদের অসন্তোষের সমাধান খুঁজতে। (গান্ধি'জী রাইজ টু পাওয়ার ; জুডিথ ব্রাউন ; পৃঃ ৭২ এবং ৮৩) খেড়াতে দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতি বিদ্যমান সত্ত্বেও সরকার খাজনা আদায় বন্ধ রাখতে প্রস্তুত ছিল না। গান্ধিজী প্রজাদের খাজনা বন্ধ রাখার দাবীকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানালেন। অথচ শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন প্রজাদের উপদেশ দিতে—যারা পারবে তারা যেন খাজনা মিটিয়ে দেয়। (কৃপালনী ; পৃঃ ৭৮) আমেদাবাদের মিল শ্রমিকদের ধর্মঘট মিটে ছিল তাঁরই আপোষ প্রস্তাবে। শ্রমিকদের দাবীগুলি সালিশীবোর্ডে পাঠানো হল। গান্ধিজী শ্রমিক ও মালিককে কারখানার সমান অংশীদার বলে মনে করতেন। (ঐ ; পৃঃ ৭৭)

কলকাতা কংগ্রেসের জন্য বারদৌলীর বীর বল্লভভাই প্যাটেলের নাম সভাপতির জন্য উত্থাপিত হল। কিন্তু গান্ধিজী বাদ সাধলেন। মোতিলাল নেহেরুকে তিনি ওই পদের জন্য চান। কেননা, "তিনি সম্মানজনক আপোষ করতে পারেন। ("He is a man for honorable compromise") দেশ এটাই চায়, এখন এটাই প্রয়োজন।" সুতরাং ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধিজী যখন যোগ দিতে এলেন তখন বোঝা গেল আপোষকামী চিন্তাধারাকেই তিনি কংগ্রেসের কার্যধারা ও প্রস্তাবের মধ্যে প্রতিফলিত করতে সচেষ্ট হবেন। সুভাষচন্দ্রের ভাষায় দেশে তখন

উত্তাপের তাপমাত্রা চড়ছে। ("The Barometer Rises") মহাত্মার জীবনীকার তেণ্ডুলকার লিখছেন, চতুর্দিকে বামপন্থী চিন্তাধারার ঢেউ তুফান তুলেছে। (২য় খণ্ড; পৃঃ ৩৩৩) সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রমুখ তরুণেরা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত—কোনো প্রকারেই মাদ্রাজের স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়াবেন না। গান্ধিজী প্রস্তাব দিলেন "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" মেনে নেওয়ার জন্য ইংরেজদের দু'বছর সময় দেওয়া হোক। তীব্র বিরোধিতার সামনে পেছু হটে দু'বছর কমিয়ে এক বছর করলেন। জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র এমন কি মহাত্মার জীবনীকারও লিখেছেন, ইংরেজকে এইভাবে এক বছর "গ্রেস" দেওয়া হল। স্বাধীনতার জন্য অধীর দেশবাসী এবং সেই সাথে যে কয়েক সহস্র শ্রমিক তৎক্ষণাৎ স্বাধীনতা ঘোষণার দাবী তুলেছিল তাদের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনা জানিয়ে গান্ধিজীর পছন্দ সভাপতি মোতিলাল নেহেরু বললেন, "একটি জাতির ইতিহাসে এক বছর কিছুই নয়।" গান্ধিজী স্বয়ং আরো এক ধাপ এগিয়ে বললেন, "আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে।" (মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃঃ ৩৩৬) তাই লাহোর কংগ্রেসের পর স্বভাবতঃই দেশবাসী বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক গান্ধিজীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

ইংরেজ এক বছরের সময় সীমাকে তাচ্ছিল্যের সাথে অগ্রাহ্য করল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কংগ্রেসের সম্ভাব্য কার্যক্রমের উপর নজর রাখল। অথচ যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক গান্ধিজী "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা"র প্রস্তাবকে কিভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে কার্যকরী করা যাবে তার কোনো পরিকল্পনা প্রতিনিধিদের সামনে রাখলেন না। জওহরলালের মতে হাওয়ায় "বিদ্যুতবহ্নি" কিন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পরিকল্পনার অভাবে বলতে পারছেন না। ভবিষ্যত কী? জওহরলাল লিখছেন, "আমাদের নৌকা পুড়িয়ে দিয়েছি। ফেরা আর সম্ভব নয়।" আন্দোলনের আদৌ কোনো কর্মসূচী আছে কিনা সে বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ স্থির হয়ে বসে নেই। চোখের সামনে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হয়েছে। জিনিষপত্রের দাম দ্রুত কমছে। কৃষক এবং প্রজার চোখে সুস্পষ্ট আতংক। চাষের প্রকৃত দামটাও তারা হারাতে বসেছে। জওহরলাল প্রশ্ন তুলছেন, গান্ধিজী করছেন কী? ভাইসরয়ের নিকট পত্র লিখে দাবী মানা—না মানার সময় এটা নয়। তাঁর ভাষায় "আমাদের বিতর্ক করার সময় নেই। ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত খাতে বহে চলেছে।" (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী; পৃ. ২১০) সুভাষচন্দ্র দুঃখ করে লিখছেন, বামপন্থীদের তরফে লাহোর কংগ্রেসে সমান্তরাল সরকার স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু গান্ধিজী সেই প্রস্তাব বাতিল করে

দিলেন। অথচ কংগ্রেস আগামী বছরের জন্য "কর্মসূচীও নিল না।" (দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল; পৃ. ১৭৪)

১৯৩০ সাল, ২৬শে জানুয়ারী দেশের সর্বত্র শপথ বাক্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হল। কিন্তু ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে গান্ধিজী তখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারছেন না। তিনি ঐশী শক্তি বা "ইনার ভয়েস" শোনার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তারপর ২রা মার্চ ভাইসরয়কে পত্র লিখে আইন অমান্যের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। লুই ফিশার এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, "বর্তমানে মনে হয় গান্ধী "কণ্ঠস্বর" ("Voice") শুনতে পেয়েছেন, যার অর্থ তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন।"। (দি লাইফ অব মহাত্মা গান্ধী; পৃ. ৩৩৩) অবশ্য সেখানেও তিনি ভাইসরয়কে আশ্বাস দিয়েছেন, যদি তাঁর এগারো দফা দাবী মঞ্জুর করা হয় তা হলে আর আইন অমান্য ঘটবে না। দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে গান্ধিজী স্বাধীনতার আন্দোলনকে ব্যক্তিগত দেওয়া-নেওয়ার পর্যায়ে এইভাবে নামিয়ে আনলেন। এর জন্য কেবলমাত্র নেতাকে দায়ী করে লাভ নেই। যৌথ সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম এক পুতুল ওয়ার্কিং কমিটি যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল একা এক ব্যক্তির স্কন্ধের উপর। দলের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিকে বিশিষ্ট আসনে বসালেন তাঁরা। কোনো সংশয় বা প্রশ্নও এল না মনে। নিষ্ঠাবান অধ্যাপক কর্মী জে. বি. কৃপালনীও নির্দ্বিধায় লিখে ফেলেন, হয়ত কিছুটা আনন্দের সাথে, "আন্দোলনের প্রকৃতি, সীমা এবং শুরু করার সময়, তারিখ নির্ধারনের ভার তাঁরই (গান্ধিজী) হাতে দেওয়া হলো।" (গান্ধী; পৃঃ ১২৮) মনে রাখা প্রয়োজন যে জওহরলাল গান্ধিজীর ভাইসরয়কে লেখা পত্র ও কালহরণের জন্য বিরক্তি প্রকাশ করছেন। তিনিও গান্ধিজীকে একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্পণের ব্যাপারে একজন ইচ্ছুক শরিক। সুভাষচন্দ্র এই কারণেই ওয়ার্কিং কমিটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "বশম্বদ ক্যাবিনেট" বা "Subservient Cabinet."

যাই হোক, গান্ধিজী ১২ই মার্চ তাঁর বিখ্যাত লবণ সত্যাগ্রহ বা ডাণ্ডী অভিযান শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তখনও পর্যন্ত পাওয়া গেল না। তিনি কেবল পরবর্তী ধাপে গণআন্দোলনের কথা বললেন। তাঁর ভাষায় "শুরু যদি সুন্দর এবং সত্যের সাথে হয় আমি মনে করি সারা দেশে সাড়া জাগবে।" আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, তাঁরা যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং অহিংসা সত্যাগ্রহীর মত আচরণ করেন। আন্দোলন তো শুধু স্বেচ্ছাসেবকরাই করেন না, তাঁদের যাঁরা নেতৃত্ব দেবেন,

পরিচালনা করবেন প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই আন্দোলনের মস্তিস্ক। আন্দোলনের শুরুতেই যদি নেতারা গ্রেপ্তার হন, তারপর আন্দোলনের কি অবস্থা হবে? কারা পরিচালনা করবেন, কিভাবে করবেন? যদি পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয় তখন, কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে? আন্দোলন কি মুখ থুবড়ে শুয়ে যাবে? জওহরলালের প্রশ্ন জরুরী অবস্থায় আন্দোলন কে পরিচালনা করবেন? "আমাদের সামনে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর মত একটিই পথ খোলা আছে, তা হল অসমর্থ পুরানোর পরিবর্তে নতুন কম্যাণ্ডার নিয়োগ করা।" কিন্তু তা' করতে গেলে কমিটির সদস্যদের সবাইকে একটি স্থানে মিলিত হতে হবে। আর সেটি করা সম্ভব নয়। দু'একবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু গোপনীয়তা সম্পর্কে কোনো কৌশল অবলম্বন না করায় শেষমেশ কমিটির সব সদস্যই গ্রেপ্তার হয়েছেন। (অ্যান অটো-বায়োগ্রাফী; পৃ. ২১১) জওহরলাল হতাশ হয়ে লিখছেন, "আমাদের সংগ্রামের প্রকৃতি অনুযায়ী জেনারেল এবং ক্যাবিনেট সদস্যদের সর্বচেয়ে সম্মুখভাগে এবং খোলা অবস্থায় থাকতে হোত এবং তারা গ্রেপ্তার হতেন ও শুরুতেই অপসৃত হতেন।"

আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক এবং স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টদের হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বহু একক ক্ষমতা জরুরী অবস্থায় দেওয়া হয়েছিল। এক ধরনের "ডিক্টেটর" (Dictator) বলা যায়। কিন্তু জওহরলাল বলেছেন, এইসব ডিক্টেটরদের একটিই কাজ ছিল—তা হল জেলে যাওয়া। তাঁরা কেবল তখনই কাজ করতে পারতেন যখন অবস্থা বিপাকে কমিটি বসতে পারত না। নতুবা কমিটির অধিবেশন বসলে তাঁদের আর স্বতন্ত্র কোনো ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব থাকত না। জওহরলালের মতে "তিনি (ডিক্টেটর; নারী অথবা পুরুষ) কোনো মৌল নীতি বা সমস্যার" দায়িত্বে থাকতেন না। "কেবল আন্দোলনের নগণ্য বা লঘু বিষয় 'ডিক্টেটর'-এর দ্বারা প্রভাবিত হত।" বস্তুতঃ 'ডিক্টেটর' নির্বাচিত হওয়ার অর্থ জেলখানায় প্রবেশের পদক্ষেপ এবং দিনের পর দিন একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চলল। (ঐ; পৃঃ ২১২)

আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে গান্ধিজী কোনো সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারলেন না। তাঁর বক্তব্য তাৎক্ষণিক কার্যক্রম সম্বন্ধে। অনুসন্ধিৎসু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কেবল বললেন, "আমার শুরু না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। একবার আমি ওখানে (ডাণ্ডি) পৌছালে, পরিকল্পনা আপনি এসে যাবে"... "the idea will be released." আন্দোলন একটা সুপরিকল্পিত লড়াই। এ কোনো ব্যক্তি বিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত "আইডিয়া"র দিকে তাকিয়ে অনির্দিষ্ট

কাল বসে থাকতে পারে না। একমাত্র সম্ভব যদি গুরুবাদে বিশ্বাসী হওয়া যায় এবং আন্দোলনকে যদি অতিন্দ্রীয়বাদের উপর স্থাপন করা যায়। অবশ্য এটাও ঠিক গান্ধিজীকে সমস্ত ভ্রান্তির উর্ধ্বে শুরুতেই রূপান্তরিত করা হয়েছিল। গান্ধিজীর চৌষট্টিতম জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে বলছেন, "উপনিষদে আছে ঈশ্বর যাঁর হৃদয়ে বাস করেন তিনিই মহাত্মা। এই বিশেষণ যথার্থ ভাবেই সেই ঈশ্বরের (প্রেরিত) ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাঁকে আজ আমরা সম্মান জানাচ্ছি।" (মহাত্মা; ৩য় খণ্ড; পৃঃ ১৭৭) তবে গান্ধিজীর ক্ষেত্রে এটি কোনো ধর্মীয় উত্তোরণ ছিল না। তাঁর মধ্যে কিছু ব্যক্তি ও কংগ্রেসীরা ঐশী শক্তির সন্ধান করেছেন। তাই তিনি কোনো ভুল করতে পারেন না—ভুল করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি প্রশ্নেরও উর্ধ্বে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য "আইডিয়া"র প্রতীক্ষায় বসে থাকার ঘটনাকে মনে হবে যুদ্ধের জন্য তৈরী সৈন্যবাহিনীর প্রতীক্ষা করে থাকা কখন সোনানায়কের মস্তিষ্ক থেকে রণকৌশল বেরিয়ে আসবে!

ডাণ্ডী অভিযানের সময়ে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের পদ্ধতি গান্ধিজীর সাবধানী নেতৃত্ব বজায় রাখার এক অভিনব উদ্যোগ। বহু আবেদনকারীর মধ্য থেকে কেবল সবরমতী আশ্রমের আশ্রমিকদের ডাণ্ডী অভিযানের সংগী নির্বাচিত করার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—"আমার উদ্দেশ্য আশ্রমের লোকজনকে সাথী করে আন্দোলন শুরু করা।" কেননা, তারা "শৃঙ্খলার কাছে নতি স্বীকার করেছে এবং (অহিংস) পদ্ধতির ভাবটিকে গ্রহণ করেছে।" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০; "ইয়ং ইণ্ডিয়া"; গান্ধিজীর লিখিত বক্তব্য) যে আন্দোলন গান্ধিজীর আহ্বানে অচিরে গণ-আন্দোলনে পরিণত হতে চলেছে সেখানে শুধু শৃঙ্খলাপরায়ণ আশ্রমবাসীদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করা যদি উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কিছু বলার থাকে না। যদিও গান্ধিজী মনে করেন তাঁর আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও সবাই সে উদাহরণ নাও গ্রহণ করতে পারে এবং অহিংস সহিংসায় পরিবর্তিত হতে পারে। তাঁর কথায়—"আমি দুঃখের সাথে স্বীকার করছি আইন-অমান্য অহিংস আইন অমান্যতেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে—খুব একটা অসম্ভব ঘটনা নয়।" (মহাত্মা; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৭) তাঁর মতে যেখানে সংখ্যাতীত লোক আন্দোলনে নেমেছে সেখানে হিংসার প্রকাশকে সাধ্যমত সংযত করার চেষ্টা হবে—তবে তার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হবে না। যতক্ষণ একজন সত্যাগ্রহীও দাঁড়িয়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। বস্তুতঃ সবরমতী আশ্রমের মধ্য থেকে গান্ধিজী

তাঁর সত্যাগ্রহের সঙ্গী বাছাই করার ভেতর দিয়ে চেয়েছিলেন দেশবাসীকে তাঁর আশ্রমের গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করতে। আর সেই সাথে চেয়েছিলেন সেনা-নায়ক হিসেবে সন্দেহজনক আনুগত্যের অধিকারীদের বর্জন করতে। অন্যথা আশ্রমের যে শৃঙ্খলার কথা তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছেন প্রকৃতই কি তাঁরা সেই সব গুণের অধিকারী? লুই ফিশার আশ্রমবাসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন, আশ্রমের মধ্যে খুব কম জনই গান্ধিজীর কঠোর নিয়মাবলীর যোগ্য ছিল। "কেবলমাত্র তিনি (গান্ধী) তাঁর আদর্শের অনুসারী ছিলেন।"

(গান্ধী; পৃঃ ৩৮২) ১৯১৬ সালে গান্ধিজীর বিনানুমতিতে তাঁর পুত্র মণিলাল আশ্রমের গচ্ছিত অর্থ ভ্রাতা হরিলালকে ব্যবসা করার জন্য আগাম দিয়েছিলেন। মনিলালকে এই অপরাধের জন্য সাময়িকভাবে আশ্রম ত্যাগ করতে হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের ঠিক এক বছর পূর্বে (১৯২৯) আশ্রমের এমন তিনটি নীতিভ্রষ্টতার ঘটনা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় যে তাঁকে একটি প্রবন্ধ লিখতে হয় "নবজীবন" পত্রিকায় "আমার দুঃখ, আমার লজ্জা" নামে। (মহাত্মা; ৩য় খণ্ড; পৃঃ ৩৩৮) গান্ধিজীর পুত্রতুল্য আশ্রমে আবাল্যবর্ধিত ছগনলাল গান্ধী তহবিল তছরূপ করল; স্ত্রী উপহার পাওয়া অর্থ আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করে নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন এবং আর এক আশ্রমবাসী যুবক আশ্রমবাসিনী এক বিধবার সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করল। গান্ধিজী প্রথম এবং শেষোক্ত অপরাধীদের আশ্রম থেকে বহিষ্কার করে দিলেন এবং স্ত্রী আন্তরিক অনুশোচনা প্রকাশ করায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে আশ্রমে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন। (ঐ; পৃঃ ৩২৮-৪০) আশ্রমের এই সব নীতিভ্রষ্টতার পরি-প্রেক্ষিতে ডাণ্ডী অভিযানে যোগদানে ইচ্ছুক বাইরের সত্যাগ্রহীদের নিয়ম-শৃঙ্খলার ট্রেনিং ছিল না বলে আবেদন খারিজ করে দেওয়া নিতান্ত এক অজুহাত ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। বস্তুতঃ অভিযান চলার সময়ে সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে কেউ যাতে প্রশ্ন না তুলতে পারে সে জন্যই গান্ধিজী নিজের পছন্দসই একান্ত অনুগত ব্যক্তিদের ডাণ্ডী অভিযানে সংগী করেছিলেন। আশ্রমবাসীদের বিশেষ গুণাবালী কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না।

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধিজী সকাল সাড়ে ছ'টায় তাঁর ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযান পদব্রজে শুরু করলেন। তখন তাঁর বয়স একষট্টি বছর। সংগে ৭৮ জন আশ্রমবাসী। লক্ষ্যস্থল ২৪১ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত ডাণ্ডী নামে এক পরিত্যক্ত গ্রাম। প্রচণ্ড রোদ এবং ধূলোর মধ্যে গড়ে রোজ বারো মাইলের কিছু কম হেঁটে ৫ই এপ্রিল তিনি গন্তব্যস্থলে পৌঁছালেন। সুভাষচন্দ্র

লিখেছেন, তাঁর এই পদযাত্রা সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং দেশবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাকে তিনি বোঝার সুযোগ পেয়েছিলেন। অন্যথায় তিনি যদি ট্রেনে করে পরের দিন পৌঁছে যেতেন তাহলে শুধু ভারতের মানুষ নয় গুজরাটের জনগণও উদ্দীপ্ত হতে পারত না।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে সংঘবদ্ধ পদযাত্রার ঘটনা এর পূর্বে ভারতের ইতিহাসে আর শোনা যায়নি। বোধ হয় সারা প্রাচ্যেও নয়। মাও সে-তুঙ তাঁর ঐতিহাসিক লঙ্ মার্চ শুরু করেছিলেন এরও চার বছর পরে ১৯৩৪ সালের ১৬ই অক্টোবর। তবে তা' ছিল আরো দীর্ঘ এবং বিপদ সংকুল। এক বছর ধরে চলেছিল এবং প্রায় আট হাজার মাইল পদব্রজে অতিক্রম করতে হয়েছিল। মাও সে-তুঙের ছিল অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম আর গান্ধিজীর ছিল প্রচারে এবং প্রেরণা সঞ্চারের একটি প্রয়াস।

ই. এম. এস. নাম্বুদ্রীপাদের মতে গান্ধীর ডাণ্ডী অভিযান এবং লবণ আইন ভঙ্গকে দেশের লোক সম্পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করেছিল। ৬ই এপ্রিল গান্ধিজীর আনুষ্ঠানিক আইন ভঙ্গের মধ্য দিয়ে শুরু সারা দেশব্যাপী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র ২৬শে জানুয়ারীর পূর্বেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। হীরেন মুখার্জীর ভাষায়, ডাণ্ডীর পর সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিত মুখোশটি পুরোপুরি ছিঁড়ে গেল এবং প্রচণ্ড নির্যাতন শুরু হল। কংগ্রেস এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বেআইনী ঘোষিত হল। গান্ধিজী গ্রেপ্তার হলেন মে মাসে। ১৯৩০ সালের শেষাশেষি প্রায় ৬০,০০০ হাজার স্ত্রী, পুরুষ কারাবরণ করল। আন্দোলনের তিন মাসের মধ্যেই ভাইসরয় গুরুত্ব ও উত্তাপ দু'টোই বুঝতে পেরেছিলেন। ২রা জুন, ১৯৩০ ভাইসরয় লিখছেন, 'আন্দোলন ভয়ংকর আকার নিয়েছে এবং ভারতীয় সমাজের অধিকাংশ স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের কল্পনার সাথে মিলে গেছে, পদভূমি চঞ্চল হয়ে পড়েছে এবং স্পষ্টতঃই এর ভয়ানক সম্ভাবনা আছে। আমি নিশ্চিত যে কেবলমাত্র নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নিয়ে আমরা প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারব না এবং সেই কারণে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিভিন্ন ঘটনার আলোকে আমাকে বিচার করে দেখতে হবে গঠনমূলক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না!" (ভাইসরয় আরউইনের বক্তব্য, উদ্ধৃতির জন্য, তারাচাঁদ ; পৃ. ১৩২ ; ৪র্থ খণ্ড) আরউইনের এই মতামতের আলোকে বোঝা যায় কেন ব্রিটিশদের তরফে গান্ধিজীর সাথে আলোচনায় আগ্রহ দেখা গেছল এবং তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে গান্ধিজী ও কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশদের

কংগ্রেসের সাথে রক্ষা করার পেছনে সুভাষচন্দ্র কতগুলো কারণের উল্লেখ করেছেন। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল আকার ধারণ করেছিল। ভারতের "গেটওয়ে" বলে পরিচিত বোম্বাই আন্দোলনের ঝটিকা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলার বিভিন্নস্থানে করবন্ধ আন্দোলন জোরদার হচ্ছিল। প্রতিটি প্রদেশে বিদেশী দ্রব্য বর্জন অথবা কোনো ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন চালু ছিল। বাংলাদেশে গুপ্ত সন্ত্রাস ভয়ংকর আকার নিয়েছিল। সবশেষে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ—সীমান্ত প্রদেশের দুর্দান্ত উপজাতীরা মহাত্মা গান্ধী এবং খান আবদুল গফফর খানের মুক্তি এবং ভারতকে স্বরাজ প্রদানের বিনিময়ে কেবল ইংরেজদের সাথে শান্তি বজায় রাখতে রাজী ছিল। (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ; পৃ. ১১৯) পেশোয়ারে আইন অমান্য আন্দোলনের নেতারা গ্রেপ্তার হলে সারা শহরে ব্যারিকেড তৈরী করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়। স্থানীয় গ্রামগুলি থেকে পাঠানো কৃষকরা শহরবাসীর পাশে এসে দাঁড়াল। ভীত সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ কর্মকর্তারা শহরের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিল। হিমালয় অঞ্চলের গাড়োয়াল রেজিমেন্টকে আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের উপর গুলী বর্ষণ না করে তাদের সাথে প্রকাশ্যে সৌভ্রাতৃত্ব উত্থাপন করল। স্থানীয় ইংরাজ কম্যাণ্ডাররা প্রায় পনেরো দিনের মত শহরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। মোহাম্মদি এবং আফ্রিদি উপজাতীরা পেশোয়ারের জনগণের সমর্থনে দাঁড়িয়ে ছিল কেবলমাত্র কংগ্রেস নেতাদের অনুরোধে হিংসা থেকে বিরত হয়ে পুনরায় পাহাড়ের গিরিবর্ত্মে ফিরে গেছল। ১৯৩০ সালের শেষের দিকে প্রায় সমস্ত সীমান্ত প্রদেশ বন্দুক হাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত ছিল। ভারতের পূর্ব সীমান্তেও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটল। ১৮ই এপ্রিল 'মাষ্টারদা' (সূর্যসেন)-এর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অবস্থিত ব্রিটিশ অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হল। প্রায় দশদিন চট্টগ্রামে কোনো ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব ছিল না। পেশোয়ার এবং চট্টগ্রামে যদি পেটি বুর্জোয়ারা নেতৃত্ব দিয়ে থাকে তবে মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে শ্রমিকরা সশস্ত্র লড়াইতে নেমে পড়েছিল (৫ই মে)। বিদ্রোহীরা সরকারী অফিস, রেল ষ্টেশন প্রভৃতিতে অগ্নিসংযোগ করে রাস্তার মুখোমুখি লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। সমগ্র শহরটি প্রায় এগারো দিনের মত বিপ্লবী কাউন্সিলের অধীনে চলে গেছল। মনে রাখা প্রয়োজন, বিপ্লবী প্রচেষ্টাগুলি ব্যর্থ হলেও দেশের সাধারণ মানুষের মনে এর যে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ঘটছিল তা' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টি এড়ায়নি।

"দিল্লী প্যাক্টে"র (১৯৩১) ক্ষেত্রে ইংরেজরা যে উদ্যম নিতে বাধ্য হয়েছিল

তার পিছনে সুভাষচন্দ্র সঠিকভাবেই বলেছেন, কাজ করেছিল গণ-অভ্যুত্থানের ক্রমবর্ধমান চাপ। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে লর্ড আরউইনের মধ্যে কিছুটা সদাশয়তা লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে লর্ড আরউইনের "দৃষ্টি গড়পড়তা ব্রিটিশ রাজনীতিকের চেয়ে উদার ছিল। সুবিচার এবং সদাচারের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল—যা' অন্যদের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনুপস্থিত। প্রয়াত মৌলানা মহম্মদ আলী তাঁকে এক "দীর্ঘশার্ণকায় খ্রীষ্টান" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন সত্যকার খ্রীষ্টান ছিলেন।" (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ; পৃ. ১৯৯) সুভাষচন্দ্র মনে করেন সে সময়ে লেবার পার্টি যদি ক্ষমতায় না আসত এবং অন্য কোনো এক গুঁয়ে ভাইসরয় ভারতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতেন তাহলে কংগ্রেসের সাথে আপোষে আসার চেষ্টা হত না। (ঐ ; পৃ. ১৯৮) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নিজের স্বার্থে তৎকালীন বৈপ্লবিক পরিস্থিতি (যার স্বীকৃতি ভাইসরয়ের ২রা জুনের রিপোর্ট) এড়াবার জন্য গান্ধিজীর সাথে আপোষে বসতে হয়েছিল। একথা সর্বজনবিদিত ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংরক্ষণের প্রশ্নে কনজারভেটিভ বা লেবার পার্টির মধ্যে কোনো মূল বিরোধ ছিল না। মনে রাখা প্রয়োজন, "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস" এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল লেবার গবর্নমেণ্ট ভারতে তাদের ভাইসরয় লর্ড আরউইনের (যিনি কনজারভেটিভ দলের সদস্য) মাধ্যমে (৩১শে অক্টোবর, ১৯২৯)। কিন্তু ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে কনজারভেটিভ এবং অন্যান্য সদস্যদের চাপে তারা সে প্রতিশ্রুতি জঘন্যভাবে ফিরিয়ে নিতে দ্বিধা করেনি। লেবার পার্টির মন্ত্রী সিডনে ওয়েব নির্লজ্জভাবে বললেন, লেবার পার্টির ভারত সম্পর্কীত নীতি জাতীয় নীতি এবং কোনো দলীয় নীতি নয়। ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস নিকট ভবিষ্যতে মঞ্জুর করা সম্ভব নয়। (উদ্ধৃতির জন্য, তারাচাঁদ ৪র্থ খণ্ড ; পৃঃ ১২০) আইন অমান্য আন্দোলন মোকাবেলার জন্য যে দমন নীতির আশ্রয় আরউইন গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁর মধ্যে কোনো প্রকৃত খ্রীষ্টান গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভগত সিং এবং তাঁর সহচরদের ফাঁসী রদ করার ব্যাপারে তিনি গান্ধিজীকে যে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কার্যক্ষেত্রে তিনি সে ব্যাপারে আন্তরিক কোনো প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন বলে জানা যায়নি। তাঁর অত্যাচার এবং নিপীড়ন বিপ্লবীদের প্ররোচিত করেছিল তাঁর প্রাণনাশের জন্য। তিনি যে ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন অল্পের জন্য সেই ট্রেন (ডিসেম্বর, ১৯২৯) বোমার আঘাত থেকে রক্ষা পায়। গান্ধিজী "ডিয়ার ফ্রেণ্ড" সম্বোধন করে পত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু আরউইন নিজের সাক্ষরে তার জবাব দেওয়ার ভদ্রতাও দেখান নি। সেক্রেটারীকে দিয়ে চার লাইনের জবাব পাঠিয়ে ছিলেন। গান্ধিজী তাঁর পত্রে

(২রা মার্চ, ১৯৩০) সমস্যার মীমাংসার জন্য দেখা করে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আরউইন আলোচনা দূরে থাকুক সাক্ষাৎ করার সৌজন্যতাও দেখাননি। অথচ এক বছরের মধ্যে সেই আরউইনের সাথে গান্ধিজী যখন একই সমস্যা নিয়ে দেখা করে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন কিন্তু মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে গান্ধিজীর ইচ্ছা পূরণ হল। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে গান্ধিজী সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে পত্র দেন ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩১) আর ১৭ই ফেব্রুয়ারী শুরু হল আলোচনা। এর কারণ আর কিছুই নয়, দেশের আন্দোলনের চাপ ক্রমশঃ সাম্রাজ্যবাদের গলা ঠুঁসে ধরছিল। অবশ্য জওহরলাল নেহেরু যুক্তিসংগতভাবেই লর্ড আরউইন আর তাঁর স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড উইলিংডনের (যাঁর আমলে নির্যাতন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছিল) মধ্যে বিশেষ কোনো তফাত খুঁজে পাননি। তাঁর ভাষায় এঁরা দু'জনেই ছিলেন "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির যন্ত্র" এবং সেই নীতিতে তাঁরা সামান্যই পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন। (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী; পৃঃ ৩২২)

তিন সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পর "দিল্লী প্যাক্ট" বা গান্ধী-আরউইন চুক্তি যখন প্রকাশিত হল তখন দেখা গেল পূর্ণ স্বরাজ দূরের কথা অনেক স্বল্প গুরুত্বের রাজনৈতিক প্রশ্নও অমীমাংসিত থেকে গেছে। রজনীপাম দত্ত এই প্যাক্টের সারমর্ম সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। প্যাক্টের দ্বারা কংগ্রেস আন্দোলনের কোনো একটি লক্ষ্যও পূর্ণ হয়নি। এমন কি লবণ আইনও প্রত্যাহৃত হয়নি। অথচ আইন অমান্য তুলে নেওয়া হল। যে গোলটেবিল বৈঠককে বর্জন করার কথা বলা হয়েছিল এখন তাতেই যোগ দিতে কংগ্রেস স্বীকৃত হল। স্বায়ত্তশাসনের পথে এক পা'ও এগোনো যায়নি। গোলটেবিল আলোচনার ভিত্তি হবে "যুক্তরাজ্য সংবিধান" আর তার সাথে "ভারতীয় দায়িত্ব।" কিন্তু "ভারতের স্বার্থে সংরক্ষণের রক্ষাকবচ" থাকবে। অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার এবং বন্দী মুক্তি স্বীকৃত হল কিন্তু যাঁরা "হিংসা" বা "হিংসায় প্ররোচনা"র জন্য দায়ী তাঁরা মুক্তি পাবেন না। যে সব সৈনিকরা আদেশ অমান্য করেছে (অর্থাৎ গাড়োয়ালী সৈনিকরা) তাঁরাও রেহাই পাবে না। বিদেশী বস্ত্র বর্জনের স্বাধীনতা রইল তবে তা' শুধু "ব্রিটিশ পন্যের বিরুদ্ধে নয়।" তবে বর্জনের ক্ষেত্রে পিকেটিং বা হিংসাত্মক বিক্ষোভ দেখানো চলবে না এবং এটি কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্যও চলবে না। রজনীপাম দত্তের মতে এই প্যাক্ট এক হাতে দাবী মেনেছে অন্য হাতে তা' কেড়ে নিয়েছে। (ইণ্ডিয়া টু ডে; পৃঃ ৩৭৩-৭৪)

গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে জওহরলাল দারুণভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। এই চুক্তি ভারতের স্বাধীনতার মত জরুরী বিষয়টিকে স্পর্শও করেনি। এমনকি নিকট ভবিষ্যতে "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস" প্রদানের কথাও বলেনি। যুক্তপ্রদেশের মত যেসব স্থানে কৃষকরা কংগ্রেসের ডাকে রাজস্ব বন্ধ করেছিল চুক্তির প্রাক্কালে গান্ধিজী আরউইনের কাছে আশ্বাস চেয়েছিলেন বিশ্বের মন্দাজনিত পরিস্থিতির কথা স্মরণ রেখে তিনি যেন জোর করে রাজস্ব আদায় না করেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত আরউইনের কাছ থেকে সুস্পষ্ট কোনো আশ্বাস আদায় করতে ব্যর্থ হন। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দু'দিক থেকেই এই চুক্তির ব্যর্থতা জওহরলালের মনে এক দারুণ শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী ; পৃ. ২৮৭-৫৯) আন্দোলনের সময়ে যে সমস্ত পুলিশী অত্যাচার ঘটেছিল সেগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবীও সরকারকে দিয়ে গান্ধিজী স্বীকার করাতে পারেননি। উপরন্তু চুক্তিতে যে বন্দী মুক্তির কথা বলা হয়েছিল সেগুলি মান্য করার চেয়ে ইংরেজরা বেশি অমান্য করেছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে জড়িত এই মিথ্যে অজুহাতে অনেক রাজবন্দীকে জেলের মধ্যেই রেখে দিল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে জড়িত শ্রমিক নেতারাও অব্যাহতি পেলেন না। ১৯৩১ সালের ২১শে জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সম্পর্কিত নীতি বিষয়ক বক্তৃতা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং তার উপর ভিত্তি করে কংগ্রেস কোনো আলোচনায় বসতে পারে না। গান্ধিজী সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে দায়িত্বশীল সরকার গঠন, পূর্ণ স্বরাজ আলোচনার মূল বিষয়বস্তু না হলে তিনি লণ্ডন যাবেন না। (তারাচাঁদ ; ৪র্থ খণ্ড ; পৃঃ ১৪২) অথচ পূর্ণ স্বরাজ দূরে থাকুক "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস"-কেও আলোচ্য বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত না করাতে পেরেও গান্ধিজী গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন বলে লর্ড আরউইনকে "চুক্তি" মারফত প্রতিশ্রুতি দিলেন। চুক্তিতে যদিও ভারতীয় দায়িত্বের কথা বলা হয়েছিল কিন্তু ভারতের স্বার্থে রক্ষাকবচের কথা উল্লেখ করে প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র সঠিক ভাবেই মন্তব্য করেছেন, কেবলমাত্র যে রক্ষাকবচ ভারতীয়রা চায় তা' হল স্বাধীনতা আর ব্রিটিশরা যে রক্ষকবচ প্রকৃত পক্ষে দাবী করছে তা ভারতীয়দের স্বার্থ-বিরোধী। তাঁর মতে এই চুক্তি ভারতীয় জনগণের সামনে আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ এনেছিল। মহাত্মার উচিত ছিল বোঝাপড়ার পথে না গিয়ে আরো কিছুদিন লড়াই চালিয়ে যাওয়া। আলোচনার উপযুক্ত সময় তখনও আসে নি। (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ; পৃ. ২০৮-২০৯)

গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদনের পর গান্ধিজী বলেছিলেন, এই চুক্তি সরকার এবং জনগণের জয়। চুক্তি বিষয়ে দৌত্যকারী নরমপন্থী বা লিবারেল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ভাইসরয়কে গান্ধিজী সম্পর্কে বলেছিলেন, "তিনি একজন নারীর মত। আপনাকে জয় করতে হবে।" নিজের উপর অগাধ আস্থাবান গান্ধিজীও শাস্ত্রীকে বলেছিলেন, "আমি চাই আমাকে জয় করুক।" (উদ্ধৃতির জন্য, তারাচাঁদ; ৪২ খণ্ড; পৃ. ১৬১) গান্ধী-আরউইন চুক্তি পাঠের পর মনে হয় আরউইন গান্ধিজীকে জয় করতেই সমর্থ হয়েছিলেন।

আলোচনা শুরু করার সময়ে গান্ধিজী ছ'টি দাবী পুরণের শর্ত দিয়েছিলেন। সাধারণ মার্জনা, নির্যাতন বন্ধ, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির প্রত্যর্পণ, রাজনৈতিক কারণে বরখাস্ত সরকারী চাকুরেদের কর্মে পুনর্বহাল; লবণ তৈরীর স্বাধীনতা এবং বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করার অধিকার; পুলিশী অত্যাচার সম্পর্কেও তদন্ত।

কার্যক্ষেত্রে দেখা চুক্তি সাধারণ মার্জনার ব্যাপারে নীরব রইল। বিপ্লবী ও শ্রমিক আন্দোলনের সাথে জড়িত বন্দী এবং বিচারাধীন বন্দীরা ও দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত বন্দীরা রেহাই পেলেন না। এঁদের সংখ্যা খুব কম করে হলেও দেশের বিভিন্ন জেলে কয়েক শত হবে। নির্যাতন বন্ধের কথা বলা হলেও পুরোদমে বিপ্লবীদের উপর অব্যাহত রইল; বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে দেখা গেল যেগুলি তৃতীয় পক্ষের হাতে চলে গেছল (এদের সংখ্যা বহু) সেগুলি ফেরত দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা সরকার নিল না। চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় প্রশাসনের মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়া হল। লবণ আইন (Salt Act) সম্পর্কে সরকার কোনো মূল নীতির পরিবর্তন করতে পারবে না বলে সাফ জবাব দিয়েছিল। একমাত্র বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও মদের দোকানে পিকেটিং করাকে শর্তসাপেক্ষে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ জোর জুলুম এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যেন না করা হয়)। আর পুলিশী অত্যাচারের তদন্ত ও চুক্তিতে ঠাঁই পেল না।

গান্ধী আরউইন চুক্তির প্রকৃত রূপটি যদি এই তাহলে স্বীকার করতেই হবে গান্ধিজীর কথা অনুযায়ী সরকারের জয় হয়েছিল এবং "জনগণের জয়" সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা খুব সম্ভবতঃ অতিশয়োক্তি বলেই মনে হবে। কারণ গান্ধিজী যখন আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে "সাময়িকভাবে রদ" (Suspended) কথাটি উল্লেখ করতে চেয়েছেন তখন আরউইনের চাপে শেষ পর্যন্ত তাঁকে "বন্ধ" বা "discontinued" কথাটিকেই মেনে নিতে হয়েছে।

(মহাত্মা, ৩য় খণ্ড ; পৃ. ৫৫) অথচ ডাণ্ডী অভিযানের সময়ে গান্ধিজী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, "যতক্ষণ একজন সত্যাগ্রহীও বেঁচে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত শুরু করা আন্দোলন বন্ধ হবে না।"

আন্দোলন যখন জোর কদমে চলেছে তখন কেন গান্ধিজী এ ধরনের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে প্রয়াসী হলেন তার একটি ব্যাখ্যা জওহরলাল দিয়েছেন। বোধগম্য কারণে তিনি বস্তুগত কারণের পরিবর্তে গান্ধিজীর মানসিকতার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে খুব একটা সুফল লাভ করবেন এরকম কোনো চিন্তা নিয়ে গান্ধিজী আলোচনায় বসেননি। নিজের যুক্তির উপর অসম্ভব আস্থা থাকায় তিনি আশা করতেন বিরোধীদেরও তাঁর যুক্তির সপক্ষে আনতে পারবেন। (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী ; পৃ. ২৪৮-৪৯) বলা বাহুল্য ! গান্ধি-আরউইনের 'চুক্তি'র ক্ষেত্রে গান্ধিজী নন, আরউইনই তাঁকে তাঁর (আরউইনের) সপক্ষে এনে ছিলেন। জওহরলাল অবশ্য গান্ধিজীর উপরোক্ত মানসিকতাকে সমর্থন করেননি।

রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন আইন অমান্য আন্দোলনের অনিবার্য পরাজয় এড়াবার জন্যই গান্ধিজী আপোষের হাত বাড়িয়েছিলেন। তিনি বেছে নেন "স্বেচ্ছায় পিছু হঠা"। (ফ্রিডম ম্যুভমেণ্ট ; ৩য় খণ্ড ; পৃ. ৩৮০) আন্দোলনের নেতৃত্বস্থানীয় অংশগ্রহণকারী সুভাষচন্দ্র বা জওহরলাল মনে করেন আন্দোলন উৎসাহের সাথে এগিয়ে চলছিল। ১৯৩১ সালের ১২ই জানুয়ারী ইংলণ্ডের প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান"-এ আন্দোলন সম্পর্কে একটি রিপোর্ট বেরোয়। ওই রিপোর্টে লেখকের মতে—"জনসাধারণের (ভারতীয়) এক বিরাট অংশ আর স্বাভাবিক মানসিকতায় নেই। তাকে ধীরে ধীরে জাগানো হয়েছে। প্ররোচিত করা হয়েছে ক্রোধের দিকে···আমাদের সততার উপর সন্দেহ এসেছে এবং সর্বোপরি কারাবন্দী নেতাদের প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট··· যতক্ষণ গান্ধী কারাগারে আছেন আমার সন্দেহ আছে তাঁর আন্দোলনের প্রধান অংশ প্রতিরোধ পরিত্যাগ করবে বা স্তিমিত হয়ে পড়বে কিনা !" উক্ত লেখক ব্রেইলসফোর্ড প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা থেকে লিখছেন, "লাঠি চার্জের সম্মুখীন হওয়াকে গৌরবজনক মনে করে শত শত স্বেচ্ছাসেবক শহীদের মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে মার খাওয়ার জন্য এগিয়ে যেত। তারা সুশৃঙ্খল নিষ্ক্রিয় সাহসের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রেখেছিল।" (উদ্ধৃতির জন্য দি হিস্ট্রী অব দি কংগ্রেস ; ১ম খণ্ড ; পট্টভী সীতারামাইয়া ; পৃ. ৬৮৭-৯১) সরকারের শুধু রাজনৈতিক মর্যাদা হ্রাস পাচ্ছিল না আর্থিক স্বার্থও যথেষ্ট পরিমাণে বিঘ্নিত হচ্ছিল। ব্রিটিশ বস্ত্রের

আমদানীর মূল্য ১৯২৯ সালে ডেমিলিয়ন পাউণ্ড থেকে সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়ে দাঁড়াল পরের বছরে (১৯৩০) ১৩'৭ মিলিয়ন পাউণ্ড। একইভাবে অন্যান্য ব্রিটিশ ট্রেড কমিশনারের অফিসে জমা হতে লাগল ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো, ডানলপ প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ নিয়ন্ত্রিত কোম্পানীগুলির অভিযোগের আর্তনাদ। (সুমিত সরকার; পৃ. ২৯৩) আমদানীখাতে সরকারের বাৎসরিক আয় ৩১% থেকে ৪৫%-র মত কমে গেছল—অন্ততঃপক্ষে বস্ত্র এবং সুতোর ক্ষেত্রে। তা'ছাড়া তিরিশের দশকে যেভাবে মন্দাজনিত পরিস্থিতির দরুণ প্রথমে গম (উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল) এবং পরে চ্যলের দাম প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছল (উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল এবং বিহার) তাতে চাষীরা প্রায় বিদ্রোহের পথে পা বাড়াল। এস. গোপাল লিখেছেন, ব্রিটিশ সরকার এক বিরাট আকারে কৃষক বিদ্রোহের সম্ভাবনায় আতংকিত হয়ে গান্ধিজীর সাথে মীমাংসার জন্য অধীর হয়ে পড়েছিল। (জওহরলাল নেহেরু; এস গোপাল, ১ম খণ্ড; পৃ. ১৫৩; লণ্ডন, ১৯৭৫) সুতরাং তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে কখনোই বলা যাবে না সুনিশ্চিতভাবে যে পরাজয় অনিবার্য ছিল।

বস্তুতঃ সুভাষচন্দ্রের উক্তিমত এটা ঠিক যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী অংশ যারা ধনী ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র ও নিজেরাও বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত তারা গান্ধিজীর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল আপোষ আলোচনার জন্য। ভারতীয় বুর্জোয়াদের এক অংশ বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী-শ্রেণী যাদের কম্প্র্যাডোর বলা যায় তারা কখনোই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এসপার ওসপার লড়াইতে বিশ্বাসী ছিল না। ঘন ঘন হরতাল, বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং সর্বোপরি বিশ্বের মন্দাজনিত পরিস্থিতিতে ব্যবসার উপর যে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে তা' সহ্য করার ক্ষমতা ও ধৈর্য তারা হারিয়ে ফেলেছিল। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যাচ্ছিল শহরে ব্যবসায়ীরা আন্দোলনে তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার যে সব ব্যবসায়ীরা বিদেশী বস্ত্র আমদানী করে লাভের বখরা ঘরে তুলতেন তাঁদের আমদানী ১৯২৯ সালের নভেম্বরের তুলনায় ১৯৩০ সালের নভেম্বরে প্রায় শতকরা ৯৫% কমে গেছল। (ফ্রিডম ম্যুভমেণ্ট; ৩য় খণ্ড; পৃ, ৩৪৮) সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী বিদেশী বস্ত্র বিক্রির সাথে সংযুক্ত বেনারস, অমৃতসর এমনকি বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা "কংগ্রেস নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের" মনোভাব প্রকাশ করেছিল। ৮ই অক্টোবর, ১৯৩০, জি. ডি. বিড়লার ঘনিষ্ঠ

সহযোগী দেবী প্রসাদ খৈতানকে এক পত্রে পুরুষোত্তম দাস (ঠাকুরদাস) জানাচ্ছেন, "দিল্লী অমৃতসর এবং কানপুর ভ্রমণ করে আমার ধারণা হয়েছে যে থান কাপড়ের আমদানীকারক ডিলাররা পিকেটিং সম্বন্ধে উত্তক্ত হয়ে পড়েছে।" ১৯৩১ সালের মার্চে স্যার হোমী মোদী যাঁকে দেশীয় পুঁজিপতিদের মধ্যমণি বলা যায় তিনি সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে ছিলেন "ঘন ঘন হরতাল ব্যবসা এবং শিল্পকে এলোমেলো করে দিয়েছে।" (উদ্ধৃতির জন্য, সুমিত সরকার, পৃঃ ২৯৫)

এ কারণেই সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ এবং ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নিরুপদ্রবভাবে ব্যবসা পরিচালনার স্বার্থে শান্তি চুক্তি রচনায় অধীর আগ্রহ প্রকাশ করছিল। (ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল, পৃঃ ২০০-২০২) বস্তুতঃ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক কারণে খুশী করার জন্য অ-ব্রিটিশ পণ্যের আমদানীর উপর কোনো অতিরিক্ত শুল্ক ব্রিটিশ সরকার বসাননি। ভাইসরয়-কে পাঠানো বোম্বাই গবর্ণরের ৭ই ফেব্রুয়ারীর রিপোর্টে বলা হচ্ছে "গান্ধীর অনুগামীদের মধ্যে অনেকে বিশেষ করে বণিক গোষ্ঠী চিন্তা করছেন তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে যদি না তিনি যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টি গ্রহণ করতে রাজী হন।" ১১ই ফেব্রুয়ারী, বিড়লার ঘনিষ্ট ব্যবসায়ী বন্ধু ডি. পি. খৈতান কলকাতার বণিক সভায় সভাপতির বক্তৃতা দিতে গিয়ে ঘোষণা করেন, "এই প্রস্তাবটি দেওয়া বোধ হয় ভুল হবে না যে সময় এখন এসেছে মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের উচিত হবে সম্মানজনক মীমাংসার সন্ধান করা।" ভাইসরয় ওই একই তারিখে (১১ই ফেব্রুয়ারী) ভারত সচিবকে জানাচ্ছেন "খুব সম্ভবতঃ পুরুষোত্তমদাস (ঠাকুরদাস) বণিকদের চাপ সৃষ্টি করার জন্য গান্ধীর সাথে এলাহাবাদে দেখা করবেন।" মনে রাখা প্রয়োজন দেশীয় পুঁজিপতিরা ভাল অংকের অর্থ আইন অমান্য আন্দোলনে প্রদান করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজের উপর চাপ সৃষ্টি করে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায়। ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের কাছে ১৯৩০ সালের ২৮শে এপ্রিল প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ এক পত্র মারফত ঘোষণা করেন, "যদি ভারত সরকার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মতামতকে গ্রাহ্য না করেন তাহলে আমাদের ভাগ্য যাঁরা স্বরাজের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছেন তাঁদের সাথে যুক্ত করা।" ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের সূত্র অনুযায়ী ঘনশ্যামদাস বিড়লা একাই এক থেকে পাঁচলক্ষ টাকার মত অর্থ আন্দোলনে দান করেছিলেন। (উদ্ধৃতির জন্য, সুমিত সরকার, পৃঃ ২৯২ এবং ৩১১)

গান্ধী-আরউন চুক্তি রাজনৈতিক মর্যাদার দিক থেকে কংগ্রেসকে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সমমর্যাদার আসন দিল। গান্ধিজীর সাথে চুক্তি সম্পাদন

করে ব্রিটিশ সরকার পরোক্ষ কংগ্রেসকে ভারতীয় রাজনীতির মূল প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতি জানালো। বোঝা গেল ভবিষ্যতে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজতে গেলে কংগ্রেসের সমর্থনে খুজতে হবে। আর এই সংগে এটাও বোঝা গেল কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ আন্দোলনকে কখনোই তার যুক্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তির পথে নিয়ে যাবে না। আপোষের জন্য অধীর হয়ে আলোচনার টেবিলে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত কূটনীতির কৌশলে ইংরেজদের কাছে দাঁড়াতে পারবে না। "দিল্লী প্যাক্ট" থেকে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা পর্যন্ত একই ইতিহাসের ক্লান্তিকর রকমফের।

করাচী অধিবেশনে (২৯শে মার্চ, ১৯৩১) "দিল্লী প্যাক্ট"কে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দিল। অধিবেশনের মাত্র ছ'দিন পূর্বে ভগত সিং এবং তাঁর অনুগামীদের ফাঁসী হওয়ায় গান্ধীজীকে তরুণ সমাজের বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়। তেণ্ডুলকারের মতে চুক্তিকে যদিও অধিকাংশ ব্যক্তি অনুমোদন জানিয়েছিল তথাপি এটি জনপ্রিয় ছিল না। (মহাত্মা; ৩য় খণ্ড; পৃঃ ৭৪) করাচী কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা "মৌলিক অধিকার এবং অর্থ-নৈতিক নীতি" সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ। মূল কথাগুলি ছিলঃ—১) মৌল অধিকারগুলি সম্পর্কে জনগণকে নিশ্চয়তা প্রদান; ২) জনগণের কোনো অংশকে ধর্ম ও জাতের ভিত্তিতে বঞ্চিত না করা; ৩) আঞ্চলিক ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন ও ভাষাগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধন; ৪) করভার লাঘব; ৫) বেগার শ্রম নিষিদ্ধ; ৬) লবণ শুল্ক বিলোপ এবং, ৭) শ্রমিকদের বিশেষ অধিকার সংরক্ষণ; যেমন, সুস্থ কাজের পরিবেশ; ন্যূনতম জীবনধারণের মজুরী; বেকার বীমা প্রবর্তন এবং ৮ ঘণ্টা কাজ ও সবেতন ছুটি। (ফ্রিডম স্ট্রাগল; পৃঃ ১৮০-৮১; ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৭)

করাচী কংগ্রেসের মৌলিক অধিকার ও আর্থিক নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি নিঃসন্দেহে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। তবে জওহরলাল সঠিক ভাবেই বলেছেন, এটি ছিল "অত্যন্ত হ্রস্ব পদক্ষেপ," করাচীতে গৃহীত নীতিগুলি তাঁর মতে "আদৌ সমাজতান্ত্রিক ছিল না এবং একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ওই প্রস্তাবের সবগুলিকে অতি সহজে গ্রহণ করতে পারত।" (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী; পৃঃ ২৬৬) যদিও ওই প্রস্তাবে ভারী শিল্প এবং সেবা (Service)-কে জাতীয়করণ করার কথা বলা হয়েছিল।

এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে কংগ্রেস হঠাৎ তথাকথিত জাতীয়তার ভাবধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে

ঝুঁকে পড়ল। আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শ্রমিক ও কৃষকরা যেভাবে সামনের সারিতে এসে পড়েছিল তার ফলে কংগ্রেসের মত গণ-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শোষিত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এছাড়া যদিও আর্থিক সাহায্যের জন্য জাতীয় বুর্জোয়ারা দেশীয় শিল্পপতি এবং ভূস্বামীদের উপর নির্ভর করতেন তাহলেও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে—যা অহিংসা হলেও মুখোমুখি সংঘর্ষের পথ গান্ধিজীর নেতৃত্বে নিয়েছিল, তাকে গতিশীল রাখতে গেলে শ্রমিক, কৃষকের সমর্থন ও অংশগ্রহণ অপরিহার্য ছিল। গান্ধিজীর এই বাস্তব বিবেচনার বোধ ছিল এবং সে কারণেই তিনি এদের দাবী-দাওয়ার (যদিও আংশিক) কথা উচ্চারণ করে সমাজের এই নির্যাতিত শ্রেণীকে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের মার্চে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে দাবী জানালো ভূমিরাজস্ব হ্রাস করতে এবং মহাজনকে আংশিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে সাময়িকভাবে ঋণ পরিশোধ বন্ধ রাখতে। ত'ছাড়া কৃষককে উৎখাত করার জমিদারের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতারও সংকোচনের দাবী জানালো। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রথম দাবীটি মেনে নিল কিন্তু কৃষককে উৎখাত করার ব্যাপারে নীরব রইল। এমন কি "মৌলিক অধিকার ও আর্থিক নীতি" সংক্রান্ত প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করে গান্ধিজী হিন্দীতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীকে সুস্পষ্ট আশ্বাস দিলেন— "মহারাজা এবং জমিদারদের নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে যে কংগ্রেস তাঁদের ধ্বংস চায় না কিন্তু নিশ্চিতভাবে অন্যায় ও অবিচারের বিলুপ্তি চায়। তাঁরা যেন রায়তদের অভিযোগগুলির প্রতি আন্তরিক দৃষ্টি দিয়ে তাদের মংগলের জন্য উচিত ব্যবস্থা নেন।" এরপর গান্ধিজী তাঁদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বললেন, "তাঁরা ইচ্ছা করলে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন।" (মহাত্মা ; ৩য় খণ্ড ; পৃঃ ১০)

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর শুরু হয়ে ১৯৩২ সালের ১৯শে নবেম্বর শেষ হল। কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী যোগ দিলেও প্রধান রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতির জন্য বৈঠক কার্যক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হল না। প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কংগ্রেসের নিকট আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে বৈঠকে বসার অনুরোধ জানালেন। বস্তুতঃ কংগ্রেস ছাড়া যে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এটাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পরোক্ষে স্বীকার করে নিলেন। অর্থাৎ ডেনমার্কের রাজকুমার ছাড়া হ্যামলেটের অভিনয় সম্ভব নয়। কিন্তু গান্ধিজী ইংরেজদের এই উপায়হীনতার পূর্ণ সুযোগ নিতে ব্যর্থ হলেন। "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস" সম্পর্কে আলোচনার কোনো সুস্পষ্ট আশ্বাস

না পেয়েই গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে লণ্ডন যাত্রা করলেন। যাত্রার প্রাক্কালে বললেন, ঈশ্বরকে আমার পথ পরিদর্শক করেছি। তবে "দিগন্ত যতটা অন্ধকার হওয়া সম্ভব ততটাই। শূন্য হাতে ফিরে আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।" এতৎ সত্ত্বেও তিনি যাচ্ছেন—কেননা তিনি "আশাবাদী।" অথচ এই "আশা"র ভিত্তি কি তিনি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। (উদ্ধৃতির জন্য; ঐ পৃঃ ১০৯) ফ্রাংক মোরেস লিখছেন, ইতিমধ্যে ভারতে খবর পৌঁছেছিল যে ব্রিটিশ সরকার ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনে সম্মতি প্রকাশ করলেও রক্ষা কবচের বেনামীতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিজেদের হাতে ধরে রাখবে এবং এ সম্পর্কীত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরা কোনো আলোচনা চালাতে নারাজ। তাছাড়া ব্রিটেনে সরকারের চরিত্রও পরিবর্তিত হয়েছিল। গান্ধিজীর লণ্ডন যাত্রার কিছুপূর্বে আগষ্ট মাসেই শ্রমিক দলের পরিবর্তে ত্রিদল বিশিষ্ট একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর সেই সরকারে রক্ষণশীল দলের মত ভারতের স্বাধীনতার তীব্র বিরোধী ব্যক্তিরাও ছিলেন (জওহারলাল নেহেরু; পৃ. ১৮৫)

গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধিজীকে একমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত করায় (২রা এপ্রিল, ১৯৩১) সুভাষচন্দ্র ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়েছিলেন। তাঁর মতে আলোচনার সময়ে তাঁকে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য কেউ রইল না। এ ধরনের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত গান্ধিজীর মনোনীত ওয়ার্কিং কমিটি কেন নিয়েছিল। তার কোনো ব্যাখ্যা সুভাষচন্দ্র খুঁজে পাননি। (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল; পৃ. ২১৩-১৫) প্রকৃতপক্ষে সরকার কংগ্রেস থেকে কুড়িজন প্রতিনিধি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কংগ্রেস একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে গান্ধিজীকে নির্বাচিত করছিল। এর কারণ ১৫০ জনের মত কংগ্রেস সদস্য লণ্ডন যাত্রার প্রার্থী ছিল। তাঁদের মধ্যে মাত্র কুড়িজনকে নির্বাচিত করলে বাকী ১৩০ জন অসন্তুষ্ট হতেন। (বি. এন. পাণ্ডে; পৃ, ১৩৫; পাদটীকা)

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শুরু হল ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১। লেবার পার্টির ম্যাকডোনাল্ড প্রধানমন্ত্রী হলেও সরকারে প্রাধান্য ছিল রক্ষণশীল দলের। গান্ধিজী পৌঁছালেন ১২ই সেপ্টেম্বর। যা' আশংকা করা গেছল বৈঠকে তাই ঘটল। সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে ইংরেজরা বারবার আলোচনায় উত্থাপিত করল সংখ্যালঘু সমস্যা এবং পৃথক নির্বাচনের প্রশ্নটিকে। গান্ধিজী যদিও বললেন রক্ষাকবচ বর্জিত দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হলে উপরোক্ত প্রশ্নগুলির সমাধান খুঁজতে দেরী হবে না তা সত্ত্বেও ইংরেজরা সর্বাগ্রে সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে আলোচনায় প্রাধান্য দিল। উদ্দেশ্য, মূল সমস্যাকে তফাতে রাখা। প্রকৃতপক্ষে

ভারতে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রশ্নটির বিশেষ কোনো সুরাহা হল না। ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩১ সালে গান্ধিজী শূন্য হাতে ফিরে এলেন। লণ্ডন যাত্রার পূর্বে আশংকা প্রকাশ করে যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন, প্রকৃতির পরিহাসে তাই সত্য হল।

এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। "দিল্লী প্যাক্ট"-এর কালি শুকোতে না শুকোতে দেশের সর্বত্র ইংরেজরা এই প্যাক্টের সুবিধাজনক অর্থ করে একটার পর একটা শর্ত লঙ্ঘন করে গেল। সুভাষচন্দ্র লিখছেন, "যুক্তপ্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন স্থাপিত থাকলেও চাষীরা খাজনা প্রদানে অক্ষমতা প্রকাশ করছে! তাদের প্রদেয় খাজনার ৫০ শতাংশ দিয়ে দেওয়ার জন্য মহাত্মা যে উপদেশ দিয়েছেন তা'ও তারা রক্ষা করতে পারছে না। বাংলাদেশের অবস্থা আরো শোচনীয়। প্যাক্ট থাকা সত্ত্বেও বৈপ্লবিক কাজকর্মের সাথে জড়িত এই অজুহাতে প্রতিদিনই বিনা বিচারে লোককে আটক করা হচ্ছে। বিনা বিচারে কারারুদ্ধ এক হাজার রাজবন্দীর এক জনকেও মুক্তি দেওয়া হয়নি।" (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ; পৃ: ২১৬) চাষীরা খাজনা দেবে কোথা থেকে ? ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারীতে চালের দাম অর্ধেক হয়ে গেল এবং তারপর কমতে কমতে ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে একেবারে শেষ ধাপে পৌছালো। (দ্রষ্টব্য, ডিয়েটমার রোথারমুণ্ড-এর লেখা প্রবন্ধ ; ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস প্রসিডিংস বোম্বে, ১৯৮০) সুভাষচন্দ্র কথিত যুক্ত প্রদেশে (ইউ. পি.)-র কৃষি অসন্তোষের বিষয়টি একটু বিশদভাবে পর্যালোচনা করলে "দিল্লী প্যাক্টে"র মর্মান্তিক ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হবে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০-৩১ সালের কৃষিক্ষেত্রের গভীর সংকট যুক্তপ্রদেশের আইন অমান্য আন্দোলনকে পরিবর্তিত করেছিল খাজনা বন্ধের আন্দোলনে। সরকার ও ভূস্বামীদের অমানবিক আচরণ এবং তার সাথে ১৯২৯ সালের পৃথিবীব্যাপী মন্দা যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলেছিল। দুরবস্থার কারণগুলি ছিল বহুবিধ। যথা, জমি থেকে বেআইনী উৎখাত, মহাজনী ঋণ, জুলুম করে আদায় এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস। খাজনার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কৃষকদের কথা কোনোভাবেই চিন্তা করা হয়নি কোন সময়েই। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে মোট খাজনা বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছিল ৬৬৯ লক্ষ টাকা। অন্য দিকে কৃষিপণ্যের দাম ১৯৩০ সালের শেষে প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছল। ফলে দেখা যায় প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষক আষ্টেপৃষ্ঠে ঋণের দায়ে বাঁধা পড়ে আছে। উৎপাদিত শস্যের একটি অংশ দেয়ার পরিবর্তে কৃষককে নগদে খাজনা দিতে হত বলে তার অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরো

দুঃসহ। বিশেষ করে যেখানে উৎপাদন কৃষকের খরচকেই উশুল করতে পারছে না, খাজনা দেয়ার ক্ষমতার কথাতো অনেক দূরের ব্যাপার। (জওহরলাল নেহেরু; এ বায়োগ্রাফি; এস. গোপাল; ১ম খণ্ড; পৃ. ১৫৫; সংস্করণ ১৯৭৬) অবস্থা চরমে উঠল যখন জমিদাররা সরকারের সাহায্যে জবরদস্তি করে খাজনা আদায়ে নামল। ১৯৩১ সালের ১০ই জানুয়ারী সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যুক্ত প্রদেশে কৃষকরা বিদ্রোহের পথে চলেছে এবং কর বন্ধের আন্দোলন জোর কদমে শুরু হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বে এলাহাবাদের কিষাণ কনফারেন্স প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলন শুরু করেছিল। ক্রমশঃ খোদ এলাহাবাদ থেকে যুক্ত প্রদেশের অন্যান্য জেলায় এই কর-বন্ধের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। জওহরলাল লিখছেন, অনেক জেলায় কৃষকরা কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের অপেক্ষা না করেই নিজের থেকে কর বন্ধ করে দিল। সরকার খুব বেশিদিন নিঃচেষ্ট রইল না। নির্যাতন ও দমন নীতির আশ্রয় নিল। লোক্যাল কংগ্রেস কমিটি, ইয়ুথ লীগ, যে সংগঠনগুলি সক্রিয় নেতৃত্বে ছিল সেগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হল। জেলে বন্দীদের উপর চলল অকথ্য অত্যাচার তথাপি আন্দোলনে কোনোরূপ ভাঁটা পড়ল না। এমন কি বন্দীদের উপর বেত্রাঘাতও শুরু হল। (অ্যান অটোবায়োগ্রাফি; পৃ ২৩৭-৩৮)

এ সবই ঘটল গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে ১৯৩০ সালের শেষ থেকে ১৯৩১ সালের গোড়ার মধ্যে। আশা করা গেছল গান্ধী-আরউইন চুক্তি কৃষকদের এই অসহ্য অবস্থার কিছুটা সুরাহা করবে.। কিন্তু ঘটনা তার উল্টোই ঘটল। সরকারের সহায়তায় জমিদাররা কৃষকদের উপর অত্যাচার অব্যাহত রাখল। ১৯৩১ সালের ১১ই মার্চ ইউ. পি.-র চিফ সেক্রেটারীকে জওহরলাল চিঠি দিয়ে অভিযোগ জানালেন ৮০০ কৃষকের বেআইনী উৎখাতের ঘটনা। কংগ্রেস খাজনা মকুবের দাবী জানাল। কিন্তু সরকার এসব বিষয়ে কর্ণপাতও করল না। লক্ষ্ণৌ, বরাবাঁকি, আগ্রা, মিরাট, রায়বেরিলী এবং এলাহাবাদের জেলাগুলির কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থা এমন পর্যায়ে পৌচেছিল যে তাদের পক্ষে কোনো রকম খাজনাই দেয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু জমিদার ও সরকার তাদের জুলুম বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। অগত্যা কৃষকরা এবার শুধু খাজনা বন্ধেই তাদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখল না কোথাও কোথাও. অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য না করতে পেরে পাল্টা সরকারও গঠন করল। এবং দু'একজন অত্যাচারী জমিদারও তাদের হাতে নিহত হল। জ্ঞান পাণ্ডে তাঁর বই "অ্যাসেনডেনসি অব দি কংগ্রেস ইন ইউ. পি."তে দেখিয়েছেন কিভাবে কৃষকদের

এই আন্দোলনের রকমফের ছিল। আগ্রা, যেখানে বড় জমিদারদের পরিবর্তে ধনী এবং মাঝারি কৃষকদের আধিক্য ছিল সেখানে মোটামুটি চেষ্টা ছিল হিংসাকে এড়িয়ে যাওয়া এবং খুব বড় ধরনের ভূস্বামী-বিরোধী হাংগামা না করা। আবার রায়বেরিলি যেখানে দখলকারী রায়ত (Occupancy tenants)-দের হাতে মাত্র ১·৫% শতাংশ জমি এবং বড় তালুকদারদের সংখ্যাধিক্য সেখানে কৃষকরা সরাসরি খাজনা বন্ধের আন্দোলনে নেমে পড়েছিল। (উদ্ধৃতির জন্য, সুমিত সরকার পৃ. ৩০৬-৩০৭)

পুলিশ ও জমিদারদের ভাড়াটে লাঠিয়ালদের অবর্ণনীয় অত্যাচার যখন অব্যাহত রয়েছে সে সময়ে "দিল্লী প্যাক্ট" (গান্ধী-আরউইন চুক্তি) ঘোষিত হওয়ার প্রায় দু'মাস পরে গান্ধিজী নাইনিতালে এলেন স্বরাষ্ট্র সচিব এমার্সন (Emerson) এবং প্রাদেশিক গবর্ণর হেইলির (Haily) সাথে দেখা করতে। সে সময়ে জওহরলাল স্বাস্থ্যের কারণে দক্ষিণ ভারতে ছিলেন।

গান্ধিজী প্রথমে সরকারের কাছে দাবী জানালেন খাজনার প্রকৃত পরিমাণ নিরুপণের জন্য। কিন্তু সরকার সে প্রস্তাব নাকচ করে দিল। এর পর তিনি কৃষকদের অন্যান্য অভিযোগগুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু গবর্ণর ম্যালকম হেইলী এ ব্যাপারেও প্রয়োজনের অতি সামান্য ব্যবস্থা নিলেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষক অসন্তোষের কোনো সুষ্ঠ সমাধান না করেই গান্ধিজী লণ্ডনের পথ ধরলেন। তবে যাওয়ার আগে কৃষকদের তিনি উপদেশ দিতে ভুললেন না তারা যেন হিংসার আশ্রয় না নেয় এবং যথাসম্ভব খাজনা মিটিয়ে দেয়। এবং সবচেয়ে কৌতুহলের বিষয় সে খাজনার পরিমান কি? সে খাজনার পরিমাণ সরকার নির্ধারিত বর্ধিত খাজনা। অথচ গান্ধিজী জানতেন কিছুদিন পূর্বে যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভোগ দখলী প্রজাদের ক্ষেত্রে প্রদেয় খাজনার ৫০ শতাংশ মুকুবের দাবী জানিয়েছে এবং অন্যান্য গরীব প্রজাদের ক্ষেত্রে আরও অধিক হারে খাজনা লাঘবের সুবিধা। গান্ধিজীর একনিষ্ঠ অনুরাগী জওহরলালকেও তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকার করতে হয়েছে যে গান্ধিজী কৃষকদের যে অংকের খাজনার অর্থ মিটিয়ে দিতে বলেছিলেন, তা' ছিল "আমাদের পূর্বে দেয়া অংকের চেয়ে কিছু পরিমাণ বেশি।" (অ্যান অটোবায়োগ্রাফী ; পৃ. ৩০৩)

যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের অসন্তোষকে কোনো রকম অশান্তির পথে পরিচালনা না করে তাদের শান্তির পথে চলার উপদেশ দিয়ে গান্ধিজী নাইনিতাল পরিত্যাগ করায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি হেইলী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি আশা করেছিলেন সরকারকে জব্দ করার এমন সুযোগ হয়ত গান্ধিজী হাত ছাড়া

করবেন না। হেইলীর মতে এটি ঈশ্বরের অপার করুণা। কেন না গান্ধিজী ইচ্ছা করলে "যুক্তপ্রদেশের ৬ থেকে ৭ মিলিয়ন কৃষককে নিয়ে বিপজ্জনক খেলায় নামতে পারতেন।" হেগ (Haig)-কে লেখা এক চিঠিতে হেইলী উপরোক্ত মতামত প্রকাশ করেছিলেন। (উদ্ধৃতির জন্য; এস. গোপাল; পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ; পৃ. ১৫৮) ওই চিঠিতে তিনি আরো জানিয়ে ছিলেন, কতগুলি জেলায় অত্যাচারী জমিদারদের জুলুমের ফলে আন্দোলনের জমি তৈরী হয়েছিল। তাঁর মতে জওহরলাল এবং তাঁর বন্ধুরা যদিও আন্দোলনের সর্ববিধ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তবে জনসাধারণের চোখে গান্ধিজীর সাথে যে পবিত্রতা (hallow) জড়িয়ে আছে—তা' তাঁদের নেই।

যাইহোক, যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের উপর অত্যাচারের কোনো শেষ হল না। বলপূর্বক উৎখাত, নির্যাতন এবং শোষণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতেই লাগল। সরকার এবং কংগ্রেস কোনো তরফেই সহযোগিতা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মহাজনের কাছে অস্বাভাবিক উঁচু হারে বন্ধকী ঋণ এবং গরু-ছাগল পর্যন্ত কৃষককে বিক্রি করতে হল। আবার অনাদায়ী ঋণের জন্য ভিটে-মাটি এবং জমি থেকে দলে দলে কৃষকরা উৎখাত হতে লাগল। ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল স্বরাষ্ট্র সচিবকে অভিযোগ করে জানালেন, যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিশেষ করে মথুরা জেলায় যেভাবে কৃষকরা জমি থেকে উৎখাত হচ্ছে, তা' এক অসহনীয় গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। (উদ্ধৃতির জন্য, অরবিন্দ কুমার শর্মার প্রবন্ধ; দি কোয়ার্টারিলি রিভিউ অব হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ; পৃ. ৫১-৫২) যদিও ইউ. পি. কংগ্রেস কমিটি এই অত্যাচারের প্রতিবাদে তখনও পর্যন্ত কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে ইতঃস্তত করছিল কিন্তু এলাহাবাদ এবং রায়বেরিলির জেলা কমিটিগুলি আর সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। এমন কি জওহারলালও প্রথমটা দ্বিধাগ্রস্থ থেকে শেষ পর্যন্ত "কর-বন্ধে"র প্রস্তাবে রাজী হলেন। কিন্তু তাঁর কাছে প্রধান সমস্যা হল গান্ধিজীর অভিমত গ্রহণ করা। গান্ধিজী তখন লণ্ডনে। টেলিগ্রাফ করে তাঁর উপদেশ চাওয়া হল। কিন্তু উত্তরে তিনি (১৮ই অক্টোবর, ১৯৩১) নিজে কোনো সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ না করে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব জওহরলালের স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন।

লক্ষণীয় যুক্তপ্রদেশের অগ্নিগর্ভ অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে জওহরলাল টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ছিলেন ১৬ই অক্টোবর, ১৯৩১। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার দিল্লী প্যাক্টকে কবরে পাঠিয়ে দেশ শাসন করছেন প্রধানতঃ দমনমূলক অর্ডিন্যান্স এবং রেগুলেশনের দ্বারা। ১৯৩১ সালে কমপক্ষে ১৫টি নতুন জরুরী আইন জারী

হয়েছে দমন, নিপীড়নকে তুঙ্গে তোলার জন্য। একথা বিশ্বাস করা যায় না যে গান্ধিজী বিলেতে বসেও সংবাদপত্র মারফত এ সব সম্পর্কে অবগত নন। বিশেষ করে যেখানে নেহেরু লিখছেন, ইউ. পি.-র কৃষকদের দুরবস্থা গান্ধিজীকে এতটা ব্যাকুল করে তুলেছিল যে তিনি এর সমাধান না করে বিলেতে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। (অ্যান অটোবায়োগ্রাফি; পৃ. ৩০৭) তখন অনুমান করতে হবে যে তিনি দেশের পরিস্থিতির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছেন। জওহরলাল "আত্মজীবনী"তে লিখেছেন যে তিনি পত্র মারফত গান্ধিজীকে স্বদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখতেন। (ঐ; পৃ. ৩০৭) প্রকৃতপক্ষে দেশের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি গান্ধিজীর নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষা করে আছে। লণ্ডনে ১১ই ডিসেম্বর কনফারেন্স শেষ হয়ে গেছে। (ফ্রিডম ম্যুভমেণ্ট; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৩১৬) গান্ধিজী তারও আট দিন পূর্বে ৩রা ডিসেম্বর (১৯৩১) লণ্ডন পরিত্যাগ করেছেন। আশা করা গেছল দেশের এই বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে তিনি কালবিলম্ব না করে দ্রুত দেশে ফিরবেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তার পরিবর্তে তিনি সারা ইউরোপে জনসংযোগে প্রবৃত্ত হলেন। গান্ধিজী প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ইউরোপের বিভিন্ন মনিষী ও জননায়কদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা ও পবিত্র স্থানগুলি পরিদর্শন করে বেড়ালেন। তারপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩১।

এর পরের ঘটনা খুবই সামান্য। গান্ধিজী ভারতে পৌছে তৎক্ষণাৎ কোনো আন্দোলনের ডাক না দিয়ে ভাইসরয় উইলিংডনের সাথে চিঠি-পত্র লেখার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর বক্তব্য দেশে যে অত্যাচারের বন্যা চলেছে বিশেষ করে বাংলা, ইউ. পি. এবং সীমান্ত প্রদেশে তার গতিরোধ করতে তিনি প্রস্তুত কিনা? যদি ভাইসরয় অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন তাহলে তিনি পুনরায় আন্দোলনের ডাক দিতে বাধ্য হবেন। শত্রুকে যদি সম্ভাব্য আক্রমণ ও কৌশল সম্পর্কে আগাম ওয়াকিবহাল করে দেওয়া হয় তাহলে সে যা' করবে উইলিংডনও তাই করলেন।

ভাইসরয় গান্ধিজীর অনুরোধ এবং সাক্ষাৎ আলোচনার প্রার্থনা নাকচ করে দিয়ে আন্দোলন দমনের পুরোপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের শুরুতে গান্ধিজীর সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব লর্ড আরউইনও বাতিল করে দিয়ে লবণ সত্যাগ্রহ দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। নতুন ভাইসরয় উইলিংডনও তাই করলেন তবে আরো একটু এগিয়ে। সত্যাগ্রহ ঘোষণার (৩রা জানুয়ারী, ১৯৩২) এক দিনের মধ্যেই (৪ঠা জানুয়ারী) গান্ধিজী সহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিনা বাধায় গ্রেপ্তার করলেন।

বস্তুতঃ দিল্লী প্যাক্টের পর থেকে ভারতে নতুন করে নিপীড়ন ও নির্যাতন শুরু হল এবং সীমান্ত প্রদেশে স্ত্রী, শিশু নির্বিচারে গুলী করে হত্যা ও উত্তর প্রদেশের অত্যাচারিত কৃষকরা যেভাবে খাজনা বন্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ছিল এবং সর্বোপরি বাংলাদেশে অহিংস ও সহিংস প্রতিরোধ প্রচেষ্টা— সব মিলিয়ে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যা' গান্ধিজীর নেতৃত্বের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ! ভারতে উপস্থিত থেকে তিনি যদি এইসব অমানুষিক অত্যাচারের উপযুক্ত পাল্টা ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হতেন তাহলে দেশবাসী মোহমুক্ত হয়ে বিকল্প কোনো নেতৃত্বের সন্ধান করত। সুতরাং এদিক দিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের ঘটনা তাঁকে সাহায্য করেছিল নেতৃত্বের যোগ্যতাকে কোন পরীক্ষায় না দাঁড় করাতে। দেশে প্রত্যাবর্তনের ছ'দিনের মধ্যে তিনি গ্রেপ্তার হলেন আর নেতৃত্বহীন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিও ধীরে ধীরে শীতল হয়ে পড়ল। গান্ধিজী জেলের বাইরে থাকলে কি করতে পারতেন আর কি করতে পারতেন না, এই মুগ্ধতা আর কৌতূহল পূর্বের মতই জনমানসে জাগরূক থাকলো যদিও দেশ আবার একটা সুযোগ হারালো।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের কিছুকালের মধ্যেই ভারতবর্ষে যে ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয়েছিল তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জওহরলালের ধারণা হয়েছিল, "সহসা আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হওয়ায় প্রতিক্রিয়ার মুখে উহাই সম্ভবতঃ দেশে এক নূতন বিপত্তির সৃষ্টি করিল। রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিষ্ফল ও আকস্মিক হিংসা বন্ধ হইলেও অবরুদ্ধ হিংসা বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী কয়েক বৎসরে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ ইহার ফলেই তীব্র হইয়াছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী বিভিন্ন শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিশাল জনসংঘ-সমর্থিত অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, এই অবস্থার সুযোগে তাহারা বাহিরে আসিল।" ["আত্মচরিত" (বাংলা অনুবাদ) পৃ. ৯২]

আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ অভিজ্ঞতাই চোখে পড়ে। আন্দোলন যখন প্রচণ্ড গতিতে চলছে—ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার স্যার হ্যারী হেগ (Sir Harry Haig) তখন ভারতের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র বোম্বাই শহরে আন্দোলনের প্রকৃত চেহারা নিজের চোখে দেখতে এলেন। সরকারের কাছে প্রদত্ত রিপোর্টে (২৫শে মে, ১৯৩০) তিনি সুস্পষ্টভাবে জানালেন বোম্বাই শহরে আইন অমান্য আন্দোলন প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করেছে। গুজরাটীরা তো বটেই—এমন কি মহারাষ্ট্রীয়রা, পার্সীরা পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে

পড়েছে। তাঁর মতে "আন্দোলনের সাফল্য—যে ব্যাপক হারে এবং গভীর ভাবে সমর্থন লাভ করছে তা' সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। কংগ্রেস অফিস প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করছে। গান্ধী টুপিতে রাস্তা ভরে গেছে। পুলিশ কনষ্টেবলদের মত নিয়মমাফিক ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে ইউনিফর্ম পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকরা পিকেটিং করছে···এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে এই সব তীব্র অনুভূতি এবং সরকারকে প্রকাশ্যে সাফল্যের সাথে উপেক্ষা করে সমগ্র বোম্বাইয়ের উপর এক গভীর ছাপ ফেলেছে।"

এই যখন আন্দোলনের চেহারা ঠিক তখনই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়া হল "গান্ধী-আরউইন" চুক্তির মাধ্যমে। বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেসের অনুগামী গিরনি কামগার ইউনিয়নের সভাপতি জি. এল. কানডালকার পর্যন্ত গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলতে বাধ্য হলেন এবং প্রতিবাদে তিনি কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করলেন। (হেগ রিপোর্ট এবং কাণ্ডালকারের ঘটনার জন্য ; রবীন্দরকুমার ; পৃ. ২৭০-২৭৩) কারণ গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে দেশের অর্থনৈতিক মন্দাজনিত পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান বেকারগ্রস্ত শ্রমিকদের সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। রবীন্দরকুমার সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন, ১৯৩১ সালের মার্চে যখন গান্ধিজী ব্রিটিশ সরকারের সাথে কথা বলতে গেলেন, তখন দু'টি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটল। এক, কংগ্রেসের গণভিত্তি দুর্বল হল, আর দুই, সামাজিক উত্তেজনা আরো তীব্র হল। (ঐ ; পৃ. ২৭৩)

গোলটেবিল বৈঠকে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৩১) কিছুই লাভ হল না। ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি তো অমীমাংসিত রইলই উপরন্তু দেশের সংহতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের স্বার্থে গান্ধিজীকে আগা খাঁ, সৌকত আলী প্রমুখ নেতাদের উত্থাপিত সম্প্রদায় বিশেষের দাবিকে বাধা দিতে হল। ফলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে মুসলিম লীগের নেতারা গান্ধিজীর বিরুদ্ধে প্রচারে নামলেন যে তিনি শুধু সংখ্যাগুরুদের স্বার্থ দেখেন।

এই মিথ্যা প্রচারের ফল হল গুরুতর। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অব্যাহত থাকলে এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে কেউ বিভ্রান্ত হত না এবং কোনও দিত না। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা, আন্দোলনের গতিহীনতা আবার নতুন করে সৃষ্টি করল পারস্পরিক অবিশ্বাস্যতা।

সমাপ্ত